মিরাসুল আম্বিয়া

নবীদের উত্তরাধিকার

আল্লাহ তা আ'লার
তাওহীদের বর্ণনা সংক্রান্ত
প্রবন্ধসমূহের সিরিজ

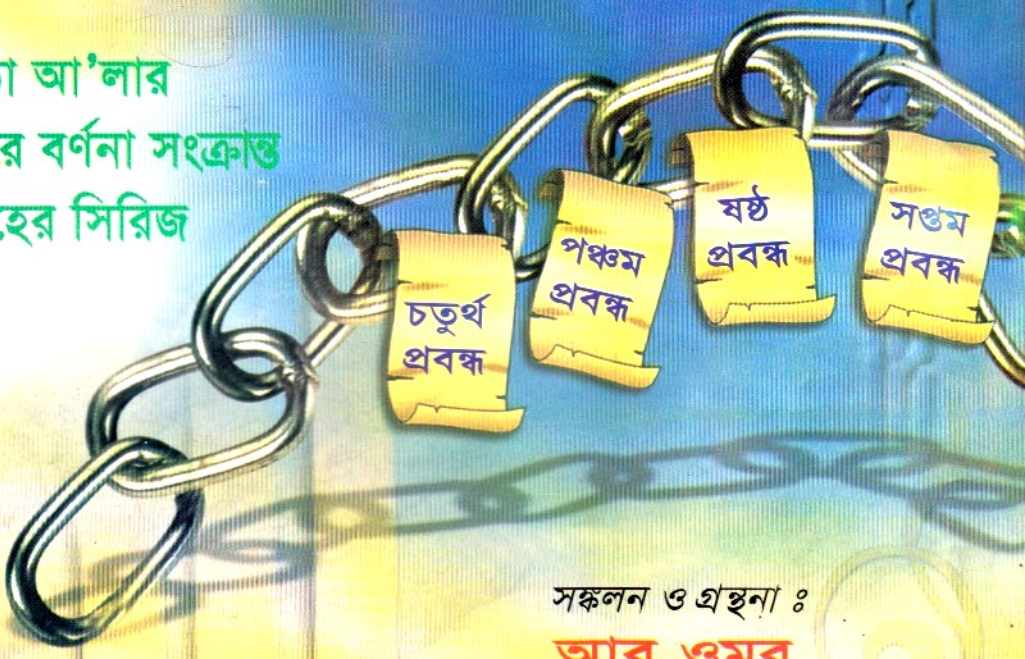

সঙ্কলন ও গ্রন্থনা ঃ
আবু ওমর

প্রথম প্রবন্ধ — তাওহীদের মূলনীতি ও ধ্যান-ধারনা সংক্রান্ত আলোচনা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ — যে ব্যক্তি তাগূতের কাছে বিচার চায় সে তাগূতকে অস্বীকার করেনা এবং এ প্রসংগে পঁচিশজন ওলামায়ে ইসলামের বক্তব্য।

তৃতীয় প্রবন্ধ — যে ব্যক্তি আইন প্রণয়নকারীকে মনোনয়ন দেয় এবং আইন রচনার পদে (পার্লামেন্টে) তাকে বসায়, তাহলে সে আল্লাহর সাথে রুবুবিয়াত এবং উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে মুশরিক হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মীরাসুল আম্বিয়া
বা
নবীদের উত্তরাধিকার

(প্রথম প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, তৃতীয় প্রবন্ধ)

মূল ঃ (আরবী)

সংকলন ও রচনা
আবু ওমর

আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদের বর্ণনা সংক্রান্ত সিরিজ

www.pathagar.com

মীরাসুল আম্বিয়া বা নবীদের উত্তরাধিকার (প্রথম প্রবন্ধ, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, তৃতীয় প্রবন্ধ)
সংকলন ও রচনা ঃ আবু ওমর, মূল ঃ আরবী, প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০১ , রমযান ১৪২২ হিজরী।

বিনিময় ঃ ১০০.০০

MIRASUL AMBIA OR NOBITHER UTTRATHIKAR

Writen & Compiled by : ABU OMAR Origin : ARABIC

First edition : November 2001, Ramadan 1422 Hijri

Price : Tk. 100, US$ 2

ALL RIGHTS NOT RESERVED

Any part of this book May be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without permission of the publisher. How ever the contents of the book may not be changed. This is a amanat from the author.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম প্রবন্ধ

ভূমিকা ১
তাওহীদের অর্থ ৬
শিরকের অর্থ ৮

তাওহীদের শর্ত
প্রথম শর্ত ঃ এলেম বা জ্ঞান ১০
দ্বিতীয় শর্ত ঃ ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস ১৩
তৃতীয় শর্ত ঃ কবুল (গ্রহণ করা) ১৪
চতুর্থ শর্ত ঃ ইনকিয়াদ (সমর্পণ করা) ১৪
পঞ্চম শর্ত ঃ ছিদ্‌ক বা সত্যতা ১৫
ষষ্ঠ শর্ত ঃ ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ১৬
সপ্তম শর্ত ঃ মুহাব্বত (ভালবাসা) ১৬

তাওহীদের আরকান
রুকনের অর্থ ১৯
প্রথম রুকন ঃ তাগুতকে অস্বীকার করা ২০
দ্বিতীয় রুকন ঃ এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ২৭
আল্লাহ্‌র একত্ববাদের অনুসারী (মুওয়াহ্‌হিদ)
প্রথম বিষয় ২৯
দ্বিতীয় বিষয় ৩১
তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয় ৩৪
লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ ৩৭
কথা ও কাজে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৪১
মুসলিমের জন্য মুশরিক থেকে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার উপায় ৪৫
দ্বীন ইসলামের মূল ও নীতি ৪৮

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

ভূমিকা ৫১

প্রথম অধ্যায়
তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষন করা ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
পঁচিশ জন ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য ৫৮

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল-ইয়াসেক তাতারীর সাথে পূর্বসূরীদের আচরণ ৮১

চতুর্থ অধ্যায়

তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালাকে যে বৈধ মনে করে তার সংশয়
প্রথম সংশয় ঃ ৮২
দ্বিতীয় সংশয় ঃ ৮৫
তৃতীয় সংশয় ঃ ৯০
চতুর্থ সংশয় ঃ ৯২
পঞ্চম সংশয় ঃ ৯৩
ষষ্ঠ সংশয় ঃ ৯৩

সংযোজিত অধ্যায়সমূহ

প্রথম অধ্যায়

বিচারক নিয়োগের বৈধতা এবং শরীয়তের বিচারক না পাওয়া গেলে করণীয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত ১০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতিসংঘের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া ও তার সদস্যপদ লাভ করা ১১২

তৃতীয় প্রবন্ধ

আইন প্রণয়নকারী, মন্ত্রী পরিষদে এবং পার্লামেন্টারী বৈঠকাদিতে যোগদানের বৈধতার জবাব

প্রথমত ঃ ইজমালী জবাব ১১৮
দ্বিতীয়ত ঃ বিস্তারিত জবাব
এক ঃ আইন পরিষদে অংশ গ্রহণ হারাম এবং তা শিরকের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দলীল ঃ ১২০
দুই ঃ আইন প্রণয়নকারী পরিষদে বসাকে যারা বৈধ মনে করে তাদের সংশয়
প্রথম সংশয় ঃ ১২৭
দ্বিতীয় সংশয় ঃ ১৩৫
তৃতীয় সংশয় ঃ ১৪০
চতুর্থ সংশয় ঃ ১৪১
পঞ্চম সংশয় ঃ ১৪৪
ষষ্ঠ সংশয় ঃ ১৪৬

একটি সংযোজিত অধ্যায়

কতিপয় প্রস্তাবনা এবং আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রত্যাখ্যাত কতিপয় আইনের উপমা

প্রথম উপমা ঃ ১৫২
দ্বিতীয় উপমা ঃ ১৫৬
তৃতীয় উপমা ঃ ১৫৮
ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য ও মতামত ঃ ১৬৫
বিরোধীদের প্রতি আহবান ঃ ১৭১

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না। আর যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁরই বান্দা এবং রাসূল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভাবে ভয় করা দরকার ঠিক তেমন ভাবে ভয় করো। আর তোমরা অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা।" (আল-ইমরান ঃ ১০২)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার জুড়ী সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার ঘটিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অগনিত নারী ও পুরুষ। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের কাছে প্রার্থনা করে থাকো, আর আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের ব্যাপারে সুক্ষ দৃষ্টি রাখেন।" (আন-নিসা ঃ১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।"

(আল-আহযাব ঃ ৭০ -৭১)

www.pathagar.com

এ পুস্তকে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত শিরকের বিভিন্নরূপের বর্ণনা সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ সেই জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানকারীর সামনে উপস্থাপন করছি, যে বর্তমান সময়ে তার দ্বীন ও তাওহীদের চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কেননা বর্তমান সময়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যার প্রতি করুনা করেছেন, আর শিরক থেকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কতিপয় শিরক লুকায়িত আছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা কয়েকটি, প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছি। আর এগুলোর সম্মিলিত নাম দিয়েছি " রাসায়েলু মিরাসিল আম্বিয়া, নবীদের উত্তরাধিকারের বর্ণনা সংক্রান্ত সিরিজ।" আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছ থেকে উম্মতগণ উত্তরাধিকার হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সম্পদ অর্জন করেছে, তা হচ্ছে " তাওহীদ " বা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের শিক্ষা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

" আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি, এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো, আর তাগুত থেকে দূরে থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন, আর কিছু সংখ্যক লোকের জন্য গোমরাহী অবধারিত হয়ে গেলো। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন করো, আর লক্ষ্য করো মিথ্যারূপকারীদের কি রকম পরিণতি হয়েছে।" (সুরা নাহলঃ ৩৬)

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

و ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر- (رواه ابو داود وترمذي)

"নিশ্চয়ই ওলামায়ে কেরাম হচ্ছে নবীগণের ওয়ারিশ, (উত্তরাধিকারী) আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে দিনার ও দিরহাম (অর্থ সম্পদ) রেখে যাননি, বরং তাঁরা একমাত্র এল্‌মই (জ্ঞান) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। অতএব যে ব্যক্তি এলেমকে (জ্ঞান) গ্রহণ করে সে যেনো পূর্নাঙ্গ অংশই গ্রহণ করে।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

" আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (যারিয়াত ঃ ৫৬)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ-

"হে নবী জেনে রাখো- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" (মুহাম্মদ ঃ ১৯)

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে এতদসংক্রান্ত জ্ঞানের শর্তাবলী , মৌলিক উপাদান, এর সাংঘর্ষিক দিক এবং অত্যাবশকীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। এ সিরিজের **প্রথম প্রবন্ধে** এ বিষয়গুলোই আলোচনা করেছি অর্থাৎ তাওহীদের অর্থ, এর শর্তাবলী, এর মৌলিক উপাদান, এর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়, এর ভিত্তিমূল এবং এর নিয়মাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে (অর্থাৎ খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে) বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা করে, সে তাগুতকে অস্বীকার করেনা। যারা তাগুতী শক্তির বলে বিচার-ফয়সালা করে এ আলোচনায় তাদেরকে বুঝানো হয়নি বরং আলোচনায় তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা তাগুতী শক্তির কাছে বিচার চায় এবং বিবাদের ফয়সালা উক্ত শক্তির কাছে ন্যস্ত করে।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে এই যে, আমরা বর্তমান যমানায় এমন কিছু লোক দেখতে পাই; যারা সামান্য অর্থ, পদবী ইত্যাদি লাভের জন্য বিচার-ফয়সালা তাগুতী শক্তির কাছে নিয়ে যায়। তারা এ কথা জানেনা যে, এ সব তুচ্ছ জিনিসের জন্য জিহাদ থেকে সরে থাকা মানুষের জন্য জায়েয নেই।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ -

"আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, সে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো তোমাদের বাসস্থান - যা তোমরা পছন্দ করো- তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জেহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" (আত্ তাওবাহ ঃ ২৪)

www.pathagar.com

মানুষ যদি উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আটটি কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকে, তাহলে কি সে মাযুর (অর্থাৎ জেহাদে না যাওয়ার সংগত অজুহাত) বলে গণ্য হবে? এর জবাব হচ্ছে, 'না' । কেননা আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত পার্থিব কারণ গুলোর নিন্দা করেছেন, যে গুলোর সাথে নিজেদের জীবনকে সম্পৃক্ত করে রাখার কারণে তারা জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাওহীদ (আল্লাহর একাত্ববাদ) কে পরিত্যাগ করেছে, সে বেশী জঘন্য অপরাধ করেছে, নাকি যে ব্যক্তি আটটি পার্থিব কারণে জেহাদ পরিত্যাগ করেছে সে বেশী জঘন্য অপরাধ করেছে? এখানে জবাব হচ্ছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে ব্যক্তি তাওহীদ পরিত্যাগ করেছে, সে জেহাদ পরিত্যাগকারীর চেয়ে জঘন্য অপরাধী। পার্থিব ৮টি বিষয়ের কারণে যদি আল্লাহ তায়ালা জিহাদ পরিত্যাগকারীর অজুহাত কবুল না করে থাকেন, তাহলে কিভাবে উক্ত পার্থিব বিষয়গুলোর কারণে তাওহীদ পরিত্যাগকারীর অজুহাত গ্রহণ করবেন। একমাত্র বল প্রয়োগে সংকটাপন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কুফরী কথা উচ্চারণের ওজর গ্রহণ করেছিলেন। আর বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংকটাপন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে; তার সাথে এমন কাজ করা, যা করা হয়েছিলো আম্মার বিন ইয়াসির (রঃ) এর সাথে।এটা শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য অনুমতির ব্যাপার মাত্র। কিন্তু দৃঢ় ঈমানের পথ গ্রহণ করা সর্বোত্তম। এব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে ।

শাইখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ) তাঁর (بيان سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين واهل الاشراك) নামক প্রবন্ধে উপরোক্ত আয়াতের উপর মন্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তির 'বাপ-ভাই' এর অভিভাবকত্ব মেনে নিতে নিষেধ করেছেন, যদি তাদের আদর্শ ইসলাম ভিন্ন অন্য কিছু হয়ে থাকে, অথচ বাপ-ভাই মানুষের মধ্যে তার জন্য সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি ।

আরো বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তার বাপ ও ভাই কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নিবে সে ব্যক্তি জালেম। তাহলে সে ব্যক্তির অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে তার নিজের দুশমন, তার পূর্বপুরুষদের দুশমন এবং তার দ্বীনের দুশমন কাফেরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু মেনে নেয়? সে কি জালেম হবে না? আল্লাহর কসম অবশ্যই সে সবচেয়ে বড় জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত আটটি পার্থিব বিষয় কখনো অজুহাত হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। অতএব কোনো ব্যক্তির জন্যই স্বীয় বাপ, ভাই, দেশ অথবা সম্পদের ওপর ভয় অথবা পরিবার পরিজনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আবেগ অথবা স্ত্রীর ওপর কোনো আশঙ্কার কারণে কাফেরদেরকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে মেনে নেয়া বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির জন্য এগুলোকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেঃ অনেক মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেছেনঃ

এ আয়াত নাযিল হয়েছে জিহাদের ব্যাপারে, তখন তার জবাব হবে দুটিঃ

www.pathagar.com

একটি হচ্ছে ঃ যদি উল্লেখিত আটটি বিষয় জিহাদ (যা ফরজে কেফায়া) পরিত্যাগ করার অজুহাতে বর্ণনা না হয়ে থাকে তাহলে মুশরিকদের সাথে দুশমনি আর সম্পর্কচ্ছেদের বিষয়টি পরিত্যাগ করার অজুহাত নিশ্চিয়ই হতে পারেনা।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছেঃ আয়াতটি আলোচিত বিষয়েরই প্রমাণ পেশ করছে যেমনি ভাবে জেহাদের প্রমাণ পেশ করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ-

" তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং তাঁর পথে জেহাদের চেয়েও বেশী প্রিয়।" (আত-তাওবাহ ঃ ২৪)

অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) প্রতি মুহাব্বতের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে ৮টি বিষয়ের ওপরে মুশরিকদের সাথে দুশমনি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং সর্বাগ্রে নিয়ে আসা। এমনিভাবে জেহাদের প্রতি মুহাব্বতের দাবী হচ্ছে জিহাদকে আটটি বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া।

মীরাসুল আম্বিয়ার **তৃতীয় প্রবন্ধটি** হচ্ছে যারা আইন প্রণয়ন ও রচনাকারী সংসদ ও তার বৈঠকাদিতে যোগদানের বিষয়টিকে বৈধ বলে মনে করে তাদের জবাব এবং ভোট প্রার্থী ও ভোট দাতা উভয়েই বড় শিরকের মধ্যে নিপতিত এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম এবং মহান সিফাতগুলোর উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেনো আমাদেরকে যাবতীয় শিরক থেকে হেফাজত করেন। গোপন ও প্রকাশ্য ফিতনাগুলোতে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি যেনো আমাদের ঈমান আক্বীদা, কথা এবং কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের তৌফিক দান করেন। কুফরী ও ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে তিনি যেনো আমাদের হেফাজত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা শক্তির অধিকারী।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

www.pathagar.com

মীরাসুল আম্বিয়া
বা
নবীদের উত্তরাধিকার

প্রথম সংস্করণ

বর্ধিত ও সংশোধিত

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللهَ
وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

"আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, আর তাহার সাহায্যে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।"

[সুরা নাহল- ৩৬]

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে প্রেরিত আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ), তাঁর পরিবার এবং তাঁর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

হে আমার মুসলিম ভাই [আল্লাহ আপনাকে রহম করুন] আপনি একথা জেনে রাখুন যে, তাওহীদ হচ্ছে বান্দার ওপর আল্লাহর হক। আর এ তাওহীদই হচ্ছে সেই লক্ষ্য, যার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ-

"আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। (আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

ليعبدون এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন ليوحدونى (আমার একত্ববাদ মেনে নেয়ার জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি)। আমি তাদেরকে আদেশ দেই আবার নিষেধও করি।

অতএব তাওহীদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ন্যায় পরায়ণতা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে মেনে নিলো, সে একটি জিনিসকে তার নিজস্ব স্থানে রাখলো এবং ইবাদতকে তার যথাযোগ্য প্রাপকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করলো। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ط لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

"আল্লাহ নিজেই এ কথার স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেস্তা এবং সব জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ স্বাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেহই ইলাহ হতে পারেনা"। (আলে-ইমরান ঃ ১৮)

তাওহীদ হচ্ছে বান্দা তার রবের একত্বকে মেনে নেয়া, তাঁর রুবুবিয়াত সংক্রান্ত কাজগুলোর মধ্যে, তাঁর সকল আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) এর মধ্যে এবং (বান্দার) সকল ইবাদতের মধ্যে।

আর শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করলো, সে বস্তুকে যথাস্থানে না রেখে অন্যস্থানে এবং ভিন্ন উৎসে রাখলো, আর ইবাদতকে নিবেদিত করলো যে এর প্রাপক নয় তার উদ্দেশ্যে এর ফলে সে বিরাট বড় পাপের অধিকারী হলো। আল্লাহ তায়ালা লোকমান হাকিম কর্তৃক তার ছেলেকে উপদেশ প্রদানের ঘটনা বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেছেনঃ

وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ ط إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"স্বরণ করো, লোকমান যখন নিজের ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছিলো তখন সে বললো, পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা। বস্তুতঃ শিরক হচ্ছে বড়ই জুলুমের কাজ"। (লোকমান ঃ১৩)

www.pathagar.com

ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, (দ্বিতীয় মাসআলা) আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাঁর যে বিরাট ও মহান কর্ম সম্পাদনের কথা উল্লেখ করেছেন, তা (মানুষের) জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি মোতাবেক যতটুকু বুঝতে সক্ষম ততটুকু বর্ণনা করেছেন, তা আল্লাহ তায়ালার আযমত ও জালালত [বড়ত্ব ও মহানুভবতা] (মানুষের) জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা যতটুকু অনুমান করা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশী। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

ما السموت السبع والارضون السبع فى كف الرحمن إلا كخردلة فى كف احدكم-

"রহমানের [আল্লাহর] হাতের তালুতে সপ্তাকাশ ও সপ্ত যমীনের অবস্থা তোমাদের কারো হাতের তালুতে সর্ষে দানার মতোই।" এটাই হচ্ছে আল্লাহর আযমত ও জালালতের নমুনা, তাহলে যে মাখলুক [সৃষ্টি] নিজের কল্যাণ অকল্যাণ সাধনের কোন ক্ষমতা রাখেনা, তাকে কিভাবে স্রষ্টার স্থানে বসানো সম্ভব? এ রকম করাটাই হচেছ সবচেয়ে বড় জুলুম আর চরম মুর্খতা। যেমনটি নেককার বান্দা [লোকমান হাকীম] তাঁর ছেলেকে বলেছিলেনঃ

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ-

"হে পুত্র, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, বস্তুতঃ শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম"। (লোকমান ঃ ১৩)

শিরক ঃ শিরক হচ্ছে, বান্দা আল্লাহর সাথে তাঁর রুবুবিয়াত সংক্রান্ত কর্ম কিংবা তাঁর আসমা ও সিফাত [নামসমুহ ও গুণাবলী] অথবা ইবাদতের মধ্যে কাউকে শরীক করা।

তাওহীদ যেমন এলেমের (জ্ঞানের) সাথে সম্পর্কযুক্ত - আল্লাহ তালায়ার নিম্নোক্তবাণী মোতাবেক ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ-

"জেনে রাখো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত "। (মুহাম্মদ ঃ১৯)

ঠিক তেমনিভাবে শিরকও মুর্খতার সাথে সম্পর্কযুক্ত, আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্তবাণী অনুযায়ী।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ-

"আপনি বলে দিন, হে মুর্খের দল, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছো?" (আয-যুমার ঃ৬৪)

www.pathagar.com

অতএব হে আমার মুসলিম ভ্রাতা, আপনার ওপর সেই তাওহীদ জানা অত্যাবশ্যক, যে তাওহীদের যাবতীয় শর্তাবলী, মৌলিক উপাদান এবং এর সাংঘর্ষিক দিকগুলো জানা এবং এর দাবী অনুযায়ী কাজ করা আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর জ্ঞানই হচ্ছে আপনার রবের প্রতি আপনার তাওহীদ [সংক্রান্ত ধ্যান ধারনা] কে সংরক্ষণ করার সঠিক পাথেয়।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ আপনি জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে করুনা করুন) যে, নামাজ এবং রোজা ফরজ। কিন্তু এরও আগের ফরজ হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর স্বাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি জেনে নেয়া । অতএব নামাজ ও রোজার বিষয়ে গবেষনা করার অপরিহার্যতার চেয়ে বান্দার জন্য অধিকতর অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ নিয়ে গবেষনা করা।

এমনি ভাবে যেমন, মা ও খালাদেরকে বিয়ে করার হুরমত (অবৈধ বা হারাম হওয়া) এর চেয়ে শিরক এবং তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণের হুরমত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ (কারণ মা-খালার সাথে বিয়ের দ্বারা যে কবিরা গুনাহ হয় তা শিরকের মতো ক্ষমার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়নি), তাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য প্রদান করা। এর অর্থ হচ্ছে যে, উলুহিয়্যাতের [ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা] সবটুকুই একমাত্র আল্লাহর, এ কথার স্বাক্ষ্য দান করা। উলুহিয়্যাতের বিন্দুমাত্র অংশও কোন নবী, কোনো ফেরেস্তা কিংবা কোনো অলির জন্য সংরক্ষিত নয়। বরং উলুহিয়্যাত বান্দার ওপর আল্লাহর হক [বা অধিকার]। তাগুতের সাথে কুফরী করার অর্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ ছাড়া জ্বীন অথবা মানুষ অথবা গাছ অথবা পাথর ইত্যাদির মধ্যে উলুহিয়াতের অস্তিত্ব সংক্রান্ত ধ্যাণ-ধারনা থেকে সম্পুর্নরূপে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং তাগুতকে কুফরী ও গোমরাহী শক্তি বলে স্বাক্ষ্য দেয়া এবং এর প্রতি ঘৃণাও ক্রোধ পোষণ করা, চাই সে তাগুত তোমার পিতা কিংবা ভাই হোক। যে ব্যক্তি বলেঃ আমি আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করিনা, এবং নেতৃবর্গের বিরোধিতাও করিনা, কবরের ওপর গম্বুজ এবং এ জাতিয় বিষয়ের প্রতিবাদও করিনা সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। সে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, আর তাগুতকেও অস্বীকার করেনি। এ বাক্যটি খুব সহজ হলেও বুঝার জন্য দীর্ঘ গবেষনা প্রয়োজন। দ্বীন ইসলাম জানার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ তায়ালা যা দিয়ে রাসূল (সঃ) কে পাঠিয়েছেন তা বুঝার ক্ষেত্রে অনেক সাধনার প্রয়োজন। ওলামায়ে কেরাম

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-

এর ব্যাপারে যা বলেছেন তা বুঝার জন্য গবেষনা প্রয়োজন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা শিখিয়েছেন, তা শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁর উম্মতকে যে তাওহীদ শিখিয়েছেন, তা জানার জন্য প্রয়োজন অধ্যাবসায় ও সাধনা। এ শিক্ষা থেকে যে ব্যক্তি বিমুখ থাকবে তার কলবে আল্লাহ তায়ালা মোহর মেরে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দান করবে আল্লাহ তায়ালা তার জাহালত বা মুর্খতার অজুহাত গ্রহণ করবেন না।

www.pathagar.com

প্রথম
তাওহীদের শর্তাবলী
বনাম
"لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ" এর শর্তাবলী ।

শর্ত ঃ শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। আর এটা হয়ে থাকে জিনিসের বাইরে এবং তা শুরু করার পূর্বে।

হে মুসলিম ভ্রাতা,

তাওহীদের অনেকগুলো শর্ত আছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এর শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলাম মূলই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে। যেমন নামাজ সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন কেবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা ইত্যাদি না পাওয়া যায় তাহলে নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে।

তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি ঃ

প্রথম শর্ত ঃ এলেম বা জ্ঞান ঃ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ-

"তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"

(মুহাম্মদ ঃ১৯).

এটা এ জন্য যে, 'আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার'- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই [তাওহীদের] এলেম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের শর্ত নিধারণ করা হয়েছে।

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة-

" আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।" (মুসলিম)

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ এবং এর দ্বারা কি অস্বীকার করা হয়, আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন ঃএর (লা ইলাহা ইলালাহর)

www.pathagar.com

উপকারিতা হচ্ছে এর অর্থসহ সেই এলমে ইয়াকীনী বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نفى اثبات (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ওয়াজির আবুল মুজাফফর ইফছাহ নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দানের দাবী হচ্ছে, স্বাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই] সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

فَاعْلَمْ اَنَّه لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-

"তুমি জেনে নাও যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই"। তিনি আরো বলেনঃ আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে لا শব্দের পরে الله শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝনো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত [ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা] একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেনঃ এখানে সারকথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা উভয় বিষয়ই এ কলেমার অন্তর্ভূক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া। তাগুতের ক্ষেত্রে আপনার উলুহিয়্যাতের অস্বীকৃতি আর আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দ্বারা আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হলেন, যারা তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর আল্লাহর প্রতি [ইলাহ হিসেবে] ঈমান এনেছে। (আদ দারু সুন্নাহ)

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদির রাহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেনঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

هَذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ-

"বস্তুতঃ সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেনো চিন্তা-ভাবনা করে।" (ইবরাহীম ঃ৫২)

উপরোক্ত আয়াতে ليقولوا انما هو اله واحد (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ-

"যারা জেনে শুনে সত্যের স্বাক্ষ্য দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন " অর্থাৎ তারা অন্তরে যা জানে তাই মুখে স্বাক্ষ্য দিয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই" এ কথা জানা অবস্থায় যে মৃত্যু বরণ করেছে সে জান্নাতে যাবে। এসব আয়াত দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্ব প্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে

www.pathagar.com

জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে, যে সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে " অর্থ সহ লা-ইলাহ-ইল্লাল্লাহর জ্ঞানার্জন আর সবচেয়ে বড় মুর্খতা হচ্ছে অর্থসহ লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর জ্ঞান না থাকা। অতএব অর্থসহ কলেমার জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কলেমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে বড় মুর্খতা।

অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে এই যে, কতিপয় লোক এমন রয়েছে, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থের ইতিবাচক ও নৈতিক দিক আলোচনা করাকে দোষারোপ করে থাকে, আর বলে, মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর জবাবে তাকে বলতে হবেঃ বরং তাওহীদ (আল্লাহ একত্ববাদ) জানার জন্য তুমি আদিষ্ট হয়েছো। আর তাওহীদের জন্য আল্লাহ তায়ালা মানব ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত নবী রাসূল এ দিকেই মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। তাওহীদের বিপরীত "শিরক" সম্পর্কে জানার জন্যও তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শিরক এমন একটি গুনাহ, যা আল্লাহ মাফ করবেন না। এ ব্যাপারে আদিষ্ট ব্যক্তির অজ্ঞতার কোনো অজুহাত [আল্লাহর কাছে] গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে তাকলীদ ও (অন্ধ অনুকরণ) জায়েয নেই কারণ তাওহীদ হচ্ছে সমস্ত মূলের মুল। অতএব যে ব্যক্তি ন্যায় আর অন্যায় ভাল -মন্দ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখেনা তার ধ্বংস অবধারিত। বিশেষ করে ন্যায় কাজের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে "তাওহীদ" আর অন্যায় কাজের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে "শিরক"।

শাইখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেনঃ

শেখ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা [লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ] এর দাবী মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, বরং এ মৌখিক স্বাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত । অবশ্য যারা শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলে থাকে যেমন কাররামিয়া সম্প্রদায় এবং যারা আন্তরিক স্বীকৃতি ও বিশ্বাসকে ঈমান বলে যেমন জাহামিয়া সম্প্রদায়, তারা এ মতের বিরোধিতা করে।

আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের কর্ম ও দাবীর ব্যাপারে তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ স্বাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরণের "তাগিদ" [emphasis] ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ ج وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ط وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ-

"আপনার কাছে মুনাফিকরা যখন আসে তখন বলেঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। আর আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী"। (মুনাফিকুন ঃ ১)

www.pathagar.com

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক স্বাক্ষ্যকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোন থেকে [তিনটি] أن (নিশ্চয়ই) ل (অবশ্যই) এবং جمله اسمية (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ [emphasis] ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালাও তাদের স্বাক্ষ্যকে বাক্যের মধ্যে হুবহু তাগিদ [emphasis] দিয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। এর সাথে সাথে তাদেরকে বিশ্রী উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের ভয়ংকর ও বীভৎস জ্ঞানের কথা বলেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বাক্ষ্য দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ স্বাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে নামাজ পড়ে রোজা রাখে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। যে ব্যক্তি কিতাবের (ইসলামের) কিছু মানবে আর কিছু মানবে না তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ-

"তোমরা কি কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো আর কিয়দংশ অবিশ্বাস করো?" (আল বাক্বারাহঃ ৮৫)

দ্বিতীয় শর্ত ঃ ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস)ঃ

তাওহীদ (আল্লাহর একাত্ববাদ) জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এ কলেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এবং এর দ্বারা সব ধরণের ইবাদত যে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতিও তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কলেমা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোনো ধরণের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ -

"প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষন করেনি এবং জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক।" (আল-হুজুরাতঃ১৫)

মুসলিম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে বান্দা স্বাক্ষ্য দেয়, " আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) (সঃ) আল্লাহর রাসূল" আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে, (মৃত্যু বরণ করে) তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় শর্ত ঃ কবুল (গ্রহণ করা) ঃ

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কলেমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে কোনো প্রকার ইবাদতের মাধ্যমেই তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। [অর্থাৎ কোনো প্রকার ইবাদতই তাওহীদের পরিপন্থি হবে না।]

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ -

"এসব লোকেরা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন বলা হতোঃ "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। তারা বলতোঃ আমরা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করবো? " (সাফফাতঃ৩৫-৩৬)

চতুর্থ শর্তঃ ইনকিয়াদ (সমর্পন করা) ঃ

তাওহীদ জানার পর , লাই-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, ইবাদতের মাধ্যমে কলেমা গ্রহণ করার পর অবশ্যই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। এ সমর্পন হবে সকল তাগুতের সাথে কুফরী করার মাধ্যমে এবং তাগুত থেকে নিজেকে মূক্ত করার মাধ্যমে , এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবেনা বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করবে।"

(আন-নিসা ঃ ৬৫)

তৃতীয় শর্ত ও চতুর্থ শর্তের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) হচ্ছে কথার মধ্যে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মধ্যে।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেছেনঃ ইসলাম শুধুমাত্র একটি দাবী এবং মৌখিক উচ্চারণের নাম নয়। বরং ইসলামের অর্থ হচ্ছে একত্ববাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ও সোপর্দ করা, একমাত্র আল্লাহর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কাছে আত্মসমর্পন করা (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)।

www.pathagar.com

যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى –

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সেই শক্ত রজ্জু আকড়ে ধরলো।" (আল বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ–

"বস্তুত সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, স্বয়ং তাঁকে ছাড়া তোমরা কারো দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটাই সঠিক ও খাটি জীবন বিধান। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা। (ইউসূফ ঃ ৪০) (আদ্ দুরার আস্ সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহিদ ২/২৬৪পৃঃ)

পঞ্চম শর্ত ঃ (ছিদ্ক) সত্যতাঃ

তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পন করার পর অবশ্যই বান্দাকে কলেমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তিই সত্য নিষ্ঠ অন্তরে স্বাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

রাসূল (সঃ) আরো ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমদ) যে ব্যক্তি এ কলেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কলেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত [মুক্তি] লাভ করতে পারবেনা, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারবেনা। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলো ঃ نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল" এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ

وَاللهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ–

"আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচেছন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (মুনাফিকুন ঃ১)

এমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে বর্ণনা করেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ–

"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়"। (আল বাক্বারাহ ঃ৮)

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ শর্ত ঃ ইখলাস (সততা ও একনিষ্ঠতা)ঃ

তাওহীদ, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কলেমার ব্যাপারে মুখলেস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া, গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ-

"তাদেরকে এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।" (বাইয়্যিনাহ ঃ ৫)

ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভূক্ত যে, বান্দা এ কলেমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ

فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله-

"আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করেছে"। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সঃ) আরো বলেছেনঃ

اسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه-

'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যবান"।

(বুখারী)

সপ্তম শর্ত ঃ মুহাব্বত (ভালবাসা)

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ, এর কাছে নিজেকে সমর্পন, ঈমানের সত্যতার যাচাই, কলেমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কলেমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কলেমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কলেমার প্রতি মুহব্বতকে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ لا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا لا وَّاَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ -

www.pathagar.com

"আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালেমরা পার্থিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।"

(আল বাকারাহ ঃ ১৬৫)

শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (রহঃ) বলেনঃ এ সব বিষয়ে কথা বলা এবং জবাব দেয়ার পূর্বে আমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ, এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা উল্লেখ করতে চাই। এর সাথে সাথে আমাদের উস্তাদ শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান (রহঃ) যিনি দারুন্নজদিয়ার মুফতি, কলেমার সেই শর্তাবলীর কথাও উল্লেখ করতে চাই যেসব শর্তাবলী পূরণ করা ব্যতীত কোনো মানুষের ইসলাম সঠিক হবে না। একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সমাবেশ ঘটবে এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কলেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) এর উল্লেখকৃত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এটাই হচ্ছে কলেমার মূল, যার উপর ভিত্তি করে এসব মাসআলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং হুকুমের উদ্ভব হয়েছে। (আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া কিতাবুত তাওহীদ)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেনঃ তুমি কলেমার ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছো তাতে আমি খুশী। তোমার জানামতে, অধিকাংশ লোকই লা-ইলাহা ইল্লাহর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এইযে, যদি মুখে কলেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই ছয়টি অথবা সাতটি বিষয়ে তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফ্‌রী ও মুনাফিকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে ছয়টি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব একজন মুসলমানের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মুর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কলেমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালেমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবীগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃনা, থাকবে এমন গ্রহণ যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কলেমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি।

www.pathagar.com

একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালেমার দাবী, অপরিহার্য বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারনে। কলেমার এসব দাবী ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়। * উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে,সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান 'প্রজ্ঞা' ভাল-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়
তাওহীদের মৌলিক উপাদান (রুকন)
বনাম
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌলিক উপাদান

রুকন হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। কিন্তু বিষয়টির অস্তিত্বের কারণে অন্য বিষয়ের অস্তিত্ব অবধারিত হয় না। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই।

রুকন এবং শর্তের মধ্যে পার্থক্যঃ

রুকন কোন জিনিসের আভ্যন্তরিন বিষয়, শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। অতএব কোন জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না। আর শর্ত হচ্ছে, কোন জিনিসের বহির্গত বিষয়। কবুল হওয়া না হওয়ার বিষয়টি এর উপর নির্ভরশীল। মোদ্দাকথা শর্ত পূরণ হওয়া ব্যতীত কোন জিনিস কবুল হয়না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও নামাজের মতোই রুকন আছে। নামাজ যেমন তার রুকন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি নামাজের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার নামাজ যেমন ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনি ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না।

তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান)

তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "তাগুতকে অস্বীকার করা"। আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে "এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা"। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বানীঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়"। (আল-বাক্বারাহঃ ২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে العروة الوثقى (শক্ত রজ্জু) বলতে কলেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলতঃ তাওহীদের

www.pathagar.com

কলেমা। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্নিত হাদীসে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

من قال لا اله الا الله وكـفـر بـما يعبد من دون الله فقد حرم ماله و دمه وحسابه على الله عز و جل -

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো আর আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করলো তার জান ও মাল পবিত্র " (অর্থাৎ কাফেরদের জান ও মালের মতো গনিমতের মাল নয়।) এবং তার হিসাবের ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত (অর্থাৎ মনের কুফরীর বিচার আল্লাহই করবেন।)

প্রথম রুকনঃ তাগুতকে অস্বীকার করাঃ

প্রিয় ভ্রাতা, (আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের দিশা দান করুন-) আপনাকে জেনে রাখতে হবে যে, তাগুতের কুফরী ব্যতীত একজন বান্দা কখনো "মুওয়াহ্হিদ" (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) হতে পারে না। আর তাগুত কি জিনিস তা জানা ব্যতীত, তাগুতকে অস্বীকার করা কখনো সম্ভব নয়।

আভিধানিকভাবে তাগুতের সংজ্ঞা ঃ তাগুত আরবী طغيان (তুগইয়ান) শব্দ থেকে উৎসরিত। যার অর্থ সীমা লংঘন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ-

"যখন জলোচ্ছাস হয়েছিলো তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম" (আল-হাককাহ - ১১) এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'যখন পানি বৃদ্ধি পেয়ে তার সীমা অতিক্রম করেছিল।

শরীয়তের পরিভাষায় তাগুতের সংজ্ঞা ঃ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই "তাগুত" যে, খোদাদ্রোহী হয়েছে এবং সীমা লংঘন করেছে, আর আল্লাহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

সুস্পষ্ট ভাবে তাগুতের অর্থ হচ্ছে, কোনো মাখলুক (সৃষ্টি) নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়কে (আল্লাহর স্থলে) নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা ঃ

এক ঃ কোনো মাখলুক (সৃষ্টি) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলীর যে কোনো কার্য সম্পাদনের বিষয়টি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা । যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক দান অথবা শরীয়ত (বিধান) রচনা। এসব বিষয়গুলো সম্পাদনের ব্যাপারকে যে ব্যক্তি নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করবে (অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি সৃষ্টি করি আমি রিজিক দান করি, আমি বিধান রচনা করি) সেই "তাগুত"।

www.pathagar.com

দুই ঃ কোনো মাখলুক (সৃষ্টি) আল্লাহ তায়ালার কোনো সিফাত [বা গুণ] কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা । যেমন এলমে গায়েব জানা । যদি কেউ তা করে [অর্থাৎ বলে আমি এলমে গায়েব জানি] তাহলে তাকে তাগুত হিসেবে গণ্য করা হবে ।

তিন ঃ যে কোনো ইবাদত মাখলুক কতৃক (বা সৃষ্টির) এর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা । যেমনঃ দোয়া, মান্নত, নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই, অথবা বিচার ফয়সালা চাওয়া। যদি [কোনো মাখলুক] এসব ইবাদত [নিজের জন্য] স্বীকার করে নেয় বা মেনে নেয়, তাহলে সেই তাগুত। ব্যক্তির নীরবতা, অস্বীকার না করাও স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হবে যদি না সে এ অবস্থা থেকে নিজেকে পবিত্র অথবা মুক্ত করে নেয় ।

উপরোক্ত যে তিনটি বিষয় আলোচনা করেছি, তার যে কোনো একটি বিষয়কে যদি কেউ নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বা নিজের জন্য সম্পাদন করে তাহলে সে তাগুত হিসেবে গণ্য এবং নিজেকে আল্লাহর সমতুল্য বলে সাব্যস্ত করে নিলো ।

ইমাম মালেক (রহঃ) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ এমন প্রতিটি জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয় ।

(তাফসীর ইবনে কাসীর সুরা নিসা ঃ ১৫ ও সুরা বাকারাহ ঃ ৫২)

এ সংজ্ঞাটি উত্তম এবং ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, এমন সব কিছুই এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যে সব মাবুদ (উপাস্য) কে তাগুত হিসেবে গণ্য করা হয় সে গুলোর মধ্যে রয়েছে মূর্তী, এমন সব কবর, গাছ, পাথর ও অচেতন পদার্থ যেগুলোর উপাসনা করা হয়। আল্লাহর আইন ব্যতীত এমন সব আইন যার মাধ্যমে বিচার-ফয়সলা চাওয়া হয়। এমন সব বিচারক তাগুতের অন্তর্ভূক্ত যারা আল্লাহর আইনের বিরোধী আইন দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে। শয়তান, যাদুকর, গণক (যারা এলমে গায়েবের বিষয় কথা বলে), উপাস্য হতে যারা রাজী, যারা নিজেদেরকে কোনো কিছু হালাল, হারাম করা ও আইন রচনা করার অধিকার রাখে বলে মনে করে, তারা সবাই তাগুত। তাদেরকে অস্বীকার করা ওয়াজিব, তাদের কাছ থেকে এবং তাদেরকে যারা উপাসনা করে উভয়ের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা অত্যাবশ্যক ।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহঃ) বলেনঃ

ওলামায়ে কেরামের উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ব্যতীত সকল মাবুদ [উপাস্য], সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে আহ্বান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে, তাগুতের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পরিপন্থী সব জাহেলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল। এর সাথে সাথে গণক, যাদুকর ও কবরবাসীসহ অন্যান্য বস্তুর উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে [কবর, মাযার ইত্যাদির খাদেম] তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল। (মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১ পৃঃ)

www.pathagar.com

প্রধান প্রধান তাগুত

ইমাম মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন : তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরনের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছেঃ

এক ঃ গাইরুল্লাহর [আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু] ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী শয়তান। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বাণী।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

"হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন"।
(ইয়াসীন : ৬০)

দুই ঃ আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক। এর দলিল; আল্লাহ তায়ালার বাণী।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ –

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আন-নিসা ঃ ৬০)

তিন ঃ আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ–

"যারা আল্লার নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করেনা তারাই কাফের।" (আল-মায়েদাহ ঃ ৪৪)

এর দ্বারা এমন বিচারক বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহর শরীয়তকে পরিবর্তনকারী কোনো বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করে।

চার ঃ আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি এলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন।

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا–

"তিনি আলিমুল গায়েব [অদৃশ্যের জ্ঞানী] বস্তুতঃ তিনি স্বীয় গায়েবের [অদৃশ্য] বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না । (আল জ্বিনঃ ২৬)

পাঁচ ঃ আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং এ ইবাদত গ্রহণে যে রাজী বা সন্তুষ্ট থাকে। এর দলীল, আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ

"তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দিবো। আমি জালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।" (আম্বিয়া-২৯)

www.pathagar.com

ولا يشرك بعبادة ربه احدا আল্লাহ তায়ালার এ বাণী প্রসংগে তিনি আরো বলেন যে, এ আয়াতের অর্থবহ জ্ঞান একমাত্র ঐ ব্যক্তির পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব যে রুবুরিয্যাত ও উলুহিয্যাতের তাওহীদ (অর্থাৎ 'রব' হওয়ার বিষয়ে এবং 'ইলাহ' হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর একত্ববাদ) এর মধ্যে সম্পূর্ন রূপে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং অধিকাংশ মানুষ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা জানে, অর্থাৎ হয় মানুষ এমন তাগুতের ভূমিকায় রয়েছে যার ফলে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে তারা ঝগড়া করে কিন্তু মুশরিক যে ধরনের শিরক করেছে সে পর্যায়ে তারা এখনো পৌছেনি, না হয় তারা মুশরিকদের সমর্থন করে, এবং তাদের অনুসরণ করে অথবা তাদের অবস্থা এমন ব্যক্তির মতো, যে সন্দেহের আবর্তে নিমজ্জিত, সে জানেনা আল্লাহ তাঁর রাসুলের (সাঃ) ওপর কি অবতীর্ণ করেছেন, এবং সে রাসূল (সঃ) এর দ্বীন আর খৃষ্টানদের দ্বীনের মধ্যে পার্থক্য করতেও সক্ষম নয়। (তারিখে নজদ লি হাসান বিন গানাম)

তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করবেন

পাঁচ ভাবে তাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্যঃ

এক ঃ তাগুতের ইবাদত বাতিল এ আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ -

"এটা এ জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য। আর আল্লাহ ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা বাতিল ও অসত্য। আল্লাহই সবার উচ্চে এবং আল্লাহই মহান"। (হজ্জ ঃ ৬২)

দুই ঃ তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

এর অর্থ হচ্ছে তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করা, পরিহার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (নাহল ঃ ৩৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ-

"সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো, আর মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাকো"। (হজ্জ ঃ ৩০)

www.pathagar.com

এটা অবশ্যই জেনে রাখতে হবে যে, তাগুত এবং মূর্তির কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য গমন করা, তাদের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা এবং তাদের জন্য মান্নত করা, তাদের ইবাদত করার মধ্যেই শামিল।

হাফেজ ইবনে কাসির (রহঃ) এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেনঃ

মূর্তিরপূজা, এর কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য যাওয়া এবং এর মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া সহ জাহেলী যুগের লোকেরা যে সব জঘণ্য গুণার কাজ করতো এসব তাগুত তথা শয়তানের ইবাদতের মধ্যে শামিল। (সুরা আল বাক্বারার ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)

একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, **তাগুত তিন ভাবে** পরিত্যাগ করা যায়।

প্রথমত ঃ আক্বীদা বা বিশ্বাসগত ভাবে।

দ্বিতীয়ত ঃ কথার মাধ্যমে।

তৃতীয়ত ঃ কাজের মাধ্যমে।

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে বান্দা তাগুতকে পরিত্যাগ করতে না পারলে সম্পূর্ন রূপে তাগুতকে পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে না । কেননা

যে ব্যক্তি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু আক্বীদাগত ভাবে পরিত্যাগ করেনা, তার অবস্থা মুনাফিকের মতো।

যে ব্যক্তি আক্বীদাগত ভাবে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু কথায় পরিত্যাগ করেনা, তার অবস্থা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো যে মূর্তি, প্রতিমা ও তাগুতকে সম্মান করে।

যে ব্যক্তি আক্বীদাগত ভাবে তাগুতকে পরিত্যাগ করে কিন্তু কাজের মাধ্যমে পরিত্যাগ করেনা তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতো যে, তাগুতকে সেজদা করে অথবা তার উদ্দেশ্যে মান্নত করে, অথবা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুতের কাছে যায়, আবার এ দাবীও করে যে তার আক্বীদা শুদ্ধ আছে।

অতএব উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে তাগুতকে পরিত্যাগ করতে না পারলে বান্দা তাগুতকে পরিত্যাগকারী হিসাবে গণ্য হবে না।

আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল-শাইখ তাঁর "তাইসীরুল আজীজিল্ হামীদ" নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ ..... আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত কিতাব ও সুন্নাহ [কুরআন ও হাদীস] ব্যতীত তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা না নিয়ে যাওয়া ফরজ, একথার সুস্পষ্ট দলীল বা প্রমাণ। যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়, সে মুমিনও নয় এমনকি মুসলমানও নয়।

এখানে একটি ব্যাপারে শতর্ক থাকা অত্যাবশ্যক আর তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করা, তাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ তাগুতী স্বভাব ও প্রকৃতির দৃষ্টি কোন থেকে দিয়েছেন, তখন যে 'হক' আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য প্রযোজ্য নয় তা তাগুতের জন্য নিবেদন করা কখনো উচিৎ নয়।

www.pathagar.com

অতএব, যার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা হয়, তাগুত যদি এই শ্রেণীভূক্ত হয়, তাহলে বান্দার করণীয় হচ্ছে তার দ্বারা সাহায্য কামনা না করা। তাগুত যদি এমন শ্রেণীর হয় যার উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা হয় এবং এর মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করা হয়, তাহলে বান্দার করণীয় হচ্ছে তার উদ্দেশ্যে পশু জবাই না করা । তাগুত যদি এমন শ্রেণীর হয় যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় তাহলে বান্দার করণীয় হচ্ছে তার কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য না যাওয়া ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ এই জন্যই যে ব্যক্তির কাছে আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়। [অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার-ফয়সালা কারীই তাগুত] (মাজমু উল ফতোয়া ৭০১/৭৮পৃঃ)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগুত, কওমের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (সঃ) বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা চায়। (এ'লামু মুকিঈন ৪০/১পৃঃ)

তিন ঃ দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমেঃ

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করতঃ বলেনঃ

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ لا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ز فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي
إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ -

"ইবরাহীম বললো ঃ তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসতেছো, সে গুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো ? এরা সবাইতা আমার দুশমন একমাত্র রাব্বুল আলামীন ছাড়া।" (আশ্ শুআরা ঃ ৭৫-৭৭)

চার ঃ ক্রোধ ও ঘৃনার মাধ্যমে ঃ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ج إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا
بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ-

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো ঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা " । (আল মুমতাহিনা ঃ ৪)

www.pathagar.com

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ নামক গ্রন্থের ১/৯৩ পৃষ্ঠায় الدرر السنية لعلماء النجد كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ আয়াতের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে এ আয়াতটি এ কথারই প্রমাণ যে, মানুষ যদি তার রবের আনুগত্য, মুহাব্বত এবং তিনি যা পছন্দ করেন তার মুহাব্বতে ইবাদত করে, কিন্তু মুশরিকদেরকে এবং তাদের কাজকে ঘৃণা করেনা, বিরোধিতা করে, তবে সে তাগুতকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। আর যে ব্যক্তি তাগুতকে পরিত্যাগ করতে পারেনি সে ইসলামেও প্রবেশ করতে পারেনি। অতএব সে কাফের যদিও সে রাত জেগে ইবাদত করার মাধ্যমে আর দিনে রোযা রাখার মাধ্যমে উম্মতের সবচেয়ে বড় আবেদ ও বুজুর্গ ব্যক্তি হয়ে থাকে। তার অবস্থা হচ্ছে ঐ নামাজী ব্যক্তির মত, যে ফরজ গোসল ব্যতীত নামাজ আদায় করলো অথবা তীব্র গরমের দিনে নফল রোযা রেখে রমযান মাসে দিনের বেলা অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকলো।

পাঁচ ঃ অস্বীকার বা কুফরী করার মাধ্যমে ঃ

অর্থাৎ তাগূতকে অস্বীকার করা। তাগুতের যারা উপাসনা করে এবং নেতৃত্বের আসনে বসায় তাদেরকে অস্বীকার করা এবং যে ব্যক্তি কুফরী মতবাদের প্রবর্তন করে অথবা কুফরীর দিকে আহবান জানায় তাকে অস্বীকার করা।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন ঃ " আদম সন্তানের ওপর আল্লাহ তাআ'লা সর্ব প্রথম যে ফরজটি চাপিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে, তাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা "। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

"আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগূত থেকে নিরাপদ দুরত্বে থাকো " (নাহল ঃ৩৬)

তাগুতকে অস্বীকার করার ধরন বা প্রকৃতি হচ্ছে , গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল বলে বিশ্বাস করা, গাইরুল্লাহর ইবাদত পরিহার করা, গাইরুল্লাহর ইবাদত কারীদেরকে অস্বীকার বা কুফরী করা এবং তাদের বিরোধিতা করা। " তিনি আরো বলেন ঃ তাগুতের সাথে কুফরী করা অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবেনা। এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ-

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে সেই সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে।" (আল বাক্বারাহ্ ঃ ২৫৬) (মাজমুআতুত্ তাওহিদ আররিসালাতুল উলা ১৪-১৫পৃঃ)

তিনি আরো বলেন ঃ

ভাই সব, আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি; আপনারা আপনাদের দ্বীনের মূলকে আঁকড়ে ধরুন, আঁকড়ে ধরুন অদ্যোপান্ত এবং আপদমস্তক। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করুন। এর অর্থ অনুধাবন করুন। এ

www.pathagar.com

কলেমাকে ভালবাসুন। ভাল বাসুন এর ধারক ও বাহকদেরকে। তাদেরকে আপনারা আপনাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিন যদিও তারা আপনাদের কাছ থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। তাগুতগুলোকে আপনারা অস্বীকার করুন। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করুন। তাদেরকে ঘৃণা করুন। ঘৃণা করুন ঐ সব লোকদেরকে, যারা তাদেরকে ভালবাসে, তাদের পক্ষে যারা তর্ক করে অথবা যারা তাদেরকে অস্বীকার করে না। অথবা একথা বলে যে, তাদের ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। অথবা বলে তাদেরকে কিছু বলা বা করার দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দেননি। একথা বললে অবশ্যই সে আল্লার প্রতি জঘণ্য মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। তাদেরকে অস্বীকার করা আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। যদি তারা ভাই কিংবা সন্তানও হয় তবু তাদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে বলেছেন।

আল্লাহর ওয়াস্তে এ আদর্শকে আকড়ে ধরুন। আপনাদের রবের সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। হে আল্লাহ, মুসলমান হিসেবে আমাদের মৃত্যুদান করুন এবং নেককার লোকদের সাথে আমাদেরকে মিলিয়ে দিন।

দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ ঃ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান।

তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলী (আসমা ও সিফাত) এর ক্ষেত্রে একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়া এবং এমন সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ববাদকে মেনে নেয়া যা একমাত্র তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান তিনটি ভাগে বিভক্ত।

এক ঃ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে খাস (বিষেশিত) আল্লাহর এমন যাবতীয় কর্মের প্রতি ঈমান পোষণ করা । যেমন : সৃষ্টি করা, রিযিক প্রদান, বিধান রচনা করা ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালার কর্মের অন্তর্ভূক্ত। এ কাজগুলো আল্লাহর একক ক্ষমতার অধীন। তাই এ কাজগুলো এক আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এ সব কাজে গাইরুল্লাহর অংশ গ্রহণকে অস্বীকার করতে হবে। এ সব কাজের বিন্দুমাত্র অংশও গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যাবেনা।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন। এরপর জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে পারবে ? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।" (আর-রূম ঃ ৪০)

www.pathagar.com

দুই ঃ আল্লাহ তায়ালার আসমা ও সিফাত [নাম ও গুনাবলীর] প্রতি ঈমান । এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ঐ সমস্ত নাম ও গুনাবলীর [আসমা ও সিফাত] প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেগুলো আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কোনো নাম ও গুণকে আকৃতি বিশিষ্ট বলা যাবেনা, নিরর্থক বা অকার্যকর বলা যাবে না, পরিবর্তন করা যাবে না, (সৃষ্টির) সমতুল্য বলা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

"বিশ্বলোকের কোনো কিছুই তাঁর (আল্লাহর) মতো নয়। অথচ তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" (আশ-শুরা ঃ১১)

অতঃপর যে সব নাম ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহরই জন্য প্রযোজ্য সেগুলোকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করতে হবে এবং কোনো প্রকার অংশীদারীত্ব থেকে এগুলোকে মুক্ত রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ-

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউ গায়েবের খবর জানেনা।"(আন-নামল ঃ ৬৫)

তিন ঃ আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের প্রতি ঈমান।

এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন "ইলাহ এবং মা'বুদ" (উপাস্য) একথা বিশ্বাস করা। দোয়া, রুকু, সেজদা, মানতসহ যাবতীয় ইবাদতের নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। যাবতীয় ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদন করতে হবে। ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করা যাবেনা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا-

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। (আন্-নিসাঃ ৩৬)

www.pathagar.com

বান্দা কিভাবে আল্লাহর মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদের) অনুসারী হবে।

একথা অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, বান্দা দুটি বিষয় ব্যতীত আল্লাহর "মুওয়াহহিদ" বা একত্ববাদের অনুসারী হতে পারবেনা।

প্রথম বিষয় ঃ আল্লাহর হক বা অধিকার সম্পর্কে জানা এবং তাঁর হককে তাঁরই জন্য সাব্যস্ত করা।

আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ হক বা অধিকার তিনটিঃ

প্রথম হকঃ সেইসব কর্ম যেগুলো একমাত্র আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সেগুলো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথেই খাস, অন্যের সাথে নয়। এ জাতীয় কর্মগুলো গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা কোনো মানুষের জন্য জায়েয নেই, চাই সে গাইরুল্লাহ কোনো সম্মানী ফেরেস্তা হোক অথবা কোনো নবীই হোক। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যে কাজগুলো অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত করা জায়েয নেই সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনা। আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করেন। তিনিই রিযিক দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, উপকার ও ক্ষতি সাধনের একমাত্র মালিক তিনি। সকল বিষয় নিয়ন্ত্রন করেন এবং গোটা বিশ্ব তিনি পরিচালনা করেন। তিনি হুকুম জারি করেন, বিধান রচনা করেন। তাঁর হাতেই নিবদ্ধ প্রতিটি জিনিসের সার্বভৌম ক্ষমতা।

দ্বিতীয় হক ঃ আল্লাহ তায়ালার সেই সব আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) যেগুলো দ্বারা তিনি বিশেষিত এবং একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। এ সব নামও গুণাবলীর কোন অংশই গাইরুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা কারো জন্যই জায়েয নেই। চাই সে গায়রুল্লাহ কোনো সম্মানী ফেরেস্তা হোক অথবা কোনো নবীই হোক। আল্লাহ তায়ালার খাস নামগুলোর মধ্যে 'আল্লাহ' আহাদ, সামাদ, রাহমান কুদ্দুস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কারীম, রাহীম এবং মালিক (রাজা) নামগুলো আল্লাহ ও তাঁর বান্দহ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে সব সিফাত বা গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সেগুলোর মধ্যে রয়েছে كمال القدرة (কামালে কুদরাত) অর্থাৎ ক্ষমতা ও শক্তির পূর্ণাঙ্গতা। কেননা, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আরো একটি গুণহচ্ছে كمال العلم (কামালে এলেম) অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গতা, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান দিয়ে সব কিছুই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই যেমনি ভাবে এলমে গায়েব জানার মতো গুণ একমাত্র আল্লাহরই আছে। كمال السمع (কামালুস সামই)পূর্ণাঙ্গ শ্রবনের গুণ একমাত্র আল্লাহর অর্থাৎ তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রোতা। তিনি দূরে ও কাছের সব কিছুই শুনতে সক্ষম এগুলো ছাড়া আরও' বহু সিফাত বা গুণ এমন রয়েছে যেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য।

তৃতীয় হক ঃ নিরঙ্কুশ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই খাস। ইবাদত হচ্ছে বান্দর ওপর আল্লাহর হক বা অধিকার। বান্দারা

www.pathagar.com

তাদের ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্যে নিবেদন করবে। অন্য কিছুকেই তাঁর সাথে ইবাদতের মাধ্যমে শরীক করবেনা । কেননা একমাত্র তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে রিযিক দান করেছেন, তাদের জীবন ও মৃত্যু দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করনে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْئٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর রিযিক দান করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন আবার জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে সক্ষম হবে ? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।" (আর রূম ঃ ৪০)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এর ফলে তোমরা খোদা-ভীতি অর্জন করতে সক্ষম হবে। তিনিই তোমাদের জন্য মাটিকে বিছানা আর আকাশকে ছাদ সরূপ স্থাপন করেছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফল উৎপাদন করেছেন। অতএব আল্লাহর সাথে তোমরা জেনে-শুনে অন্য কাউকে সমকক্ষ করোনা।" (আল-বাকারাহ্ঃ ২১-২২)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত মুআয (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ) এর পিছনে একই গাধার পিঠে সওয়ারী অবস্থায় ছিলাম । তখন রাসূল (সঃ) আমাকে বললেনঃ হে মুআয তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর কি হক [অধিকার] আর আল্লাহর ওপর বান্দার কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সঃ) বললেন ঃ বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে, বান্দারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবেনা। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করবে, তাকে তিনি শাস্তি দিবেন না। হযরত মুআয বললেনঃ আমি কি এ শুভ সংবাদটি লোকদেরকে জানিয়ে দেবোনা? তিনি বললেনঃ তুমি তাদেরকে এ শুভ সংবাদ জানিওনা, তাহলে তারা আমল ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

www.pathagar.com

যেসব ইবাদত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করা যায়না সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ দোয়া, রুকু, সেজদা, মহাব্বত, তাজীম (ভক্তি), ভয়, আশা, আকাংখা, তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন, আসক্তি ও আগ্রহ, ভীতি, বিনয়, মিনতি, তাওয়াক্কুল (ভরসা) সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করা, নযর বা মানত করা, যবাই করা, তাওয়াফ করা, বিচার প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইবাদত হিসেবে গণ্য । এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয় যদি গাইরুল্লাহর জন্য সম্পাদন করা হয়, তাহলে সে মুশরিক ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে যদিও সে নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, হজ্জ করে আর নিজেকে একজন মুসলিম হিসেবে দাবী করে।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ আল্লাহর একাত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁরই ইবাদত করা। কেননা আল্লাহর ইবাদত এবং তাওহীদ দুটি রুকন বা স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) তাগুতের সাথে কুফরী,

(২) আল্লাহর প্রতি ঈমান।

(১) তাগুতের সাথে কুফরীঃ এ বিষয়টি তাওহীদের রুকন (অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভ) গুলোর মধ্যে প্রথম রুকন। এ অত্যাবশ্যকীয় স্তম্ভটি বিশ্বাস, কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাগুতের সাথে কুফরী করা ব্যতীত কখনো সহীহ (শুদ্ধ) হবে না। বান্দা যখনই তার বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাগুতের সাথে কুফরী করবে তখনই সে তাগুতকে অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে। এ তিনটি অপরিহার্য বিষয়ের কোনো একটিতে যদি গন্ডগোল থাকে, তাহলে বান্দা তাগুতের অস্বীকারকারী হিসেবে গণ্য হবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

"আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছেই এ মর্মে রাসুল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাগুত থেকে দূরে থাকবে।"

(নাহল ঃ ৩৬)

ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, তাগুত থেকে দূরে থাকতে হবে বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে । এর উদাহরণ হচ্ছে, কোন মানুষ বিশ্বাস করলো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বিধান রচনার মালিক এবং এ কথা মুখে উচ্চারণও করলো। কিন্তু পরবর্তীতে একথার ওপর সে প্রতিষ্ঠিত থাকলো না বরং কোনো কুফরী কাজ করে ফেললো, যেমন কাজের মাধ্যমে বিধান রচনার শক্তি ও অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নিলো। আইন ও বিধান রচনার নিরঙ্কুশ অধিকারের ক্ষেত্রেযা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার রয়েছে-নিজেকে জড়ানোর জন্য সে কর্মক্ষেত্রে আল্লাহর রুবুবিয়াতের মধ্যে শিরককারী বা মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ দ্বীন বান্দার অন্তরে থাকবে বিশ্বাস, মুহাব্বত ও [তাগুতের প্রতি] ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে। দ্বীন মুখে থাকবে হক কথা উচ্চারণ আর কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। আর অঙ্গেরমধ্যে দ্বীন থাকবে ইসলামের রুকন (অপরিহার্য মৌলিক শর্তাবলী) গুলো পালন করা এবং কুফরী কার্যাবলী পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। এ

www.pathagar.com

তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটিতে গন্ডগোল থাকলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলো।

(২) আল্লাহর প্রতি ঈমানঃ এটা হচ্ছে তাওহীদের দ্বিতীয় রুকন (মৌলিক স্তম্ভ) । এ স্তম্ভটি সহীহ বা শুদ্ধ ততক্ষন পর্যন্ত হবেনা যতক্ষন না বান্দা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে এবং তাঁরই ইবাদত করবে। বান্দা আল্লাহর প্রতি যখনই তার আক্বীদা [বিশ্বাস] কথা ও কাজের মাধ্যমে তার রবের প্রতি ঈমান আনবে তখনই তাকে মুমিন বিল্লাহ [আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করী] বলা হবে। এ তিনটি অপরিহার্য বিষয়ের কোনো একটিতে গন্ডগোল থাকলে বান্দা মুমিন বিল্লাহ [আল্লাহর বিশ্বাস স্থাপনকারী] হতে পারবেনা।] ইমাম আল্ আজরী (রহঃ) তার "আশ শারীয়াহ" নামক গ্রন্থে এসংক্রান্ত একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। উক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেনঃ ঈমান হচ্ছে আন্তরিক ভাবে সত্যায়ন, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কার্য সমপাদন। একত্রে এ তিনটি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত বান্দা মুমিন হতে পারবেনা [অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, মুখে স্বীকার করবে, শরীর দিয়ে তাঁর বিধান কায়েম করবে] অতএব বান্দা আল্লাহর মুওয়াহহিদ' [আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী] হিসেবে গন্য হবে দুটি বিষয়ের মাধ্যমেঃ

একঃ আল্লাহর হক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। এ ব্যাপারে তিনটি হক সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দুইঃ আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া এবং [আক্বীদা] বিশ্বাস কথা এবং কাজের মাধ্যমে তার ইবাদত করা । এ ব্যাপারে বিশ্বাস, কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের ধরন সম্পর্কিত আলোচনা [দ্বিতীয় বিষয়ে] করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে, বান্দার মধ্যে তাগুতের সাথে কুফরী করার যাবতীয় অপরিহার্য বিষয় এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য বিষয়গুলো পুরোপুরি ভাবে পাওয়া যাওয়া প্রয়োজন।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তার كشف الشبهـــات 'কাশফুশ্ শুবহাত' নামক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ

এতে কোনো মতবিরোধ নেই যে, তাওহীদ নিশ্চিত হতে হবে অন্তর, জবান ও আমলের মাধ্যমে। যদি এর মধ্যে বিন্দুমাত্র গন্ডগোল থাকে, তাহলে একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না।

তিনি আরো বলেন ঃ এ ব্যাপারে উম্মতের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই যে, তাওহীদ অবশ্যই হতে হবে অন্তর দিয়ে, যার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ সংক্রান্ত জ্ঞান। তাওহীদ হতে হবে জবান দিয়ে যার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ সংক্রান্ত কথা। তাওহীদ হতে হবে আমল বা কর্ম দ্বারা যার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বিধি-নিষেধ বাস্তবায়ন করা। যদি কেউ এর চেয়ে কম করে, তাহলে সে মুসলিম হতে পারবেনা । যদি কেউ আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে কিন্তু স্বীকৃতি মোতাবেক আমল করেনা, তাহলে সে ফেরাউন এবং ইবলিসের মতো বিদ্রোহী কাফের হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি বাহ্যতঃ তাওহীদ অনুযায়ী আমল করে কিন্তু গোপনে তা বিশ্বাস করেনা তাহলে সে খাটি মুনাফিক হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে কাফেরের চেয়েও খারাপ। (আদ দুরার আস্ সুন্নিয়া ১৭৪/৭পৃঃ)

www.pathagar.com

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবা-বাতিন (রহঃ) বলেনঃ

"একজন মুসলমান যখন এ কথার [তাওহীদের] মহত্ব বুঝতে পারলো এবং এর শর্তাবলীর ব্যপকতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন অবশ্যই "তাওহীদ" হতে হবে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অপরিহার্য মৌলিক বিষয়গুলো কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে। এ বিষয়গুলোর কোনো একটির মধ্যে যদি গন্ডগোল থাকে, তাহলে বান্দার পক্ষে মুসলমান হওয়া সম্ভব নয় । কোনো লোক যদি মুসলমান হয় এবং তাওহীদের আরকান (মৌলিক বিষয়গুলো) কার্যে পরিণত করে অতঃপর তার কোনো কথা, কাজ ও বিশ্বাস তাওহীদের পরিপন্থী এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তার ঐসব লোক দেখানো আমলগুলো কোনো কাজে আসবেনা। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা তাবুক যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে যারা অজুহাত পেশ করেছিলো তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ-

"তোমরা টাল বাহানা করোনা। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছো।" (আত-তাওবাহঃ ৬৬)

আল্লাহ তায়ালা অন্যদের ব্যাপারে বলেন ঃ

وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ (توبه ٧٤)-

"তারা অবশ্যই কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে।" (আত-তাওবাহঃ ৭৪)

আল্লামা সুলাইমান বিন সাহমান (রহঃ) বলেন ঃ

অবশ্যই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের মধ্যে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস, মুখ দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাওহীদের অপরিহার্য মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন বা আমলের কথা থাকতে হবে। এগুলোর কোনো একটির মধ্যে অসুবিধা থাকলে কোনো ব্যক্তি মুসলমান হতে পারবেনা। কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়ে অপরিহার্য মৌলিক বিষয়গুলো আমল করে অতঃপর তার মধ্যে এমন কথা অথবা কাজ অথবা এমন বিশ্বাস পাওয়া যায়, যা তাওহীদের পরিপন্থী বা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে তার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য প্রদান কোনো কাজে আসবেনা। কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের নেতৃস্থানীয় ইমামগণের কথাও এর পক্ষে অগণিত দলীল, প্রমাণ হিসেবে গণ্য। (আদদারর সুন্নাহ ৩৫০/৭)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন আল শাইখ (রহঃ) বলেনঃ

মুরতাদদের হুকুমের [বিধান] ব্যাপারে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে; একজন ব্যক্তি যে কথা বলে সে কথার দ্বারা কুফরী করতে পারে অথবা সে যে কাজ করে সে কাজ দ্বারাও কুফরী করতে পারে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাক্ষ্য দান করা, নামাজ পড়া, রোজা ও যাকাত আদায়ের পরও উক্ত কুফরীর কারণে সে মুরতাদ [ধর্ম ত্যাগি] হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বাতিল হয়ে যেতে পারে তাঁর যাবতীয় নেক আমল, বিশেষ করে যদি সে [তওবা ছাড়া] মৃত্যু বরন করে। বান্দার আমল বাতিল বা নষ্ট হওয়ার পক্ষেই ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমত। তবে যদি মৃত্যুর পূর্বেই বান্দা তওবা করে সে ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। (আদ্ দুরার আস্ সুন্নিয়াহ ১১/৫৮৬)

www.pathagar.com

তৃতীয়
তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয়
বনাম
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিনষ্টকারী বিষয়

'নাকেদ্ব' বা বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, নামাজ বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, তেমনিভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। মুসল্লি যদি নামাজ বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটিতে পতিত হয়, তাহলে সাথে সাথে তার নামাজ বাতিল হয়ে যায়। যেমন নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাসা, কিছু আহার করা বা পান করা ইত্যাদি। এমনি ভাবে তাওহীদ বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় রয়েছে যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার তাওহীদ বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে সে কাফের মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়।

তাওহীদ বিনষ্টকারী কতিপয় বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি এ প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক [কাউকে] করেন, তবে আপনার সকল আমল বাতিল বা নিষ্ফল হয়ে যাবে। এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।" (আয-ঝুমার ঃ ৬৫)

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম স্থির করা যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ-

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারেনা উপকারও করতে পারেনা। তারা বলেঃ এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" (ইউনুস ঃ ১৮)

www.pathagar.com

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরের উদ্দেশ্যে যারা যায় তাদের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসিকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়, কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে যেমনঃ তাদের কাছে দোয়া করা, তাদের উদ্দেশ্যে মানত করা, পশু যবাই করা, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করা।

৩। মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদকে সহীহ মনে করা। এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলমানের সন্দেহ পোষণ করা যেমনঃ ইহুদী নাসারা মুশরিক [অর্থাৎ ইহুদী নাসারা ও মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই, তাই কোনো মুসলমান এব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেনা। করলে সেও কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।] এ দৃষ্টি কোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরনের মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেন ঃ শিরক নামকরণকৃত কতিপয় বিষয়ের ওপর শুধু মাত্র শিরক নাম জুড়ে দিলেই শিরক বলা যায়না, বরং শিরক হচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করা যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। চাই সে কাজ জাহেলী যুগের কোনো নামেই হোক, অথবা বর্তমান যুগের অন্য কোনো নামেই হোক। এক্ষেত্রে নামে কিছুই আসে যায়না। [অর্থ্যৎ কোনো কাজ যদি শিরকের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাহলে সেটা যে যুগেই হোক, আর যে নামেই হোক, শিরক হিসেবেই গণ্য হবে। যেমনঃ ভক্তির নামে গাইরুল্লাহকে সেজদা করা]

৪। রাসূল (সঃ) এর দ্বীন, অথবা [পূন্য কাজের] সাওয়াব অথবা [পাপের জন্য] শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয় রং-তামাশা বিদ্রুপ করা কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُوْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ-

"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে, তার রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তামাশা করো না, তোমরা তো ঈমান প্রকাশ করার পর কাফের হয়ে গেছো।" (আত-তাওবাহ ঃ ৬৫-৬৬)

৫। যাদু ঃ যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু-মন্ত্র দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। তাওলা হচ্ছে [যাদু মন্ত্রের সাহায্যে] স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূত করণ, যাতে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামী পাগল প্রায় হয়ে থাকে। এটা শিরক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা বিপদাপদ দূর করা এবং উপকার বা কল্যাণ সাধনের বিষয়টিকে গাইরুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয় । এটা নিঃসন্দেহে কুফরী।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ-

"তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতোনা যে, দেখো, আমরা নিছক পরীক্ষা মাত্র অতএব তুমি কুফরী করোনা।"

(আল-বাকারাহঃ ১০২)

৬। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে [মুশরিকদেরকে] বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে হেদায়াত করেন না।" (মায়েদাহ ঃ ৫১)

৭। মূর্তি, প্রতিমা, মানব রচিত সংবিধান ইত্যাদি সহ অন্যান্য তাগুতকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার জন্য শপথ করা।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন ঃ অন্তরে আল্লার দ্বীনের স্থান হবে ধ্যান ধারনা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে, দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে, দ্বীনের স্থান হবে মুখে স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। এমনি ভাবে দ্বীনের স্থান হবে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যকর করা এবং যাবতীয় কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় যদি বান্দা পরিত্যাগ না করে তাহলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন পরিত্যাগ করলো বলে বিবেচিত হবে। (আদ্দোরার অস্‌সুন্নিয়া (৮/৭৮)

তাঁর কাশফুশ শুবহাত নামক পুস্তিকায় তিনি আরো বলেন ঃ এটা যখন নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে, কতিপয় মুনাফিক যারা রাসূল (সঃ) এর সাথে রুমের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ও তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথার দ্বারা কুফরী করেছে, তখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদের স্বল্পতার আশংকায় কিংবা কিছু প্রাপ্তির আশায় অথবা কারো মন তুষ্টির জন্য কুফরী কথা বললো অথবা কুফরী কর্ম করলো, সে অবশ্যই ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘণ্য কাজ করেছে যে ঠাট্টা ও বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছে।

৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা। ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ এ কারণেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে শিরক। আল্লাহর সাথে শিরকের ভিত্তি হচ্ছে মুহাব্বতের ক্ষেত্রে [আল্লাহর সাথে] শিরক করা। (আল জাওয়াবুল কাফি)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ-

"আর কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় অনেক বেশী।"
(আল-বাকারাহ- ১৬৫)

তাওহীদের অর্থ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের বক্তব্য।

মুজাদ্দিদ ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) [লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ নামক অধ্যায়ে] বলেনঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে, মহান, মর্যাদাকর ও মহামূল্যবান বাণী বা কলেমা। যে ব্যক্তিই এ কলেমা আকড়ে ধরলো সেই নিরাপদ থাকলো ও নিরাপত্তা অর্জন করলো। রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز و جل-

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললো এবং গাইরুল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার করলো, তার জান ও মাল, মুসলমানদের কাছে পবিত্র আমানত আর [মনের কুটিলতার] হিসাব-নিকাশ আল্লাহর তায়ালার ওপরই ন্যাস্ত।"
(মুসলিম)

হাদীসটি এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' নিজস্ব শব্দ এবং অর্থ রয়েছে। কিন্তু মানুষ এ ক্ষেত্রে [শব্দ ও অর্থের ব্যাখ্যার] তিনটি ফেরকায় বিভক্ত। একটি ফেরকার লোকেরা এ কলেমার কথা বলে এবং এর যাবতীয় অধিকার আদায় করে। তারা এ কলেমার অর্থ সম্পর্কে সচেতন এবং সে অর্থ মোতাবেক আমল করে। এ কলেমার সাথে সাংঘর্ষিক এবং কলেমা বিনষ্টকারী বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকে।

আরেকটি ফেরকা আছে যারা কলেমাকে বাহ্যিক দিক থেকে কলেমার কথা বলে। তারা কথার মাধ্যমে নিজেদের বহিদৃশ্যকে খুব সৌন্দর্যমন্ডিত করে তোলে, আর কুফরী ও কলেমার ব্যাপারে তাদের সন্দেহকে অন্তরে গোপন রাখে।

আরো একটি ফেরকা আছে যারা মৌখিক ভাবে কলেমার কথা উচ্চারণ করে। কিন্তু এর অর্থ মোতাবেক কোনো আমল করেনা। বরং কলেমার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো আমল করে তারা এমন লোক।

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

এখানে উল্লেখিত প্রথম ফেরকাটি হচ্ছে ফেরকা নাজিয়া [যারা আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে] এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন।

দ্বিতীয় ফেরকার লোকেরা হচ্ছে মুনাফিক আর তৃতীয় ফেরকার লোকেরা হচ্ছে 'মুশরিক'

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের এক শক্তিশালী দূর্গ। কিন্তু মুশরিকরা এর ওপর যুদ্ধের অস্ত্র চালিয়েছে। এর প্রতি তারা ধ্বংসের পাথর নিক্ষেপ করেছে। এর ফলে মুশরিক ও মুনাফিকদের শয়তান চড়াও হয়ে কলেমার অর্থকে তাদের কাছ থেকে ছিনেয়ে নিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে কলেমার মূল কথা থেকে বিচিছন্ন করে বাহ্যিক সূরতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم و ابدانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم-

"আল্লাহ তোমাদের সূরত আর তোমাদের শরীরের দিকে দৃষ্টি দেননা বরং তিনি দৃষ্টি দেন তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের আমলের দিকে।" [অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নিয়ত এবং আমল] তাদের কাছ থেকে শয়তান লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কেড়ে নিয়েছে। ফলে তাদের কাছে বাকী থাকলো শুধুই মুখের বাচালতা আর অর্থহীন বাকচারিতা, এর উদাহরণ হচ্ছে শক্তির উৎস তথা দূর্গের কথা বলা, কিন্তু এর সাথে সম্পর্কে না রাখা। এ যেনো ঠিক সেই আগুনের কথা বলা, যা দহন করতে অক্ষম, সেই পানির কথা বলা, যা ডুবাতে অক্ষম , সেই রুটির কথা বলা যা তৃপ্ত করতে অক্ষম, সেই তলোয়ারের কথা বলা যা কাটতে অক্ষম, এমনি ভাবে সেই দূর্গ বা শক্তির কথা বলা যা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম । কথা হচ্ছে ফলের ছাল বা তুষ সমতুল্য, আর অর্থ হচ্ছে কোন ফলের শাস বা মূল জিনিসের সমতুল্য। এমনি ভাবে 'কথা' হচ্ছে ঝিনুকের মতো, আর তার অর্থ হচ্ছে মুক্তার সমতুল্য । বান্দা কি করবে ফলের ছাল বা তুষ দিয়ে, যদি ফলের শাঁস পাওয়া না যায়, সে ঝিনুক দিয়ে কি করবে যদি তাতে মুক্তা পাওয়া না যায়? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থসহ তার স্থান হচ্ছে আত্মাসহ দেহের মতো। আত্মা বিহীন দেহের মধ্যে যেমন কোনো কল্যাণ নেই, তেমনি ভাবে অর্থ বিহীন কলেমা [লা-ইলাহা ইল্লাহর] এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

তাই মর্যাদাবান আলেমগণ এ কলেমার বাহ্যিক সূরত [শব্দ ও কথা] এবং অর্থকে উপলব্ধি করেছেন। এর ফলে তারা তাদের বহিদৃশ্যকে কথা অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে, এবং তাদের অভ্যন্তরকে কলেমার অর্থের উপলব্ধির মাধ্যমে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন। স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে তাদের সত্যের সাক্ষ্যের।

www.pathagar.com

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।"

(আল- ইমরান-১৮)

আর জ্ঞান পাপীরা কলেমার অর্থকে বাদ দিয়ে শুধু এর বহিদৃশ্য [সূরত] কে [অর্থাৎ কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও স্বীকৃতিকে] ধরে রেখেছে। এর ফলে তাদের বাহ্যিক দিকটাকে কথার মাধ্যমে সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে আর তাদের অভ্যন্তরকে সাজিয়েছে কুফরী দিয়ে। তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এমন জিনিসের ওপর যার মঙ্গল অমঙ্গল করার কোন ক্ষমতা নেই, তাদের অন্তরে রয়েছে অন্ধকার আর অমানিশা। হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার মতো ক্ষমতা আল্লাহ তাদেরকে দেননি। কিয়ামতের দিবসেও তারা কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে।

ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ-

"আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।"(আল-বাকারাহ ঃ ১৭)

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, অথচ দাসত্ব করে তার কুপ্রবৃত্তির, তার টাকা-পয়সার, অর্থের এবং দুনিয়ার, তাহলে কিয়ামতের দিন তার প্রভুর সামনে তার কি জবাব হবে?

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ-

"আপনি তার প্রতি খেয়াল করেছেন সে তার কুপ্রবৃত্তিকে তার ইলাহ [উপাস্য] বানিয়ে নিয়েছে?" (জাসিয়া ঃ ২৩)

"ধ্বংস হোক দিনারের পুজারী, দেরহামের পুজারী, পেটের পুজারী। দিতে পারলেই সে খুশী, আর দিতে না পারলেই সে ক্রোধান্বিত।" (বুখারী)

তুমি যখন বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখন যদি এ কলেমার স্থান হয় শুধু তোমার জবানে তাহলে ফলাফলের দিক থেকে এর কোনো ফল নেই, অতএব তুমি একজন মুনাফিক। আর যখন এ কলেমার স্থান হবে তোমার অন্তরে, তখন তুমি একজন মুমিন। কিন্তু সাবধান থাকবে, তুমি যেনো অন্তর বাদ দিয়ে শুধু মুখে মুখে মুমিন না হও। তাহলে কিয়ামতের ময়দানে এ কলেমা তোমার বিরুদ্ধে [আল্লাহকে] ডেকে বলবে ঃ [হে আমার ইলাহ, এ ব্যক্তির সাহচার্যে এত বছর আমি ছিলাম, কিন্তু সে আমার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি, আমার যথাযোগ্য হুরমাত বা সম্মান সে রক্ষা করেনি] অতএব এ কলেমা হয় তোমার পক্ষে, না হয় তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করবে।

মর্যাদাবান আলেমদের পক্ষে এ কলেমা সম্মানের সাথে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দান করবে যতক্ষণ না তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

জ্ঞান পাপীদের [যারা কলেমার অর্থকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে] বিরুদ্ধে এ কালেমা সাক্ষ্য দান করবে যতক্ষণ না তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ –

"একদল প্রবেশ করবে জান্নাতে আরেক দল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।" (আশ-শুরা ঃ ৭)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে এক শান্তির বৃক্ষ। যদি তুমি এ বৃক্ষটি রোপন করো সত্যে ও স্বীকৃতির উৎস মূলে, গোড়ায় ঢালো ইখলাসের [নিষ্ঠার] পানি, আর যদি এর পরিচর্যা করো নেক আমল দিয়ে, তাহলে মজবুত হবে এ বৃক্ষের মূল, কান্ড হবে অনড় ও স্থির, এর পত্রগুলো সবুজ, ফলগুলো হবে পরিপক্ক এবং ফলের পরিমান বেড়ে যাবে অনেক।"

تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا –

"সে তার পালন কর্তার নির্দেশে আহরহ ফল দান করে।"

(ইবরাহীম ঃ ২৫)

আর যদি এ বৃক্ষটি রোপন করো মিথ্যা আর নিষ্ঠুরতার উৎস স্থলে, রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) ও মুনাফিকীর পানি যদি এর গোড়ায় সিঞ্চন করো, বদ আমল ও অশ্লীল কথার দ্বারা তার পরিচর্যা করো, তার ওপর দিয়ে যদি প্লাবিত হয় পঙ্কিল পুকুরের পানি, আর যদি তাকে আঘাত করো দুপুরের প্রচন্ড খরতাপে, তাহলে তার ফলগুলো খসে পড়বে, পত্রগুলো পতিত হবে মাটিতে, তার মূল মাটি থেকে হয়ে যাবে বিচ্ছিন্ন, তার কান্ড হয়ে যাবে খন্ড -বিখন্ড, তার ওপর আঘাত হানবে দুর্গন্ধময় ঘুণিঝড় যা বৃক্ষটিকে ভেঙ্গে করে দিবে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا –

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবো, অতঃপর সেগুলোকে [তাদের কৃতকর্মকে] ধুলি কণার মতো উড়িয়ে দিবো।"

(আল-ফুরকান ঃ ২৩)

একজন মুসলিম যখন ইসলামের এ রুকনটি [তাওহীদ নামক অপরিহার্য মৌলিক বিষয়টি] নিশ্চিত করবে, তখন ইসলামের বাদ বাকী রুকন [অপরিহার্য মৌলিক বিষয়] গুলোকেও তার জীবনে নিশ্চিত করবে। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين –

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল এর সাক্ষ্য দান করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা, সক্ষম ব্যক্তির জন্য [বাইতুল্লাহর] হজ্ব করা আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে [তার জেনে রাখা উচিত যে] আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বের প্রতি অমুখাপেক্ষী।" দরুদ ও সালাম মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি তাঁর পরিবারের প্রতি এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি (আদদুরার আস সুন্নিয়্যাহ ২/১১২)

www.pathagar.com

কথা ও কাজে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বলেন ঃ

একথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আপনাকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন "তাঁর ইবাদত করার জন্য"। তাঁর আনুগত্য আপনার ওপর ফরজ করে দিয়েছেন। তাঁর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে এলেম, কথা ও কাজের দিক থেকে জানা। আল্লাহ তায়ালার নিম্মোক্ত বাণী এর প্রমাণ বা দলীল ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আঁকড়ে ধরো, আর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।" (আল-ইমরান ঃ ১০৩)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ-

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি হে মুহাম্মদ অহি করেছি আপনার প্রতি, এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা, এবং ঈশাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।" (আশ শুরা-১৩)

আরো জেনে রাখা দরকার যে, বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অছিয়ত [উপদেশ] হচ্ছে সেই তাওহীদের কলেমাকে নিশ্চিত করা, যা কুফর এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এখানেই লোকজন মূর্খতা বশতঃ অথবা অন্যায় ভাবেঃ কিংবা বিরোধিতা করে বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه [তোমরা দ্বীন কায়েম করো এ ব্যাপারে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না] আল্লাহ তায়ালার এ বাণী অনুযায়ী [মুসলিম] জাতির ঐক্যই তাদেরকে একীভূত করতে পারে এর আরো প্রমাণ হচ্ছে ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللهِ ز عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط وَسُبْحٰنَ اللهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

"বলে দিন, এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারিরা আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নই।" (ইউসুফ ঃ ১০৮)

প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে যখন তাওহীদ সম্পর্কে সে জানতে পারবে এবং তা স্বীকার করে নিবে, তখন তাওহীদ ভালবাসবে অন্তর দিয়ে এবং একে সাহায্য করবে তার জবান ও হাত দিয়ে। তাওহীদের

www.pathagar.com

সাহায্যকারী এবং সহযোগিতাকারীকে সে সাহায্য করবে। আবার যখন শিরক সম্পর্কে সে জানতে পারবে এবং শিরককে শিরক হিসেবে স্বীকার করবে, তখন অন্তর দিয়ে সে শিরককে ঘৃণা করবে। এরকম হলেই বান্দা সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا-

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে আকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না]"

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, তাওহীদের স্বীকৃতি অবশ্যই হতে হবে অন্তর দিয়ে [যার অপর নাম জ্ঞান], স্বীকৃতি হতে হবে জবান দিয়ে কথার মাধ্যমে, এবং স্বীকৃতি হতে হবে আমল দিয়ে বিধি-নিষেধ গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে, যদি বান্দার মধ্যে এ বিষয়গুলোর কোনো একটি না পাওয়া যায়, তাহলে সে মুসলমান হতে পারবেনা। যদি সে তাওহীদকে স্বীকার করে নিলো কিন্তু স্বীকৃতি অনুযায়ী কাজ করলোনা, তাহলে সে ফেরাউন ও ইবলিসের মতো বিদ্রোহী কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি বান্দা বাহ্যিক দিক থেকে তাওহীদের আমল করে কিন্তু গোপনে বা অন্তরে তা বিশ্বাস করে না, তাহলে সে খাটি মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হবে, যার অবস্থা কাফেরের চেয়েও খারাপ। তিনি [মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ)] আরো বলেনঃ তাওহীদ দুই প্রকার। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ [রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদ] এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ [ইবাদত সংক্রান্ত তাওহীদ]

রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদ কাফের এবং মুসলিম উভয়েই স্বীকার করে। আর উলুহিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদই কুফরী এবং ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। অতএব প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে উভয় তাওহীদের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকা। তার অবশ্যই জানা উচিৎ যে, আল্লাহ তায়ালাই "সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং নিয়ন্ত্রক" এ কথা কাফেররা অস্বীকার করেনা।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ-

"আপনি জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিকদান করেন, কিংবা তোমাদের কান ও চোখের মালিককে? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন, আবার কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন,

www.pathagar.com

তখন তারা বলে উঠবে, 'আল্লাহ'। তখন আপনি বলুনঃ তারপরও তোমরা তাঁকে ভয় করছোনা কেন?" (ইউনুছ ঃ ৩১)

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ج فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ-

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে কে কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, "আল্লাহ"। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

(আল আনকাবুত ঃ৬১)

এটা যখন সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেলো যে, কাফেররাও একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টি করেন, রিযিক দান করেন এবং সব বিষয়ের পরিকল্পনা আল্লাহ ছাড়া কেউ করেনা' তোমার একথা তোমাকে মুসলমান বানাতে পারবেনা যতক্ষণ না তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা যে অর্থ বুঝায় সে অনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহর এ সব নামের প্রতিটির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। আল্লাহকে তুমি 'খালেক' বলছো। 'খালেক' এর অর্থ হচ্ছে, যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনেছেন, তখন থেকেই তার রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর মুদাব্বির অর্থ হচ্ছে তিনিই ফেরেস্তাগণকে তার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, আবার তাঁরই নির্দেশে তারা আকাশে উড্ডয়ন করে। তাঁরই নির্দেশনায় মেঘ আকাশে ভাসে তাঁরই নির্দেশনায় বাতাস প্রবাহিত হয়। এমনি ভাবে তাঁর সকল সৃষ্টি পরিচালিত হয়। তিনিই তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক সকল সৃষ্টিকে পরিচালিত করেন। আল্লাহ তায়ালার এ সব নাম, যেগুলো কাফেররাও স্বীকার করে সেগুলো রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদের সাথে সম্পৃক্ত। তাওহীদুল ইলুহিয়্যাহ [ইবাদত সংক্রান্ত তাওহীদ] হচ্ছেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত নামগুলোর অর্থ জানার মতোই 'ইলাহ' সংক্রান্ত নামগুলোর অর্থ জানা। তাই 'লা-ইলাহা ইল্লাহ এর মধ্যে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটি দিক আছে। তা হচ্ছে উলুহিয়্যাত [ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা] কে সম্পূর্ন রূপে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই তা সাব্যস্ত করা। একমাত্র ইলাহ, মা'বূদ [উপাস্য] যিনি ব্যতীত ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা আর কারো নেই তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ । তাই যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করলো, অথবা পশু জবাই করলো, সেই গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করলো, সেই গাইরুল্লাহর ইবাদত করলো।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَايَضُرُّكَ ج فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ-

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবেনা, যে তোমার ভাল করতে পারবেনা মন্দও করতে পারবেনা । বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ করো তাহলে তুমিও জালেমদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে।" (ইউনুছঃ ১০৬)

এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার নিজের ও আল্লাহর মাঝে কাউকে মাধ্যম বানিয়ে নিলো এবং একথা দাবী করলো যে, উক্ত মাধ্যম তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে, সেও গাইরুল্লাহর [মাধ্যমের] ইবাদত করলো। আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ব্যাপারে এ বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللهِ ط قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (يونس- ١٨)

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের না করতে পারে কোনো ক্ষতি, না করতে পারে কোনো উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করতে চাও, যে সম্পর্কে তিনি আসমান ও জমীনের মাঝে অবহিত নন? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত জিনিস থেকে, যে গুলোকে তোমরা শরীক করছো।"
(ইউনুছ ঃ ১৮)

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ ، مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفٰى ط اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر- ٣)

"জেনে রাখো, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এজন্যই করি যেনো তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (আয্-যুমার ঃ ৩)

www.pathagar.com

মুসলিমের জন্য মুশরিক থেকে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার উপায়

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন ঃ

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি । সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি কোনো কিছুর অস্তিত্বহীন অবস্থার মধ্যে স্বীয় সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে নিজের অপরিহার্য অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করেন। যাঁর জাত [সত্ত্বা] এবং সিফাত [গুণাবলী] যাবতীয় সাদৃশ্য এবং উপমার উর্ধ্বে। অস্তিত্বের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস তাঁর জ্ঞান থেকে অদৃশ্য হতে পারেনা।

প্রশংসা করি পবিত্র আল্লাহর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যিনি আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন। বক্রতা এবং পথ ভ্রষ্টতার সংশয় থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি এই যে, এক আল্লাহ ছাড়া অর কোনো ইলাহ নেই । তাঁর কোনো শরীক নেই। সকাল সন্ধ্যা তাঁর 'মুওয়াহহিদ' (একত্ববাদের ঘোষণাকারী) হিসেবে সাক্ষ্য দিচ্ছ। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁরই বান্দা এবং রাসূল। যিনি নবী হিসেবে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন একটি ন্যায় সঙ্গত দ্বীন । যার ফলে আমরা তাঁর নিয়ে আসা স্বচ্ছ নির্মল অমীয় সূধা পান করতে সক্ষম হয়েছি। হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবার, তাঁর উত্তম সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরিবার বর্গের ওপর অবারিত শান্তি ও করুণা বর্ষণ করো।

আমার কতিপয় বন্ধু-(যাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করা আমার উচিৎ নয়)-এমন চারটি প্রবন্ধ ও চারটি নীতির ব্যাপারে কিছু লিখতে এবং সংকলন করতে আবেদন করলেন, যার মাধ্যমে একজন মুসলমান একজন মুশরিক থেকে আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী হতে সক্ষম হয়।

<u>এক</u> ঃ যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি বিশিষ্ট করেছেন, তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন রাসূল, যার সাথে ছিলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাগ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে সে যাবে জান্নাতে। আর যে ব্যক্তি নাফরমানী করবে সে যাবে জাহান্নামে । এর প্রমাণ হচ্ছে,

আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا –

(المزمل : ١٥)

"আমি তোমাদের কাছে একজন রাসূলকে তোমাদের জন্য স্বাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রাসূল।" (মুয্যাম্মিল ঃ ১৫)

www.pathagar.com

দুই ঃ একনিষ্ঠ ভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার জন্যই তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা বাণী ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ-

"আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (আয্-যারিয়াত - ৫৬)

তিনি আরো বলেনঃ

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

"তাদেরকে এটা ছাড়া কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" (বাইয়্যিনাহ্ ঃ ৫)

তিন ঃ যখন বান্দার ইবাদতের মধ্যে শিরক ঢুকবে, তখনই ইবাদত বাতিল হবে এবং প্রত্যাখাত হবে। শিরক ব্যতীত সকল পাপেরই ক্ষমার আশা করা যায়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববতীদের প্রতি অহি [প্রত্যাদেশ] হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকের মধ্যে শামিল হবেন।" (আয যুমার ঃ ৬৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শরীক করে। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করবেন, যার জন্য ইচ্ছা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো, সে যেনো মহা অপবাদ আরোপ করলো।" (আন নিসা ঃ ৪৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

إِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائدة ٧٢)

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তাঁর বাসস্থান হয়ে যায় জাহান্নাম।"
(আল মায়েদা ঃ ৭২)

www.pathagar.com

চার ঃ যদি বান্দার আমল ঠিক হয়, কিন্তু আমলে [কর্মে] ইখলাস বা একনিষ্ঠতা না থাকে তাহলে সে আমল আল্লাহর কাছে কবুল (গ্রহণযোগ্য) হবে না । আর যদি কাজে একনিষ্ঠতা থাকে, কিন্তু কাজটি শুদ্ধ না হয় তাহলেও কাজটি কবুল (গ্রহণ যোগ্য) হবে না। তাই আমল [কাজ] অবশ্যই একনিষ্ঠতা পূর্ণ হতে হবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়ত [বিধান] মোতাবেক শুদ্ধ হতে হবে। একারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আহলে কিতাবের [আসমানী কিতাবধারী যথা ইহুদী, নাসারা] ওলামা, আবেদ [পীর বজুর্গ, সূফী, দরবেশ] এবং ক্বারীদের [কিতাব পাঠক] সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ط اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا-

"বলুন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সে সব লোকের সংবাদ দিবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সেই লোক, যাদের চেষ্টা সাধনা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা খুব ভাল কাজই করছে।" (কাহাফ ঃ ১০৩-১০৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً (الغاشية : ٧)

"অনেক মুখ মন্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে । (আল-গাশিয়াহ ঃ ২-৪)

কুরআনের এ সমস্ত আয়াত শুধুমাত্র আহলে কিতাবের [আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের] ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় বরং এমন প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে, এলেম [জ্ঞান], আমল [কর্ম] ও পঠনের ক্ষেত্রে চেষ্টা সাধনা করে বটে কিন্তু তা মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়ত [বিধান] সম্মত নয়, এমতাবস্থয় সে আমলের দিক থেকে সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরই অর্ন্তভূক্ত হবে, যাদের কথা আল্লাহ তায়ালা তার জ্ঞান সমৃদ্ধ মহাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । যদি সে মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়, তার মধ্যে যদি [পরকালের প্রতি] অনুরাগ থাকে, আর সে চরিত্রবান হয়, তাহলে কুরআনে ও হাদীসের অনুসরণ ব্যতীত তার শান্তি লাভের এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো অজুহাত তার থাকবেনা। মেধা শক্তি, [মানুষের] শারীরিক এবং ইচ্ছা শক্তির মতোই, যে ব্যক্তি জ্ঞানগত মর্যাদা আর ইচ্ছা শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে, অথচ সে তা শরীয়ত সম্মত ভাবে কাজে লাগায়না, তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতোই যে ব্যক্তির শরীর ও দেহে শক্তি দেয়া হয়েছে অথচ শরীরিক শক্তির দ্বারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.com

দ্বীন ইসলামের মূল ও নীতি

ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেনঃ দ্বীন ইসলামের মূল এবং তার নীতি দুটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত।

প্রথমটি হলো ঃ এক আল্লাহ, যার কোনো শরীক নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দান, এ শিরক বিহীন ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদান, এ ক্ষেত্রে সাহায্য করা এবং যে ব্যক্তি একাজ পরিত্যাগ করবে তার প্রতি কুফরী আরোপ করা।

দ্বিতীয়টি হলোঃ আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে ভয় [জাহান্নাম ও ইবাদত বাতিলের ভয়] প্রদর্শন, শিরকের বিরোধিতা করা এবং শিরকী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি কুফরী আরোপ করা। এ ব্যাপারে মতভেদ বা বিরোধিতা কারীদের অনেক শ্রেণী ভাগ আছে । এদের মধ্যে সব চেয়ে জঘণ্য হলো যারা সর্ব ক্ষেত্রেই বিরোধতা করে। মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং শিরককে অস্বীকার করেনা এবং শিরক কারীদের বিরোধিতাও করেনা ।

* কিছু সংখ্যক লোক এমন যারা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের বিরোধিতা করে কিন্তু তাদের প্রতি কুফরী আরোপ করেনা ।

* কিছু লোক আছে যারা তাওহীদ পছন্দ করেনা আবার ঘৃনাও করেনা ।

* কিছু লোক এমন আছে, যারা শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি কুফরী আরোপ করে আবার এটাও দাবী করে যে, সে নেককার ব্যক্তিদের জন্য গাল-মন্দের কারণ।

* কতিপয় লোক এমন আছে, শিরকের প্রতি যাদের ক্রোধও নেই, ভালবাসাও নেই। আবার কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে, যারা শিরক সম্পর্কে জানেও না, এবং তা অস্বীকারও করে না ।

* কিছু সংখ্যক লোক এমন ও আছে, যারা তাওহীদ জানেও না, তা অস্বীকারও করেনা।

আবার কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে, (তারা হচ্ছে সবচেয়ে বিপদজনক) যারা তাওহীদের আমল করে বটে কিন্তু তাওহীদের মূল্য তাদের জানা নেই বিধায় তাওহীদ পরিত্যাগ কারীর প্রতি তাদের ক্রোধ নেই, ঘৃণাও নেই। এ জন্য তাওহীদ পরিত্যাগ কারীর প্রতি তারা কুফরীও আরোপ করেনা।

এমন কিছু লোক আরো আছে, যারা তাওহীদ পরিত্যাগ করেছে এবং তাওহীদ কে ঘৃণাও করে এবং তাওহীদের মূল্যও জানেনা। এসব লোক মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) যা আনয়ন করেছেন তার বিরোধিতা করে। [আল্লাহই ভাল জানেন] (মাজমুআতুল ফতাওয়া ওয়ার রাসায়েল ওয়াল আজওইবা ১২৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ (রহ) এ কথাগুলোর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। [দেখুন মাজমু আতুত্তাহীদ প্রথম প্রবন্ধ পৃঃ৪৭]

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব আরো বলেনঃ যে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা আপনার ওপর করুনা করেছেন, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই একথা শিখিয়েছেন, আপনি যখন বলবেন যে, [আল্লাহ সম্পর্কিত] এ কথা ঠিক, এবং আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানিনা কিন্তু আমি মুশরিকদের বিরোধিতা করিনা এবং তাদের ব্যাপারে আমি কোনো কথাও বলি না, এর দ্বারা আপনার ইসলামে প্রবেশ করা নিশ্চিত হয়েছে। বরং আপনাকে অবশ্যই মুশরিকদের ক্রোধ ও ঘৃণা রাখতে হবে। এমনকি ঘৃণা করতে হবে এমন লোকদেরকে, যারা তাদেরকে ভালবাসে। তাদের বিরোধিতা করতে হবে, [তাওহীদের স্বার্থে] তাদের সাথে দুশমনি করতে হবে। যেমনটি করেছিলেন আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ। তাঁরা বলেছিলেন ঃ

إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهٗ- (الممتحنة: ٤)

"তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা বহাল থাকবে।" (আল মুমতাহিনা ঃ ৪)

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে এমন শক্ত রজ্জু ধারণ করবে যা ভেঙ্গে যাবার নয়।"
(আল বাকারাহ ঃ ২৫৬)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

"আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছেই এ মর্মে রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।" (নাহল ঃ ৩৬)

যদি কেউ বলে ঃ আমি নবী (সঃ) এর অনুসরণ করি, তিনি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমি লাত আর ওজজার বিরোধিতা করিনা, এবং আবু জাহেল ও তার মতো যারা আছে তাদেরও বিরোধিতা করিনা, কেননা তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো দায়-দায়িত্ব আমার নেই, তাহলে তার ইসলাম সঠিক ও গ্রহণ যোগ্য হবে না ।

www.pathagar.com

মীরাসুল আম্বিয়া
বা
নবীদের উত্তরাধিকার

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

যে ব্যক্তি তাগুতের ইবাদত করে সে তাগুতের অনুসরণ করে।

(বুখারী)

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর ওপর এবং তাঁর পরিবার বর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

ইতিহাসের প্রতি যার দৃষ্টি রয়েছে সে দেখতে পাবে যে, ইসলামী উম্মাহ "ইয়াসিক" শাসিত তাতারী যুগ ব্যতীত আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী দেশ শাসন করেছে। সে সময় মুসলমানরা তাওহীদ বা আল্লাহর একাত্ববাদ নিশ্চিত করার সুমহান নজীর স্থাপন করেছে। সেই সময়ে জ্ঞানী লোকেরা বিভিন্ন পন্থায় মানব রচিত বিধানের কবর রচনা করেছিলো।

প্রথমত ঃ তাঁরা মানব রচিত বিধানের উদ্ভাবকদের প্রতি কুফরী আরোপ করেছে।

দ্বিতীয় ঃ তাঁরা মানব রচিত আইনের কাছে বিচার ফয়সালার জন্য যায়নি।

তৃতীয়ত ঃ তাঁরা এটা শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করেনি। ইবনে তাইমিয়ার ২৮ খন্ড এবং ইবনে কাসিরের বেদায়া ওয়ান্নিহায়া এবং তাঁর 'তাফসীরুল কুরআনিল আজীম' এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ ভাবে তারা মানব রচিত বিধানের নির্বাসন দিয়েছে এবং তার মৃত্যু ঘটিয়েছে।

বর্তমান যমানায় ইতিহাসের দিকে কোন ব্যক্তি দৃষ্টিপাত করলে অত্যন্ত দুঃখের সাথে দেখতে পাবে যে, মানব রচিত তাগুতী বিধান [সমাজ ও রাষ্ট্রেও] নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করছে। আমরা আরো দেখতে পাবো, কতিপয় ধর্মীয় দল ইসলামী শরীয়তের শাসন দাবী করছে। সাথে সাথে এটাও দেখতে পাবো যে, এসব মুসলিম জন গোষ্ঠীর মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এই কুফরী আইন কানুন কলেজ গুলোতে শিক্ষা লাভ করছে এবং যে সার্টিফিকেট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তারা তাগুতকে Study করেছে এবং তাগুতের প্রতি তাদের আন্তরিক বিশ্বাস রয়েছে, সে সার্টিফিকেটের শিক্ষাই তারা কাজে লাগাচ্ছে এবং বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রেও তারা এর ব্যবহার করছে। এর ফলে তারা তাগুতী শক্তি পুষ্ট শাসকে পরিণত হচ্ছে অথবা তার আইনের চর্চাকারীতে পবিণত হচ্ছে কিংবা তার প্রতিনিধিতে পরিণত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী বিষয়। কেননা তারা একদিকে তাগুতী শাসনের অবসান আর আল্লাহর শরীয়তের শাসন দাবী করছে, অপর দিকে তাগুতী আইন কানুন থেকে তারা মুক্তি ও পাচ্ছে না, তা পরিত্যাগও করতে পারছে না। নিজেদের মধ্যে সংঘটিত ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর জন্য তাগুতী আদালতের স্মরনাপন্ন হওয়া থেকে তারা [মুসলমানরা] বিরত থাকতে পারছেনা, এ বিষয়টা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর আক্বীদা বিশ্বাসের ওপর বিরাট বড় আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবে যে, হুকুম [বিধান] একমাত্র আল্লাহর' আর বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করবে আল্লাহর শরীয়তের বাইরে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে হলো একজন পাপীষ্ট মুসলিম। মুসলমানরা রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদকে স্বীকার করে। আর তা হচ্ছে,

www.pathagar.com

বান্দা স্বীয় রবের কর্মের একত্ববাদ [আল্লাহর কর্মে অন্য কেউ শরীক নয়] কে মেনে নেয়। একমাত্র আল্লাহর তায়ালাই হাকিম [বিচার ফয়সালাকারী] বিচার -ফয়সালার বিষয়টি আল্লাহর কর্ম সমূহের অর্ন্তভূক্ত। এ বিশ্বাস অবশ্যই বান্দার থাকতে হবে। এ তাওহীদকে তারা স্বীকার করে নিয়েছে এবং ইসলাম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটাকেই ফয়সালা [মীমাংসা] কারী বানিয়ে নিয়েছে, আর উলুহিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদকে শর্ত করেনি [মুসলিম হিসেবে শর্ত করা উচিত]। তাওহীদুল উলুহিয়্যাত [ইবাদত সংক্রান্ত তাওহীদ] হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত সংক্রান্ত কর্ম গুলোর ক্ষেত্রে তাঁর একত্ববাদকে মেনে নেয়া [অর্থ্যাৎ ইবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহই যোগ্য] অতএব আল্লাহ ব্যতীত কোনো তাগুতের উদ্দেশ্যে ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশ নিবেদন করা যাবেনা। বিচার ফয়সালা চাওয়া এরই অর্ন্তভূক্ত।

আল্লাহ চাহে তো এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ আমি শীঘ্রই বর্ণনা করবো, যার সার কথা হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর সাথে শিরক করারই নামান্তর। যেমন মৃত ব্যক্তিদের কাছে দোয়া করা, তাদের সন্তুষ্টির জন্যে পশু জবাই করা, মানত করা। এসব কাজ যে সব মুসলমানরা করে তাদের মধ্যে আর মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এসব মুসলমানরা তাদের শিরক মিশ্রিত কর্মকান্ড দ্বারা সমস্ত অম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের পথ পদ্ধতি ও রীতি নীতির বিরোধীতা করেছে। তারা রুবুবিয়্যাতের তাওহীদকে স্বীকার করে উলুহিয়্যাতের তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। এটাতো জানা কথা যে, রবুবিয়্যাতের তাওহীদকে অর্থবহ করে তুলতে হলে উলুহিয়্যাত সংক্রান্ত তাওহীদ অপরিহার্য। অতএব যে ব্যক্তি রুবুবিয়্যাতের তাওহীদকে মেনে নিলো কিন্তু উলুহিয়্যাত [ইবাদত সংক্রান্ত] তাওহীদ মেনে নিতে পারলোনা, সে মুসলমান হতে পারলো না। কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াত এর প্রমাণ পেশ করেছে। আমাদের শেষ কথা হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য ।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা

প্রথম প্রমাণ ঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (النساء ٦٠)

" আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে , যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে [তার প্রতিও ঈমান এনেছি] তারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়কে [মীমাংসার জন্য] তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে [তাগুতকে] মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"

(আন নিসা ঃ ৬০)

আয়াতের প্রথম প্রামাণ্য দিক ঃ "ইবাদত" ক্রিয়ার পর যদি মূর্তী অথবা প্রতিমা কিংবা তাগুতের উল্লেখ আসে, এরপর যদি তাগুতকে অস্বীকার করা এবং তা থেকে নিরাপদে থাকার নির্দেশ আসে, তাহলে উক্ত ক্রিয়াটি আল্লাহ তায়ালার জন্য খাঁটি এবং খালেস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং এই ইবাদতকে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে [ইবাদত কারী] শিরকে আকবর অর্থাৎ জঘণ্য শিরককে পতিত হবে।

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ তাঁর (تيسير العزيز الحميد) নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ এ আয়াতটির মধ্যে কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার ফযসালা চাওয়ার কাজটি পরিত্যাগ করা ফরজ এবং যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য যাবে সে মুমিন তো নয়ই, এমনকি সে মুসলমানও নয়।

আয়াতের দ্বিতীয় প্রামাণ্য দিক ঃ

যে ব্যক্তি বিচার ফয়সালা তাগুতের কাছে প্রার্থনা করলো, সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা । আর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা, সে মূলত ঃ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করলো ।

www.pathagar.com

আল্লামা জামালউদ্দিন আল-কাসেমী তাঁর বিখ্যাত মাহাসিনুত্তাউইল (محاسن التاويل) নামক তাফসীর গ্রন্থে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন ঃ

প্রথমত ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ-

"তারা চায় বিচার-ফয়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে , অথচ তাকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ হয়েছে।" তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষন হিসেবে গন্য করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থই আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক যেমনটি তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল- শাইখ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করে বলেন ঃ তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালার চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা। (ফাতহুল মাজিদ)

আয়াতের তৃতীয় প্রামাণ্য দিক ঃ

يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا-

"শয়তান তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়।"

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, শিরকে আকবার [বড় শিরক] হচ্ছে জঘণ্যতম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা এর প্রমাণ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا-

" যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে সুদুর গোমরাহীতে পতিত হয়"। (আন্ নিসা ঃ ১১৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ-

"সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারেনা, উপকারও করতে পারেনা। এটাই চরম পথ ভ্রষ্টতা"।

(হজ্জ ঃ১২)

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া করলো, সে মারাত্মক গোমরাহীতে নিমজ্জিত হলো। কেননা, গাইরুল্লার কাছে দোয়া করা জঘণ্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত [বা বিধান] ছাড়া অন্য কোনো বিধানের মধ্যে বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা করলো, সে মারাত্মক গোমরাহীতে পতিত হলো। কেননা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চাওয়া বড় বা মারাত্মক শিরকের অর্ন্তভূক্ত ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ-

"বিধান দেয়ার একচছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।" (সূরা ঃ ইউসুফ ঃ ৪০)

আয়াতের প্রামাণ্য দিক ঃ আল্লাহ তায়ালা একটি ভূমিকা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ অর্থাৎ বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। বিধান ও আইনের উপর আল্লাহর বিধানই সবচেয়ে শক্তিশালী। বিধান রচনা রুবুবিয়্যাতের অন্তর্ভূক্ত। কেননা বিধান রচনা ও বিধান জারি করা আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত কার্যাবলীর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমানের অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে, উলুহিয়্যাত [ইবাদত] সংক্রান্ত তাওহীদ। সৃষ্টির অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই রিযিকের ব্যবস্থা করা, কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধন, এগুলো আল্লাহর কার্যবলীর অন্তর্ভূক্ত। তাই রিযিক চাওয়া, সাহায্য কামনার মতো ইবাদত গুলো তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। কেননা তিনিই কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের একমাত্র মালিক। বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বলে, তিনিই রিযিক দান করেন এবং বিপদ গ্রসতকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে যদি একজন মুর্খ বেদুঈন অথবা জিলানীর [আঃ কাদের জিলানী] কাছে দোয়া করে, তার কাছে সাহায্য চায়, তাহলে তার ঈমান এবং সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের যে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে একমাত্র তিনিই রিযিক দান করেন, তিনি কল্যাণ অকল্যাণের মালিক; তার কোনো কাজেই আসবেনা। কারণ, দোয়া করা ও সাহায্য প্রার্থনার মতো ইবাদতকে সে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার কারণে আল্লাহর উলুইয়্যাতের ব্যাপারে সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে । এমনিভাবে যে ব্যক্তির ঈমান আছে এবং একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ এক এবং তিনিই বিধান দিবেন, তিনিই সকল বিধানের উৎস, তার এ ঈমানের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান পোষন করা, অর্থাৎ আল্লাহ মহান বিচারক এ বিশ্বাস রাখা। তাই মানুষের ঈমানের দাবী হচ্ছে আল্লাহর শরীয়ত ও বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া। তাই যখনই মানুষ আল্লাহর শরীয়ত ও বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা কামনা করে, তখনই সে (আল্লাহর) উলুহিয়্যাতের মধ্যে শিরক করে। এমতাবস্থায় তার ঈমান এবং আল্লাহই যে মহান বিচারক [আল্লাহর] রুবুবিয়্যাতের এ স্বীকৃতি তার কোন কাজে আসেনা, কেননা আল্লাহ তায়ালারও কর্ম আছে, বান্দার ও কর্ম আছে। আল্লাহর কর্ম হচ্ছে বিধান ও আইন রচনা করা, আর বান্দার কর্ম হচ্ছে যিনি আইন ও বিধান রচনা করেন তাঁর শরীয়ার [বিধানের] কাছে বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা করা। এমনি ভাবে আল্লাহর কর্ম হচ্ছে সৃষ্টির অসতিত্বহীন অবস্থা থেকেই তার রিযিকের ব্যবস্থা করা, আর বান্দার কর্ম হচ্ছে রিযিক দাতার কাছে রিযিকের জন্য দোয়া করা । অতএব আল্লাহ তায়ালাই রিযিক দান করেন এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, তাঁরই কাছে রিযিক চেয়ে দোয়া নামক ইবাদত করা । এ দোয়া নামক ইবাদত

www.pathagar.com

গাইরুল্লাহর কাছে করলে তা শিরকে আকবার [বড় ধরনের শিরক] হিসেবে গণ্য হবে। আবার আল্লাহ তায়ালাই বিধান দাতা এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে, বিচার-ফয়সালা চাওয়া নামক ইবাদতও তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। এ ইবাদত যদি আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে বাদ দিয়ে করা হয়, তাহলেও এটা হবে শিরককে আকবার বা বড় ধরনের শিরক। একজন মুওয়াহহিদ [আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী] মুসলমানের কাছে উপরোক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো পাথর্ক্য নেই। এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ [বিধান দানের আধিকার একমাত্র আল্লাহর] আল্লাহ এ বাণীর মধ্যে নিহিত রয়েছে । এ আয়াতে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের সাথে اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ [একমাত্র তাঁরই ইবাদত তোমরা করো, এ নির্দেশ দিয়েছেন] এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উলূহিয়্যাতকে জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের অর্থেও কাছা-কাছি একটি আয়াতে বলেছেনঃ

وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা তাদের অপকারও করতে পারেনা উপকারও কারতে পারেনা। এবং তারা বলে; এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় অবহিত করতে চাও , আসমান ও যমীনের মাঝে যে বিষয়ে তিনি অবহিত নন। তিনি মহান ও পুতঃপবিত্র সে সব বিষয় থেকে যাকে তোমরা শরীক করছো।"

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا-

"তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে যে তাদের জন্য ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল থেকে সামান্য রোযী দেয়ারও অধিকার রাখেনা এবং শক্তিও রাখে না।" (নাহলঃ৭৩)

আল্লাহ তায়ালার কার্যবলীর মধ্যে রয়েছে রিযিক দান করা। অর্থাৎ একমাত্র তিনিই রিযিক দান করেন । তাই আল্লাহর জন্য এ ক্ষেত্রে যে ইবাদত নিবেদন করতে হবে তা হচ্ছে, রিযিক চেয়ে তাঁর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ তায়ালার কার্যবলীর মধ্যে রয়েছে মঙ্গল-অমঙ্গল সাধন করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য যে ইবাদত নিবেদন করতে হবে তা হচ্ছে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। আল্লাহ তায়ালার কার্যবলীর মধ্যে আরো একটি কাজ হচ্ছে, আইন বিধান দান করা। এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্য যে ইবাদত নিবেদন করতে হবে তা হচ্ছে, তাঁর আইন ও বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া।

বর্তমান যমানায় অনেক মানুষের ওপরই এসব সত্যও ক্লান্তিকর বলে প্রতিয়মান হচ্ছে । শাইখ আবদুর রহমান আস্ সা'দী কিতাবুত্তাওহীদের উপর লেখা তাঁর বই القول السديد এ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ

www.pathagar.com

يزعمونএর ব্যাখা প্রসংগে বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা [অন্য কোনো বিধান বা ব্যক্তির কাছে] চায়, তাহলে সে ঐ প্রার্থীত ব্যক্তি বা মতাদর্শকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চেয়েছে ।

তৃতীয় প্রমাণ ঃ ছহীহাইন [অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের] হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) রাতের [নফল] নামাজে এ দোয়া পড়তেন

اللهم لك الحمد انت نور السموات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت و ماخرت وما أسررت وما اعـــلـــنت انت إلهى لا إله الا انت –

"হে আল্লাহ সকল প্রশংসা তোমার, তুমি নূর (আলো) আকাশ ও যমীনের এবং আকাশ ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর সকল প্রশংসা তোমার, তুমি আকাশ, যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর ধারক, সকল প্রশংসা তোমার, তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, কিয়ামত সত্য, মুহাম্মদ (সঃ) সত্য । হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি [আত্মসর্ম্পন করেছি] তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার ওপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমার জন্য বিবাদ করেছি, তোমার কাছে বিচার চেয়েছি, অতএব , আমি যা পেশ করতে পেরেছি আর যা পারি নি [ভালো মন্দ] তার সবই ক্ষমা করে দাও । ক্ষমা করো আমি যা গোপন রেখেছি আর যা প্রকাশ করেছি । তুমিই আমার ইলাহ, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ।"

এ দোয়া উল্লেখ করে ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহর দিকে উসিলা করা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের মাধ্যমে আল্লাহরই জন্য উবুদিয়্যাত [ইবাদত] কে নিবেদন করার মাধ্যমে । ইবনূল কায়্যিম এ দোয়ার তিনটি বিষয়ের উল্লোখ করেছেন। আল্লাহর দিকে উসিলা করা, তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের দ্বারা, অতঃপর সমস্ত উবুদিয়্যাত [ইবাদত] কে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদনের দ্বারা। আর সে উবুদিয়্যাত হচ্ছে তাওয়াক্কুল [ভরসা করা], ইনাবত [তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করা] এবং বিচার ফয়সালা চাওয়া। এরপরই তাঁর কাছে মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে। অতএব এখানে উদ্ধৃত দোয়া এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিচার-ফয়সালা চাওয়ার কর্মটি তাওয়াক্কুল এবং ইনাবতের [তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করা] মতোই একটি ইবাদত ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে ব্যক্তি তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালা চায়, সে মূলত ঃ তাগুতের প্রতি ঈমান এনেছে আর আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, এ প্রসংগে ওলামায়ে কেরামের পঁচিশটি উদ্ধৃতি।

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا –

"অতএব তোমর রবের কসম, তারা ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না তাদের বিবাদপূর্ন বিষয়ে তোমাকে ন্যায় বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা থাকতে পারবেনা বরং সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করে নিবে।"

(আন্ নিসা ঃ৬৫)

১। ইমাম উবনু হাযম (রহঃ) এ আয়াত প্রসংগে বলেনঃ

যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সাবধানী, আল্লাহর প্রতি এবং কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী, এবং এ আয়াত যে আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার মধ্যে একটি চুক্তি তা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে অনুসন্ধান এবং পরখ করার জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট । সে নিজেকে পরখ করতে গিয়ে যদি দেখতে পায় যে, রাসূল (সঃ) তাঁর যে সব খবর [অহী] পৌছেছে সে ক্ষেত্রে তিনি সঠিক ফয়সালা দিয়েছেন, অথবা সে যদি নিজের অন্তরকে দেখতে পায় যে, রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত বিষয় বা তাঁর ফয়সালা তার কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় বরং অন্য কোনো ব্যক্তির কথা ও ফয়সালার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ঝোক প্রবনতা রয়েছে; অথবা তার নিজস্ব "কিয়াস" এবং নিজস্ব বিচার বুদ্ধিতে উত্তম, এর দিকে তার ঝোক রয়েছে অথবা নিজেকে দেখতে পেলো যে, বিবাদকৃত বিষয়টির বিচার-ফয়সালা আল্লাহর রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে চাওয়া হয়েছে, তাহলে প্রথমোক্ত অবস্থা ছাড়া সকল অবস্থাতেই তাকে জানা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালার কসম ও হক কথা অনুযায়ী সে মুমিন নয়। আর যদি সে মুমিনই না হয়, তাহলে সে কাফের । এখানে তৃতীয় কোন শ্রেণীর অবকাশ নেই। (আহকাম ফী উসুলিল আহকাম ৯৭/১ পৃঃ)

পূর্বোক্ত আয়াতের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালার উদ্ধৃত আয়াতে তিনি নিজের কসম দিয়ে বলেছেন; কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ সে রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত সকল বিষয়ে অন্তর দিয়ে নিঃসঙ্ক চিত্তে তাঁর ফয়সালা মেনে না নিবে।

অতএব আন্তরিক ভাবে [রাসূল (সঃ) এর] ফয়সালা মেনে নেয়া ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হবেনা এটাই সঠিক কথা, আল্লাহ ও রাসূলের ফয়সালা নিঃসঙ্ক চিত্তে মেনে নেয়ার ঈমান হলো প্রকৃত ঈমান। এ ধরনের ঈমান যার নেই তার ঈমানের কোনো মূল্য নেই। (আলফাসলু ফি মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নহল ৭৩৫/৩পৃঃ)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সঃ) এর ফয়সালা মেনে নেয়াকে ঈমান নাম দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন যে, আল্লাহর রাসুল যা ফয়সালা দিয়েছেন তাতে অন্তরে কোনো দ্বিধা সংকোচ থাকতে পারবে না, এরকম না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই তাতে অতএব এটা সত্য বলে প্রমাণিত হলো, আমল, চুক্তি এবং কথার সমন্বিত নামই হচ্ছে ঈমান। কেননা বিচার ফয়সালা হচ্ছে আমল, যা কথা ছাড়া সম্ভব নয়, আর এটা নিঃসঙ্ক চিত্তের সাথে হওয়া চাই, আর এটাই হচ্ছে চুক্তি।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا-

"যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরন করে , তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাবো, যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতর গন্তব্য স্থান।"
(আন্ নিসাঃ ১১৫)

এ আয়াত প্রসংগে তিনি আরো বলেন ঃ

আবু মুহাম্মদ বলেছেন ঃ যারা এ রকম করবে, এ আয়াত তাদের প্রতি কুফরী আরোপের প্রমাণ। যদি কেউ একথা বলে যে, যে ব্যক্তি মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরন করে, সে ব্যক্তি মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত নয়। তখন বলবো, যে ব্যক্তি মুমিনদের পথ অনুসরণ না করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই কাফের নয়। কারণ জ্বিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, অন্যায় ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষন মুমিনদের পথ নয়, আমরা জানি উপরোক্ত পাপের পথ যারা অনুসরণ করে তারা অবশ্যই মুমিনদের পথ অনুসরণ করেনা। এতদসত্ত্বেও তারা কাফের নয় । কিন্তু এক্ষেত্রে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এ বাণী ।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বিবাদপূর্ণ বিষয়ে আপনাকে ন্যায়বিচারক মেনে নিবে। অতঃপর আপনার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো রকম সংকোচ থাকবেনা বরং সন্তুষ্ট চিত্তে তা গ্রহণ করবে। (আন্ নিসা ঃ ৬৫)

আবু মুহাম্মদ আরো বলেন ঃ এটি এমন একটি উদ্ধৃতি [বা আয়াত যা ব্যাখ্যার (ঘুরানোর) কোনো অবকাশ নেই এবং এমন কোনো উদ্ধৃতি (আয়াত ও) আসেনি না যা দ্বারা এর বাহ্যিক সাধারণ বক্তব্য ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা যায়, আর এমন প্রমাণও আসেনি যার দ্বারা এর বক্তব্যকে ঈমানের কতিপয় দিককে খাস (বিশেষিত) করা যায়, (অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াত যারা রাসূল (সঃ) এর বিচার-ফয়সালা যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে

www.pathagar.com

মেনে নেবেনা সে মুমিন নয় বরং কাফের " এ বক্তব্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কোনো অবকাশ নেই এবং কোনো দলীল, প্রমাণও নেই।

২। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ

কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব ও মুনাফিকদেরকে দোষারোপ করেছেন) এর মধ্যে কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত লোকদের মতাদর্শের প্রতি ঈমান আনায়ন করা কিংবা আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে, তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত। [অর্থাৎ কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা আর কুফরী মতাদার্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।] আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ-

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে।" (আন্ নিসা ঃ ৫১)

'কাফেরদেরকে সাহায্যকারী ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার অন্তর্ভূক্ত' একথার দ্বারা তিনি একথাই বলেছেন যে, কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে বড় কুফরী। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ-

"তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" (আল-মায়েদা ঃ ৫১

তিনি দুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর লোকজন হচ্ছে, আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী এবং নাসারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছে, সেই সব মুনাফিক যারা কুফরীকে অন্তরে লুকিয়ে রাখে আর ইসলামকে প্রকাশ করে। এরপর আরো দুটি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবের কুফরীর প্রতি বিন্দুমাত্র ঈমান আনা অথবা আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার-ফয়সালা চাওয়া মূলতঃ কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করারই নামান্তর। "অথবা তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া" এ কথা টুকুর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন; 'অথবা' শব্দটিকে এখানে কিভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে, 'অথবা' শব্দটিকে মূলতঃ দুটি বিষয়ের যেকোনো একটিকে বাছাই করে নেয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে উভয় বিষয়ই (আহলে কিতাবের কিছু কুফরী মতাদার্শের প্রতি ঈমান আনা, আর আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া।) আল্লাহকে অস্বীকার করার অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর খেয়াল করে দেখুন কিভাবে তিনি উভয় বিষয়ের জন্যই

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ-

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে যারা মেনে চলে প্রতিমা ও তাগুতকে।" (আন্‌নিসা ঃ ৫১)

আয়াতটিকে প্রমান হিসেবে পেশ করেছেন । তিনি আরো বলেন ঃ

www.pathagar.com

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ-

"তিনি সমস্ত আসমানী গ্রন্থের প্রতি ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিদের দোষারোপ করেছেন। কারণ তারা কি তাঁর কিতাব ও সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস) কে বাদ দিয়ে বড় বড় তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চায়। যেমনটি ঘটে থাকে ইসলামের বহু দাবীদার ব্যক্তিদের বেলায় । তারা বিচার-ফয়সালা চাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্নিপূজারী দার্শনিকদের প্রবন্ধ অথবা ইসলাম পরিত্যাগকারী তুরস্কের রাজা-বাদশাদের নীতি গ্রহণ করে। (মাজমুউল ফাতোয়া ৩৩৯/১৭)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

"যখন মুমিনদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা একথাই বলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম মূলতঃ তারাই সফল কাম ।" (আন নূরঃ ৫১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা বর্ণণা করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করে না, আর হুকুম ও বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে মুনাফিক, মুমিন নয়। মুমিন তো তারাই, যারা বলে ঃ 'আমরা শ্রবন করি এবং আনুগত্য করি।'

কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম ও বিধান থেকে বিমুখ হওয়া আর গাইরুল্লাহর কাছে বিচার-ফয়সালার বাসনা ও ইচ্ছাই যদি মুনাফিকীর প্রমাণ আর ঈমান চলে যাওয়ার কারণ হয়, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসকে নির্ভেজালভাবে পরিত্যাগ করা। এ পরিত্যাগ কখনো প্রবল কামনা ও বাসনা শক্তির কারণেও হতে পারে। আর যদি সেটা হয় ত্রুটি ও গালিগালাজ কিংবা অন্য কোনো কারণে, তাহলে [পরিণতিটা কেমন হবে] এখানে মুনাফিকীর দ্বারা সে জঘণ্য মোনাফিকীই বুঝানো হয়েছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে মুনাফিককে বের করে দেয়। এর প্রমাণ হচ্ছে فكيف بالنقص والسب ونحوّ তাহলে পরিত্যাগ যদি ত্রুটি ও গালিগালাজ ইত্যাদির কারণে হয়, তাহলে ফলাফল কেমন হবে? যদিও এখানে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, রাসুল (সঃ)-এর হুকুম [বিধান] থেকে ফিরে থাকা আর গাইরুল্লাহর কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া কুফরী আমল এবং চরম মুনাফিকী নয়, তারপরও বিষয়টিকে গালিগালাজের মুকাবেলায় রাখা হয়নি [তুলনা করা হয়নি] এবং এর ওপর কিয়াস ও করা হয়নি। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) গালিগালাজ করে সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে জঘণ্য কুফরী করে, যে তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যায়। লেখকের উপরোক্ত كيف بالنقص والسب ونحوه কথার মধ্যে এটাই **সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ উভয় বিষয়টাই আল্লাহকে অস্বীকার করার অন্তর্ভূক্ত, তবে কুফরীর দিক থেকে [আল্লাহ ও রাসূলকে] গালিগালাজ করা অধিকতর জঘণ্য কাজ।**

www.pathagar.com

লক্ষ্য করুন, লেখক বলেছেন ঃ 'এর অর্থ হচ্ছে কুরআন হাদীসকে নির্ভেজাল ভাবে পরিত্যাগ করা' এ পরিত্যাগ কখনো প্রবল কামনা ও বাসনা শক্তির কারণে হতে পারে। এখানে কুফরীর কারণ 'অস্বীকার করা কিংবা হারামকে হালাল মনে করা, বলা হয়নি! বরং রাসূল (সঃ) এর ফয়সালা না মানা এবং বিচার-ফয়সালা তাগুতের নিকট চাওয়ার মাধ্যমে নির্ভেজাল পরিত্যাগ আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকেই কুফরীর কারণ বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَااتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَاءَ-

"যদি তারা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তাঁর প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান থাকতো, তাহলে তারা তাদেরকে ইহুদি , নাসারাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।"

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ-

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে বিবাদপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালার ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক হিসেবে মেনে নেয়।" আল্লাহ তায়ালা উক্ত বিষয়গুলোকে ঈমান ঠিক থাকার শর্ত করে দিয়েছেন। অতএব প্রমাণিত হলো যে, ঈমান হলো সেই শর্তগুলো সম্পর্কে জানা, যেগুলো পূরণ হওয়া ব্যতীত ঈমানকে ঈমান হিসেবে গণ্য হবে না । (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/৭পৃঃ)

তিনি আরো বলেন ঃ সেই আনছারীর কথাও কুফরী বা ঈমানহীনতার শামিল যে, কালো কন্টকাকীর্ণ ভুমির উপর দিয়ে চলে যাওয়া খালের পানি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে যুবাইর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে রাসূল (সঃ) এর কাছে নালিশ করার পর বিচারের ফয়সালা হিসেবে তিনি যুবাইরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে যুবাইর, তোমার জমিতে পানি দেয়ার পর তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দাও। এ ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে আনসারী বলেছিলো ঃ সে [যুবাইর] নবীর ফুফাত / খালত ভাইতো, এ জন্যেই কি তার পক্ষে রায় দিয়েছেন? [অর্থাৎ নবীর ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট নই।]

সেই ব্যক্তির কথাও কুফরীর শামিল, রাসূল (সঃ) এর ফয়সালা যার বিপক্ষে হওয়ার পর বলেছিলো ঃ আমি [এ বিচারে] রাজী নই। সে তখন [তার মতে] সুবিচার পাওয়ার জন্য প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং পরে হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে গিয়েছিলো। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) লোকটিকে রাসূল (সঃ) এর ফয়সালা না মানার কারণে হত্যা করেছিলেন। পরিশেষে তিনি বলেন, এ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ বক্তব্য ছিলো যা দ্বারা হত্যা ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয় এবং যা দ্বারা ব্যক্তি কাফের মুনাফিক প্রমাণিত হয় ও হত্যা বৈধ বলে গণ্য হয়। রাসুল (সঃ) এর ফয়সালা অমান্যকারীকে কাফের বলার বিষয়টি লক্ষ্য করে দেখুন। এক্ষেত্রে তিনি হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘটনায় উল্লেখ করেছেন । এ ঘটনায় হযরত ওমর (রাঃ) ঐ মুনাফিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, যে রাসূল (সঃ) এর ফয়সালায় সন্তুষ্ট ছিলোনা। যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর ফয়সালায় সন্তুষ্ট নয়, তার ব্যাপারই

www.pathagar.com

যদি হত্যার মতো কাজটি বৈধ হয়, (কাফের গণ্য হওয়ার কারণে) তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করলো আর বিচার ফয়সালা চাইলো গাইরুল্লাহ অর্থাৎ তাগুতের কাছে তার পরিণতি কি হতে পারে।

তিনি আরো বলেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) এর বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, তিনি ঐ লোকটিকে হত্যা করেছেন, যে রাসূল (সঃ) এর ফয়সালা বা বিচারে অসন্তুষ্ট ছিলো। পরবর্তিতে হযরত ওমর (রাঃ) এর পক্ষেই কুরআন এর আয়াত নাযিল হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর বিচার-ফয়সালা (বিধান) কে গালি দেয়, আক্রমণ করে, তাহলে তার পরিণতি কি হতে পারে? এখানে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কথার অর্থ হচ্ছে, যে রাসূল (সঃ) এর বিচার-ফয়সালায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি সে কুফরী করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তার ফয়সালা বা বিধানকে আঘাত করে সে নিঃসন্দেহে কুফরী করে। যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) কে বিচার ফয়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয় না সে ব্যক্তি কাফের এটাই তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য।

৩। ইমাম ইবনুল, কায়্যিম বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) ছাড়া অন্য কারো কাছে তার বিবাদীর বিচার ফয়সালা চাইলো, সে মূলতঃ তাগুতের কাছেই বিচার চাইলো। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাকে নিদের্শ দেয়া হয়েছে। বান্দা তাগুতকে অস্বীকার করতে পারবে না যতক্ষণ না সে সমস্ত বিধানকে একমাত্র আল্লাহর জন্য যেমনটি নির্ধারিত ঠিক তেমনটিই সাব্যস্ত করে। বান্দাহ তাগুতকে অস্বীকার করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বিধানকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করবে। এখানে একথা বলা হয়নি, যতক্ষণনা সমস্ত বিধানের মালিক একমাত্র আল্লাহ বলে বিশ্বাস করবে। তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ومن تحاكم خصمه

" যে ব্যক্তি তার বিবাদীর বিচার-ফয়সালা চায় " এ কথার দ্বারা এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয় যে, বিচার-ফয়সালা চাওয়া একটি কর্ম, যা বিবদমান দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয়। অতএব حتى يجعل الحكم لله وحده এর অর্থ হবে যতক্ষণ না তার বিবাদীর ফয়সালা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত মোতাবেক চাওয়া হবে। যদি কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত যদি বিচার-ফয়সালা চায় তাহলে সমস্ত বিধান দানের বিষয়টি একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয় না। অতএব সে তাগুতকেও অস্বীকার করলো না। আর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো না, তার ইসলামও শুদ্ধ হলো না। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করা, তাওহীদের এমন একটি রুকন অপরিহার্য মৌলিক স্তম্ভ যার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনায়নসহ একজন বান্দা মুসলমানে পরিণত হয়।

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا -

" যদি তোমরা কোনো বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হও, তাহলে তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ করো। যদি তোমরা আল্লাহর ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান এনে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।" (আন নিসা ঃ ৫৯)

www.pathagar.com

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে যাবতীয় বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা বা ফয়সালা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) ন্যস্ত করা ওয়াজিব (অপরিহার্য কর্তব্য)। আল্লাহ ও রাসুল ছাড়া অন্য কারো কাছে নয়। যে ব্যক্তিই বিতর্কিত বিষয়ের জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) ব্যতীত অন্যের কাছে ন্যস্ত করে সে আল্লাহর নিদের্শের বিরোধিতা করে। আর যে ব্যক্তি বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) বিধান ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে আহবান জানায় সে মূলতঃ জাহিলিয়াতের দিকেই আহবান জানায়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিতর্কিত ও বিবাদপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) ওপর ন্যস্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ –

"যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের (কিয়ামত) প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো",

এটা ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয় অর্থাৎ এটা একটি শর্ত যা না পাওয়া না গেলে শর্তকৃত জিনিস ও পাওয়া যায় না। অতএব প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি বিবাদকৃত বা বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে বিচারক মানে সে আল্লাহর প্রতি, কেয়ামতের দিবসের প্রতি, ঈমানের অপরিহার্যদাবী থেকে সরে গিয়েছে। এ আয়াতটি বর্ণণা ও ভুল নিরসনের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট। আয়াতটি এক দিক থেকে হেফাজতকারী অপর দিক থেকে ধ্বংসকারী। কেননা এ আয়াত ঈমান ও তাওহীদের বিরোধিতাকারীকে [জ্ঞানহীন বাতিল যুক্তি তর্কের অপনোদনের মাধ্যমে) ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধি নিষেধগুলোকে কার্যকর করার মাধ্যমে এ আয়াতকে আঁকড়ে ধরবে তাকে এ আয়াত গোমরাহী থেকে রক্ষা করবে। (আররিসালাতু বুকিয়া লিইবনি কায়্যেম জাওয়াজি ১৩৩পৃঃ)

তিনি আরো বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঐ সব ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, যারা রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত জিনিস (কুরআন ও সুন্নাহ) ব্যতীত অন্য কিছুর কাছে বিচার-ফয়সালা চায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ –

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর নির্দেশিত দিকে এসো, যা তিনি রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন, তখন আপনি মোনাফিকদেরকে দেখবেন, তারা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে।" (আননিসা ঃ ৬১)

এখানে আল্লাহ তায়ালা রাসুল (সঃ) কর্তৃক আনীত জিনিস তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হওয়াকে মুনাফিকির স্বরূপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঠিক যেমনি ভাবে রাসূলের (সঃ) বিধানকে যখনই বিচার ফয়সালা করা হয় তখনই নিঃসঙ্ক

www.pathagar.com

চিত্তে তা গ্রহণ করা এবং মুহাব্বত ও ভালবাসার সাথে তা গ্রহণ করাকে ঈমানের মূল বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহর ও রাসূলের (সঃ) ফয়সালা স্বতঃসফূর্ত ও দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়াই ঈমানের স্বরূপ, আর তা প্রত্যাখ্যান করাই হচ্ছে মুনাফিকির আসল রূপ। (মুখতাছার সাওয়ায়েকে মুরসাল)

তাঁর কথা লক্ষ্য করুন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত জিনিস তথা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হওয়াকে মুনাফিকির স্বরূপ বলে সাব্যস্ত করেছেন " এখানে মুনাফিকির স্বরূপ কথার দ্বারা নেফাকে আকবর [জঘন্য মুনাফিকি] বুঝানো হয়েছে" শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন ঃ কুফরীর কোনো শাখার কার্য সম্পাদনকারী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত কুফরী (যে কুফরী কাজে কোনো সন্দেহ) কর্ম সম্পাদন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ কাফের পরিণত হবে না। (অর্থাৎ আংশিক কুফরী কাজ দ্বারা পুর্ণাঙ্গ কাফেরে পরিণত হয় না। যেমন নামাজ না পড়া কুফরী কর্ম হলেও বে-নামাজীকে কাফের বলা যাবে না যতক্ষণ না তার দ্বারা সুস্পষ্ট কুফরী কর্ম সম্পাদিত হয়)।

ইবনুল কাইয়্যিম তার স্বরচিত কবিতায় বলেন ঃ

নিজ সত্বার কসম খেয়েছেন
মহান আল্লাহ পাক জাত,
যে কসমে করেছেন বয়ান
ঈমানের হাকীকাত ।
সে তো নয় মুমিন কভূ
চায় যে বিচার অন্যের কাছে,
মহান নবীকে বাদ দিয়ে ভাবে,
আছে সুবিচার তাগুতের কাছে।
সেই তো পরিচয় দেয় ঈমানের,
বিধান চায় যে হাদীস, কুরআনের।
দ্বিধা যদি থাকে লুকিয়ে মনে,
নয় সে মুমিন আছে বিধানে
যদি না মানে উদার মনে
যেমনটি আছে বিধান কুরআনে ।

তিনি আরো বলেন ঃ

সুস্পষ্ট অহিতে বিচার করেন তিনি,
দুটি বিধায়ক আছে তার কাছে বলেছেন যিনি।
অন্যায় বিচার তারা করেনা কভূ
এনেছেন ন্যায়ের সওদা, দিয়েছেন তাদের প্রভূ

www.pathagar.com

একটি হলো তার কিতাব আল্লাহর,
ন্যায় ও ইনসাফের প্রতীক,
শান্তি ও সুখের সুধা লুফে নেয় সে,
অশান্তির অনলে যে, বিচলিত দিক-বিদিক।
অপরটি হলো রাসূলের (সঃ) বাণী,
যার নাম মুমিনের দ্বিতীয় বিধায়ক ,
এ ছাড়া কভু না হবে ইনসাফ
হবে না কোনো দিন ন্যায় বিচারক।
তাকে যদি তারা তোমায় কখনো
ছেড়ে দিয়ে বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্‌র,
তাগুতের ডাকে কভূ দিওনা সাড়া
তাহলে তুমি বেঈমান ও পাপী, হবে গুনাহগার।

তিনি আরো বলেন ঃ প্রত্যেক কওমের সেই হচ্ছে তাগুত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কে বাদ দিয়ে লোকেরা যার কাছে বিচার ফায়সালা চায়। (আ'লামুল মুকিন ৫০/১)

৪। হাফেজ ইবনে কাসির (রহঃ) বলেন ঃ (অতঃপর জুওয়াইনী ইয়াসা আইনের কিছু কথা উল্লেখ করেছেন। এ আইনের মধ্যে রয়েছে, যে জ্বেনা-ব্যভিচার করবে তাকে হত্যা করা হবে, সে বিবাহিতই হোক কিংবা অবিবাহিত। যে ব্যক্তি সমকামিতায় লিপ্ত হবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ইচ্ছা পূর্বক মিথ্যা বলবে তাকে হত্যা করা হবে, যে যাদু করবে তাকে হত্যা করা হবে। যে গুপ্তচরী করবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি দু'জন বিবদমান ব্যক্তির মাঝে হস্তক্ষেপ করবে এবং একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে তাকে হত্যা করা হবে। বদ্ধ পানিতে যে পেশাব করবে, তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি পানিতে ডুব দিবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোনো বন্দীকে খাবার দিবে অথবা পানি পান করাবে কিংবা কাপড় পরিধান করতে দিবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি কোনো পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে পেয়ে তাকে প্রত্যার্পণ না করবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি কোনো বন্দীকে খাওয়াবে অথবা ভক্ষিত জিনিস তার দিকে নিক্ষেপ করবে তাকে হত্যা করা হবে। [বরং হাত হাতে প্রদান করবে।] কোনো ব্যক্তি কাউকে কিছু খেতে দিলে তা থেকে নিজে প্রথমে খাবে যদি সে ব্যক্তি (যাকে খাওয়ানো হবে) বন্দী না হয়ে আমীরও হয় তবু। যে ব্যক্তি নিজে খাবে তার সাথের ব্যক্তিকে খাওয়াবে না তাকেও হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি পশু জবাই করবে তাকে পশুর মতো জবাই করা হবে, বরং তার পেট চিড়ে হাত দিয়ে তার হৃদপিন্ড প্রথমেই বের করা হবে। এ সব কথা আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর আল্লাহর যে শরীয়ত (জীবন বিধান) নাযিল হয়েছে তার সম্পূর্ন পরিপন্থী। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর ওপর নাযিলকৃত শরীয়তকে যে পরিত্যাগ করে এবং রহিতকৃত বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চায় সে কুফরী করে। তাহলে যে ব্যক্তি "ইয়াসা"র কাছে বিচার-ফয়সালা চায় তার অবস্থাটা কি হতে পারে? এমনটি যে, সে মুসলমানদের সর্বসম্মত রায়ে কুফরী করে। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াহ ১৩৭/১৩)

www.pathagar.com

এটা তাঁর (হাফেজ ইবনে কাসিরের) সুস্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তি রহিত হয়ে যাওয়া খোদায়ী বিধান (তাওরাতের শরীয়ত) এর কাছে বিচার ফয়সালা চায় সে সর্বসম্মত রায়ে কুফরী করে। তাহলে মানব রচিত বিধানের কাছে যে বিচার-ফয়সালা চায়, তার অবস্থা কি? সে নিশ্চায়ই তুলনামূলকভাবে বেশী জঘণ্য অপরাধে অপরাধী। কেউ কেউ (কুফরীর) এ হুকুম এবং সর্বসম্মত রায়ে কুফরী সংক্রান্ত ধমক তাতারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ধরে নিয়েছে। কারণ যে সব কাজ মানুষকে কাফেরে পরিণত করে এ ধরণের কাজ তাতারীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এ ধারণা সম্পুর্ণরূপে বাতিল। বাতিল হওয়ার কারণ হিসেবে আমরা বলতে চাই, যে হুকুম বা বিধানের ইজমা (সর্ব সম্মত রায়) পাওয়া গিয়েছে সেটাকে তাতারীদের সাথে খাছ করার কি প্রমাণ আছে? ইবনে কাসির (রহঃ) এর কথা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন ঃ যে কেউ শরীয়তের বিধান পরিত্যাগ করবে। এটা সবারই জানা যে, [من] "যে কেউ" কথাটি সকলের জন্যই উন্মুক্ত। [অর্থাৎ কোনো জাতির জন্য নিদিষ্ট নয়]। ইবনে কাসির এখানে হুকুম [বিধানের] এর ক্ষেত্রে শরীয়তের সাধারণ মাসআলার কথা বলেছেন। আর মাসআলাটি হচ্ছে, শরীয়া মুহাম্মাদী পরিত্যাগ করা এবং ইসলাম বাদ দিয়ে [মানব রচিত অন্যান্য বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া।] তিনি একথা ও উল্লেখ করেছেন যে, রহিত হয়ে যাওয়া খোদায়ী শরীয়ত [বিধান] এর কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়াই যদি কুফরী হয়, তাহলে মানব রচিত কুফরী বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার ফল কি হতে পারে? অতএব যে ব্যক্তি ইয়াসার কাছে বিচার-ফয়সালা চায়? আর ইয়াসা হচ্ছে সেই মানব রচিত বিধান যা চেঙ্গিস খান রচনা করেছিলো। এ ব্যাপারে কিছু কথা প্রারম্ভিক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব তিনি বলেন ঃ এ সব কথা আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর আল্লাহর যে শরীয়ত [জীবন বিধান] নাযিল হয়েছে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতঃপর তিনি সর্বসম্মত সেই অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী কোনো বিধানের মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করে সে কুফরী করে। এক্ষেত্রে তাতারীদের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে তারা [তাতারীরা] এ ধরনের কুফরীর মধ্যে পতিত হয়েছে ।

افحكم الجاهلية يبغون "তারা কি জাহেলী যুগের বিচার ফয়সালা কামনা করে?" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি যা বলেছেন তা আলোচিত বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দেয়। তিনি বলেন ঃ যারা সঠিক কল্যাণময়, সকল মন্দকে নিষেধকারী আল্লাহর বিধান থেকে [অমান্য করার মাধ্যমে] বের হয়ে গিয়েছে এবং যারা আল্লাহর শরীয়তের কোনো দলীল প্রমান ছাড়াই মানুষের মনগড়া মতামত চিন্তা ভাবনা এবং পরিভাষার দিকে ফিরে যায়। ঠিক যেমনি ভাবে জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত লোকেরা গোমরাহী, মুর্খতাপূর্ণ আইন দ্বারা শাসন করে থাকে, যে আইন তারা রচনা করে তাদের নিজস্ব মতামত ও কামনা বাসনার ভিত্তিতে। তাতারীরাও তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের রাজনীতি প্রসূত বিধানের সাহায্যে বিচার ফয়সালা করতো, যা ইয়াসেক কর্তৃক প্রনীত হয়েছিলো। তাদের সংবিধান ছিলো মূলত ঃ বিভিন্ন শরীয়ত তথা ইয়াহুদী , খৃষ্টান ও মুসলিম মিল্লাত থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত একটি আইন গ্রন্থ। এ খানে এমন বহু আইন রয়েছে যা আইন

www.pathagar.com

প্রণেতার শুধু ব্যক্তিগত দৃষ্টি ভঙ্গি এবং মনের আবদার কামনা বাসনা থেকে জন্ম নিয়েছে [অর্থাৎ মানুষের কোনো কল্যান সাধনের জন্য নয়] পরবর্তিতে এ মনগড়া আইনই একটি অনুসৃত বিধান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং এ আইনকে কুরআন ও সুন্নাহর উর্ধে স্থান দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ) এর দিকে প্রত্যার্বতন না করে ততক্ষণ তার সাথে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। কম হোক আর বেশীই হোক এটা ছাড়া তার জন্য অন্য কোনো ফয়সালা নেই। এখানে তিনি দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন্।

একঃ তিনি বলেছেন ঃ যেমনি ভাবে জাহিলিয়াত বা মুর্খতায় নিমজ্জিত লোকেরা, গোমরাহী মুর্খতাপূর্ণ আইন দ্বারা শাসন করে, যে আইন তারা রচনা করে তাদের নিজস্ব মতামত, কু প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার ভিত্তিতে । তাঁর এ কথার দ্বারা এ হুকুম [বিধান] যে তাতারীদের ব্যাপারে খাস, এটা খন্ডিত হয়ে গিয়েছে। [অর্থাৎ এ কথা তাতারীদের জন্য খাস নয়] বরং বিধান সকলের জন্য । এ হুকুম বা নির্দেশ যে ব্যক্তি মানব রচিত বিধান এবং তাগুতী আইন কানুন ইত্যাদি জাহেলী বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা চায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দুইঃ তিনি বলেছেন ঃ 'যেমনি ভাবে তাতারীরা ও তাদের রাজা চেঙ্গিস খাঁনের রাজনীতি প্রসূত বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করতো'। এর দ্বারা তিনি তাতারীদের কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রায় তাতারীদের জন্য খাস নয়, এটাই সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন; এ জন্যই তাঁর ফতোয়া বা রায়কে তিনি বর্ণনা করেছেন । সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখে তার কথা শেষ করেছেন । তিনি তাঁর বাক্যের مَنْ (যে কেউ) শর্ত ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ বাক্যটি শর্ত জ্ঞ্যাপক বাক্যে রূপান্তরিত করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে যে কেউ উক্ত কাজ (আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে তাগুতী বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা) করবে, সেই কাফের হিসেবে গণ্য হবে। তিনি তাঁর ইজমা (সর্ব সম্মত রায়) সম্পর্কে বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ কাজ (তাগুতী বিধান দ্বারা বিচার) করবে, সে মুসলমানদের ইজমায় (সর্ব সম্মত রায়ে) কুফরী করে। তাঁর এ সাধারণ ও উন্মুক্ত কথার দ্বারা তার ফতোয়ার (বা রায়ের) বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছে।

এ "ইজমা" (সর্ব সম্মত রায়) এর ব্যাপারে ইসলাম বিরোধীদের মধ্যে দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। কারণ তারা বলে ঃ রহিত হয়ে যাওয়া শরীয়তের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া কুফরী। কেননা রহিত হয়ে যাওয়া (মানসূখ) শরীয়ত 'দ্বীন' হিসেবে গণ্য, যে ব্যক্তি এর মধ্যে বিচার-ফয়সালা চায়, তখন দ্বীনি আক্বীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে তা চায় । কিন্তু মানব রচিত শরীয়ত (আইন কানুন) দ্বীন (জীবন বিধান) হিসেবে বিবেচিত নয়)। এর জবাবে আমরা বলবো ঃ একথা (মানব রচিত আইন কানুন দ্বীন হিসেবে গণ্য নয়) নিঃসন্দেহে বাতিল। বাতিলের প্রামাণ্য দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তার মহাগ্রন্থে কাফির ও মুশরিকদের আইন কানুন রীতি-নীতি কে তাদের দ্বীন (জীবন বিধান) হিসেবে নামকরণ করেছেন ।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ –

"আপনি বলে দিন হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা যার ইবাদত করো আমি তার ইবাদত করিনা এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি এবং আমি ইবাদত কারী নই তোমরা যার ইবাদত করো। তোমরা ইবাদত কারী নও আমি যার ইবাদত করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আর আমার দ্বীন আমার জন্য।" (কাফিরুন ১–৬)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহা গ্রন্থের অন্য এক স্থানে সুস্পষ্টভাবে নীতি, বিধান ও পদ্ধতিকে দ্বীন হিসাবে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সুরা ইউসুফে ইরশাদ করেছেন ঃ

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ–

"এমনি ভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম । সে বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনো দাসত্বে নিতে পারতো না।"

(ইউসুফ ঃ৭৬)

হাফেজ ইবনে কাসির (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ মিসরের রাজার আইন (দ্বীন) মোতাবেক তাকে (তার ভাইকে) ধরে নেয়া যথার্থ ছিলো না। (রাষ্ট্র আইন কানুনকে এখানে দ্বীন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে) ইমাম কাসেমী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ কুফরী রীতি-নীতি ও আইন কানুনকে তাদের দ্বীন হিসেবে নামকরণ করা সম্পূর্ণ রূপে জায়েয এবং বৈধ। তাঁরা আরো বলে ঃ রহিত হয়ে যাওয়া শরীয়তের বিচার ফয়সালা যে ব্যক্তি চায়, তাকে কাফের বলা হবে এ জন্য যে এর প্রতি আক্বীদা বিশ্বাস ছাড়া বিচার চাওয়া যায় না। তাদের এ কথাও বাতিল। আর বাতিল হওয়ার প্রমাণ্য দিক হচ্ছে এই যে, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাইঃ যদি কোনো ব্যক্তি বিশ্বাসের কারণে নয় বরং দুনিয়ার স্বার্থ আদায়ের জন্য রহিত হয়ে যাওয়া বিধানের ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা চায়, তাহলে কি আপনাদের কাছে সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে? যদি আপনার জবাবে 'না' বলেন, তাহলে যে বিষয়ে ইজমা [সর্বসম্মত রায়] প্রতিষ্টিত হয়েছে তা আপনারা ধূলিস্মাৎ করে দিলেন । আর যদি জবাবে 'হাঁ' বলেন, তাহলে আমরা বলবো, যে ব্যক্তি রহিত হয়ে যাওয়া শরীয়তের বিচার চাইলো। আর যে ব্যক্তি মানব রচিত শরীয়ত বিধানের বিচার চাইলো এ দুইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে? আমরা এটা জানি যে, উভয়েই যা করেছে তা আক্বীদা বিশ্বাসের জন্য নয় বরং দুনিয়ার স্বার্থ আদায়ের জন্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

"এটা এ জন্য যে তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন না"।

(নাহলঃ ১০৭)

www.pathagar.com

ইমাম মাহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তাঁর 'কাশফুশ শুবহাত' নামক পুস্তিকায় এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ এটা সুস্পষ্ট যে, কুফরী এবং শাস্তির কারণ বিশ্বাস অথবা অজ্ঞতা কিংবা দ্বীনের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ অথবা কুফরীর প্রতি ভালবাসা নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে এর পিছনে দুনিয়ার স্বার্থ নিহিত ছিলো, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দ্বীনের ওপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে।

অতএব রহিত হয়ে যাওয়া বিধান কিংবা মানব রচিত বিধানের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা চাওয়া এমন কুফরী যা ইসলামের গন্ডি থেকে মানুষকে বের করে দেয়। চাই বিচার প্রার্থী বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বিচার চাক অথবা অবিশ্বাসের ভিত্তিতেই বিচার চাক। সর্বাবস্থাতেই তার এ কর্ম তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দিবে।

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইঞ্জিলের [হযরত ঈসা (আঃ) এর ওপর নাযিলকৃত কিতাব খৃষ্টানদের কাছে যা "বাইবেল" নামে পরিচিত] সেই বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করলো, যা অহীর মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত হয়নি, সে কাফির, মুশরিক এবং ইসলাম থেকে বর্হিভূত বলে বিবেচিত হবে। (আহকাম ফি উসুলিল আহকাম)

শাইখ আহমাদ শাকের (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা করলো সে কাফের এবং যে এই বিচার-ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকলো এবং স্বীকৃতি দিলো সেও কাফের। চাই সে আহলে কিতাবের শরীয়তের [বিধান] নামেই বিচার করুক অথবা মানব রচিত বিধানের নামেই বিচার করুক। এর সবটুকুই কুফরী আর ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার শামিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে হেফাজত করুন । (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিতাহকিক তা'লিকিশ্ শায়খ আহমদ সাকের ১৮০-১৮৪)

শাইখ সালেহ বিন ফাউজান আল-ফাউজান তাঁর الارشاد الى صحيح الشرك الاعتقاد والرد على اهل নামক কিতাবে তাতারীদের সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীরের বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ যে আইন কানুনের কথা তিনি তাতারীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন এবং যে আইনকে ইসলামী শরীয়তের বিকল্প বিধান হিসেবে সাব্যস্ত করার কারণে কুফরীর ফতোয়া দিয়েছেন সে আইনের উপমা হচ্ছে বর্তমান সময়ের মানব রচিত আইন, যাকে অনেক রাষ্ট্রই আইনের উৎস বলে গণ্য করে, যার কারণে তথাকথিত কতিপয় ব্যক্তিগত অবস্থা ব্যতীত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামী শরীয়তকে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব যারা করেছে তাদেরকে কাফের হিসেবে গণ্য করার বহু প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। যেমনঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ-

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন বা বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের" (আল-মায়েদা ঃ ৪৪)

www.pathagar.com

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ .....

"এবং তোমার রবের কসম, সে লোক ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে বিবাদপূর্ণ বিষয়ে তোমাকে ন্যায় বিচারক হিসেবে মেনে নিবে।" (আন-নিসা ঃ ৬৫)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ)
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا-

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি যদি তোমাদের ঈমান থাকে, তাহলে বিরোধপূর্ণ বিষয়টি ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) দিকে প্রত্যার্পন করো। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।"
(আন-নিসা ঃ ৫৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর বিচারের ভার না দিবে এবং এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন না করবে, সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। (ফাতহুল মাজীদ)

৫। দার নাজদিয়ার মুফতী , ফাতহুল মাজীদ গ্রন্থের লিখক আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ (যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে) এ আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতকে বিশ্বাস করা। একই অধ্যায়ে তিনি আরো বলেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) এর ঘটনায় যে মুনাফিককে বিচার-ফয়সালা কা'ব বিন আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে চাওয়ার অপরাধে তিনি হত্যা করেছিলেন, তা দ্বারা যার মধ্যে কুফরী এবং মুনাফিকী প্রকাশ পাবে তাকে হত্যা করার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

৬। আল্লামা শাইখ জামাল উদ্দীন আল-কাসেমী (রহঃ) তাঁর محاسن التأويل নামক তাফসীর গ্রন্থে اَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا-

"তারা বিচার-ফয়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাকে অস্বীকার কারার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়।"(আন-নিসা ঃ ৬০)

এখানে তাগুতের কাছে বিচার - ফয়সালা চাওয়ার বিষয়টিকে মূলতঃ তাগূতের প্রতি ঈমান আনা বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এতে

www.pathagar.com

কোনো সন্দেহ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কুফরী করা। যেমনি ভাবে তাগুতের সাথে কুফরী করা মানেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

৭। **আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ (রহঃ)** তাঁর تيسير العزيز الحميد নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার - ফয়সালা চাওয়া পরিত্যাগ করা ফরজ। যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চায়, সে মুমিন তো নয়ই এমনকি মুসলমান ও নয়।

৮। **আল্লামা শাইখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান বিন আল শাইখ (রহঃ)** বলেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চাইলো সে কাফের (আদ্ দুরারুস সুন্নিয়াহ ৪৭৬/১০)

৯। **আল্লামা শাইখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ)** বলেন ঃ যে সব জিনিস একজন মুসলিমকে মুরতাদে [ধর্ম ত্যাগীতে] পরিণত করে সে সব জিনিসের মধ্যে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চাওয়া। আমি বলি ঃ এর মতোই তাদের উদাহরণ যারা তাদের বাপ-দাদার পূর্ব পুরুষদের স্বরচিত, অভিশপ্ত বিধানের কাছে বিচার ফয়সালা চায় (তারা এর নাম দিয়েছে বন্ধুত্বের বিধান) এবং কুরআন সুন্নাহর ওপরে বিধানকে স্থান দেয়। এ কাজ যে করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। (সাবিলিন নাজাতি ওয়াল ফাকাকি মিন মুওয়ালাতিল মুরতাদ্দীন)

১০। **আল্লামা শাইখ হামাদ বিন নাসের আল মা'মার (রহঃ)** বলেন সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا-

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমানদার হলে বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পন করো। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।" (আন-নিসা ঃ৫৯)

দ্বীনের মৌলিক কিংবা প্রাসংগিক সকল বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধ সৃষ্টি হলে তার মিমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) কাছে প্রত্যাপর্ণ করা ওয়াজিব, উপরোক্ত আয়াতটি এরই প্রমাণ। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরার্তের প্রতি ঈমান এনে থাকো) এখানে প্রত্যার্পণের বিষয়টিকে ঈমানের সাথে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে বিবাদ পূর্ণ বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) কাছে প্রতার্পণ না করলে ঈমানও থাকবেনা। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) বাদ দিয়ে বিবাদ পূর্ণ বিষয়ে অন্য কাউকে বিচারক ও ফয়সালাকারী মানলো, সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণের

www.pathagar.com

অপরিহার্য দাবী থেকে বের হয়ে গিয়েছে । (মাজমুআতুর রাসায়েল ওয়াল ফাতাওয়া)

১১। আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন সামহান (রহঃ) বলেন ঃ আহলে তাগুতকে (খোদাদ্রোহী শক্তিকে যারা মান্য করে ও বিশ্বাস করে) যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাগুতী বিধানগুলোকে পরিত্যাগ করো , তখন তারা বলে ঃ আমরা শুধু পারসপরিক হত্যার ভয়ে এরকম করছি। আমি যদি এ [মানব রচিত] আইনের কাছে [যার নাম বন্ধুত্বের বিধান] বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে আমার সাথীর সাথে একমত না হই তাহলে হয়তো সেই আমাকে হত্যা করবে না হয় আমি তাকে হত্যা করবো। এরপর তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছেনঃ তাহলো, তুমি যখন জানতে পারলে যে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া কুফরী, তখন জেনে রাখো যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, কুফরী হত্যার চেয়েও জঘণ্য অপরাধ।

وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ-

"ফেতনা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ]" (আল-বাকারাহ ২১৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ-

"ফেতনা হত্যার চেয়েও জঘণ্য অপরাধ।" (আল-বাকারাহ ঃ ১৯১)

কুফরীই মূলতঃ ফেতনা। যে ইসলামী শরীয়ত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে (সঃ) পাঠিয়েছেন, পৃথিবীতে তার পরিপন্থী তাগুতী বিধান জারি হওয়ার চেয়েও সভ্য-অসভ্য দুজনে মারা মারি করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অনেক সহজ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা যদি কুফরী হয়, আর ঝগড়া-বিবাদ যদি একমাত্র দুনিয়ার জন্যই হয় তাহলে ঐ কুফরী কিভাবে বৈধ হতে পারে [অর্থাৎ কুফরী কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়] । কেননা, একজন মানুষের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবেনা । এমনকি রাসূল (সঃ) তার কাছে স্বীয় সন্তান, মাতা-পিতা ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হতে হবে। তোমার দুনিয়ার সবটাই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবুও দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষায় তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া তোমার জন্য জায়েয নয় । যদি কোনো পাপীষ্ঠ ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া অথবা তোমার পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া, এদুটি বিষয়কে বেছে নেয়ার এখতিয়ার দেয়, তাহলে তোমার পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া ওয়াজিব তবু তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া তোমার জন্য জায়েয নয়। (আদদুরারুস সুন্নিয়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক মুনাফিক হত্যার ঘটনা (যাকে তিনি শুধু মাত্র তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার কারণে হত্যা করেছেন) উল্লেখ করে বলেনঃ তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা যারা চায়, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ রকম আচরণ করা উচিৎ । একজন সত্যানুসারী সচেতন খলীফা যদি লোকটিকে শুধুমাত্র তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া অপরাধে হত্যা করতে

www.pathagar.com

পারেন, তাহলে এ [দৃঢ়তাপূর্ণ] স্বভাবের ওপর যিনি প্রতিষ্ঠিত, এবং এটা ছাড়া যিনি নিজের জন্য ও তাঁর সমমনাদের জন্য অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট নন, তাঁর পক্ষে ধর্মত্যাগীকে এবং দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি কারীকে হত্যা করা অধিকতর সহজ ও সমীচিন।কেননা সৃষ্টির জন্য আল্লাহই একমাত্র মাবুদ [উপাস্য], মুহাম্মদ (সঃ) ই তাঁর একমাত্র নবী যার আনুগত্য তাকে করতে হবে এবং তাঁর শরীয়ত বা বিধানের কাছেই সে বিচার চাবে, এর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণ । এ মহা সত্যের অনুপস্থিতিতে সৃষ্টি হবে বিরাট বিপর্যয় এবং দেখা দিবে অনিষ্টতা। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ-

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ তা বিশ্বাস করে।"

এ আয়াতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) প্রতি ঈমান পোষণের দাবী করে অথচ ইসলামী শরীয়ত ছাড়া অন্য বিধানের কাছে বিচার ফয়সালা চায় সে মিথ্যাবাদী, মুনাফিক, সরল ও সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত। (আদদুরারুস সুন্নিয়া)

১২। শাইখ আবদুর রহমান আস সাদী (রহঃ) তাঁর القول السديد على كتاب التوحيد নামক গ্রন্থে বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালার হালালকৃত জিনিস হারাম করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর হারামকৃত জিনিস হালাল করার ক্ষেত্রে আলেম ও আমীর ওমারাগণের আনুগত্য করার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করা। তিনি আরো বলেন ঃ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাউকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ না করা এবং মানুষের মধ্যে বিবাদ পূর্ণ বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) কাছে প্রত্যার্পণ করা । এর মাধ্যমেই বান্দার দ্বীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হবে। এবং তাঁর তাওহীদ একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর জন্য নিশ্চিত হবে। যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে বিচার-ফয়সালা চাইলো সে মূলত ঃ তাগুতের কাছে বিচার চাইলো, যদি সে নিজেকে এমতাবস্থায় মুমিন বলে দাবী করে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হবে, তার ঈমান সহীহ ও পূর্ণ হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত না সে দ্বীনের মৌলিক ও প্রাসংগিক বিষয়ে এবং সমস্ত অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) কাছে বিচার-ফয়সালা চায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) বাদ দিয়ে যারই কাছে বান্দা বিচার-ফয়সালা চাইলো, তাঁকেই সে রব হিসেবে গ্রহণ করলো এবং তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা প্রার্থনা করলো। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً-

"যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যদি তোমরা ঈমানদার হও , তাহলে ফয়সালার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) প্রতি প্রত্যার্পণ করো।"

(আন-নিসা ঃ ৫৯)

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয় ফয়সালা করার জন্য কুরআন ও হাদীছের কাছে প্রত্যাপর্ণ না করবে সে প্রকৃত মুমিন নয়। বরং সে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করে। যেমনটি এর পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ।

১৩। আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ১৪। শাইখ আবদুল্লাহ বিন হামীদ ১৫। শাইখ আবদুল লতিফ বিন ইবরাহীম ১৬। শাইখ আবদুল আজীজ আল-শাতরী ১৭। শাইখ আবদুল লতিফ বিন মুহাম্মদ, ১৮। শাইখ আবদুল্লাহ বিন আকীল ১৯। শাইখ আবদুল আজীজ বিন রাশীদ, ২০। শাইখ মুহাম্মদ বিন আওদাহ এবং ২১। শাইখ মুহাম্মাদ বিন মুহাইরি (রহঃ) বলেনঃ সবচেয়ে খারাপ কাজ ও সবচেয়ে জঘণ্য অন্যায় কাজ হচ্ছে, আল্লাহর শরীয়ত [বিধান] কে বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান ও আইন-কানুন পূর্ব-পুরুষ ও বাপ-দাদা কর্তৃক গৃহীত রীতি-নীতির ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা চাওয়া। এ গোমরাহী ও কুফরীর মধ্যে বর্তমান যুগের বহুলোক নিমজ্জিত এবং আল্লাহ তায়ালা যে শরীয়ত দিয়ে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) কে পাঠিয়েছেন তার বদলে তারা মানব রচিত বিধান নিয়েই সন্তুষ্ট। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটা হচ্ছে বান্দার সবচেয়ে বড় মোনাফিকী, কুফরী, জুলুম, ফাসেকী এবং কুরআন কর্তৃক বাতিলকৃত ও রাসূল (সঃ) কর্তৃক সাবধানকৃত জাহেলী বিধানের সবচেয়ে বড় আলামত।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا –

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে , তারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে, তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, তথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নিদের্শ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায় ।" (আন নিসা ঃ ৬০)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ–

"যে সব লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই কাফের।" (আল-মায়েদা ঃ ৪৪)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ–

"যে সব লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই জালেম।" (আল-মায়েদা ঃ ৪৫)

www.pathagar.com

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-

"যে সব লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই ফাসেক।" (আল-মায়েদা ঃ ৪৭)

এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তাঁর রাসুলের (সঃ) সুন্নাত থেকে বিরত থাকা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে বিচার চাওয়ার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল বান্দার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, জালেম, ফাসেক, মুনাফিকী চরিত্রের অধিকারী এবং জাহিলিয়্যাতে বিশ্বাসী, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা। হে মুসলমান ভাইসব, আপনাদেরকে সেই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। সকল বিষয়ে আপনারা আল্লাহর শরীয়তকেই ফয়সালাকারী মেনে নিন। এর বিরোধী বিধানের ব্যাপারে আপনারা সতর্ক থাকুন। এর (কুরআন ও সুন্নাহর) ভিত্তিতে আপনারা একে অপরকে উপদেশ দিন। আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতাকারীদের প্রতি, তাঁর বিধানের যারা অমর্যাদা করে, এর সাথে যারা উপহাস ও কটাক্য করে অথবা গাইরুল্লাহর বিধানের কাছে ফয়সালা চাওয়ার পথ সুগম করে দেয় তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করুন, ঘৃণা প্রকাশ করুন। যাতে করে আল্লাহর প্রদত্ত সম্মান নিয়ে আপনারা সফলকাম হতে পারেন আর আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। অপরদিকে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসুলের (সঃ) বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালাকারীদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করার যে দায়িত্ব তিনি আপনাদের দিয়েছেন সে দায়িত্বও পালন করা হবে। আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। কাফের ও মুনাফিকদের সদৃশ হওয়া থেকে তিনিই আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে রক্ষা করবেন। তিনি তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবেন এবং দ্বীনের শত্রুদেরকে করবেন অপমানিত ও লাঞ্ছিত। তিনিই সর্ব শক্তিমান। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদ (সঃ) এর ওপর, তাঁর পরিবার বর্গ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

(ফতোয়া সাইখ মাহমুদ বিন ইবরাহিম৭৫৬/১৭)

২২। আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানকিতী (রহঃ) বলেন ঃ অবাক ও বিস্ময় হতে হয় ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত (বিধান) কে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চায়। অতঃপর ইসলামেরও দাবী করে (অর্থাৎ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا -

www.pathagar.com

" আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে কিন্তু তাঁরা যাবতীয় ব্যাপারে বিচার-ফয়সালা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়"। (আন-নিসা ঃ ৬০)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ-

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করেনা, তারাই কাফের ।" (আল মায়েদা ঃ ৪৪)

তিনি আরো বলেন ঃ এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যা সূরা নিসাতে বর্ণনা করেছেন, সেখানে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, যারা আল্লাহ্ তাআলার শরীয়ত বা বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালা চায় আবার তারা মুমিন হওয়ার দাবীও করে এতে তিনি বিস্ময় বোধ করেন। এর কারণ হচ্ছে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার সাথে তাদের ঈমানের দাবীটা এতটাই চরম মিথ্যা যা দ্বারা শুধু বিস্ময়ই সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীই এর প্রমাণঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا -

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে কিন্তু তাঁরা যাবতীয় ব্যাপারে বিচার-ফয়সালা তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়"। (আন-নিসা ঃ ৬০)

উল্লেখিত এ ঐশী বাণীতে একথা সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যে, রাসূল গণের জামানাতে যে বিধান ও শরীয়ত আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন, তার পরিপন্থী শয়তান ও তার দোসরদের রচিত বিধানের যারা অনুসরন করে, তাদের কুফরী ও শেরেকীর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তবে আল্লাহ যাদের দৃষ্টি শক্তিকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের মতোই অহীর (ঐশী বাণী) আলো থেকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছেন তাদের কথা ভিন্ন।

তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা, আর তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করা মূলতঃ একই অর্থ জ্ঞাপক। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নীতি ও গাইরুল্লাহর বিধান অনুসরন করে সে ঐ ব্যক্তির মতোই যে মূর্তির ইবাদত বা উপাসনা করে আর প্রতিমাকে সেজদা করে।

www.pathagar.com

কোনো দিক থেকেই এ দুটি কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুটি কর্মেরই ফলাফল এক। দুজনই আল্লাহর সাথে শিরককারী।

২৩। শাইখ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন কাসেম (রহঃ) কিতাবুত্তাওহীদের হাশিয়ায় (টিকা) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এ সাক্ষ্য দিলো অতঃপর বিবাদপূর্ণ বিষয়ে সে আল্লাহর রাসূলকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চাইলো, তাহলে সে তার সাক্ষ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার রাসূলের (সঃ) ওপর নাযিলকৃত কিতাব এবং তার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে বলে দাবী করে অথচ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে বিবাদপূর্ণ বিষয়ের বিচার-ফয়সালা গাইরুল্লাহর কাছে চায়, তার ঈমানের দাবীকে আল্লাহ তায়ালা অস্বীকার করেছেন। কেননা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ এ আয়াতে রয়েছে তিরষ্কার, ভর্ৎসনা ও অস্বীকৃতি জনিত প্রশ্ন আর ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করা হয়েছে যে কুরআন ও সুন্নাহকে পরিত্যাগ করেছে এবং কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে বাতিল তথা তাগুতের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। যেমনিভাবে ইবনে কায়্যিমের কথা ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর তা হলো যার মাধ্যমে বান্দা তার সীমা অতিক্রম করে (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কুফরী ও শেরেকীতে লিপ্ত হয়) যেমন কোনো সৃষ্টিকে মাবূদ হিসেবে গ্রহণ করা । তাই যে ব্যক্তিই কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাইলো সে মূলতঃ সেই তাগুতের কাছেই বিচার-ফয়সালা চাইলো যাকে অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ সেই বিধানকেই অস্বীকার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা তাগুত কর্তৃক বিচার-ফয়সালার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। বিচার-ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহতে রাসুলের (সঃ) কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) ব্যতীত যে কেই বিচার-ফয়সালা চাইবে সেই তার সীমা অতিক্রম করবে এবং আল্লাহরও তাঁর রাসলের (স) শরীয়ত থেকে সে বের হয়ে যাবে। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছুর এবাদত করে সে মূলতঃ তাগুতের ইবাদত করে। আর সে মানুষকে এর মাধ্যমে বাতিলের দিকে আহবান জানায়। যে ব্যক্তি একাজ করবে তার জন্য কাজটাকে সৌন্দার্যমন্ডিত করে তোলে। অথচ একাজটি হচ্ছে তাওহীদের পরিপন্থি। কেননা তাওহীদ হচ্ছে, ইবাদতকারীরা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করে সেই তাগুতকে অস্বীকার করা, তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা করার জন্য অন্যকে আহবান জানালো, সে মুলতঃ রাসুলকে (সঃ) এর নিয়ে আসা জীবনাদর্শকে ত্যাগ করলো এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করলো। সাথে সাথে রাসুল (সঃ) কর্তৃক আনীত সেই নির্দেশের বিরোধীতা করলো যা আল্লাহ তায়ালা নিম্মোক্ত আয়াতে দিয়েছেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

www.pathagar.com

"অতএব আপনার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পারবেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালার ব্যাপারে আপনাকে ন্যায় বিচারক মানে। অতঃপর আপনি যা ফয়সালা করবেন সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র সংকোচ থাকবে না। বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্নরূপে সমর্পন করবে।"

(আন-নিসা ঃ ৬৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের ঈমানের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন, উক্ত আয়াতে يزعمون (তারা দাবী করে) এ কথা দ্বারা তাদের ঈমান অস্বীকার করা হয়েছে । কেননা يزعمون (তারা দাবী করে) এ কথটি অধিকন্তু এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে, যে এমন বিষয়ে দাবী পেশ করে, যে বিষয়ে সে মিথ্যাবাদী । وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ (অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য) এ বক্তব্যের দ্বারা উপরোক্ত কথাটির সত্যতা যাচাই হয়ে গেলো। কেননা তাগুতকে অস্বীকার করা তাওহীদের একটি রুকন (অপরিহার্য মৌলিক বিষয়)। এ রুকন বা মৌলিক বিষয়ে গন্ডগোল থাকলে বান্দা মুত্তয়াহহিদ (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী) হতে পারেনা। যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতে পারেনি, সে আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনতে পারেনি। আর তাওহীদই হচ্ছে ঈমানের মূল যার ওপর ভিত্তি করে আমল পরিশুদ্ধ হয়। তাওহীদ নষ্ট হলে আমলও নষ্ট হয়ে যায় ।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সেই শক্ত অবলম্বন কে আকড়ে ধরে।"

২৪। শাইখ আহমাদ শাকের (রহঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি এবং তাঁর ওপর নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে, অতঃপর يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ "তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায় অথচ তাকে (তাগুত) অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে" তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালার বিষয়টি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ফয়সালা দিয়েছেন যে, তারা হচ্ছে মুনাফিক। কেননা তাদেরকে যখন রাসূল (সঃ) এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে, তখন তারা প্রচন্ড ভাবে এর পথ রোধ করে দাড়িয়েছে। আর মুনাফিকী হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের কুফরী।

২৫। শাইখ হামূদ বিন আবদুল্লাহ আলুওয়াইরিজী (রহঃ) বলেনঃ এ সাদৃশ্যের কারণে বহু লোক দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই এ বিচ্যুতি তাদেরকে মুরতাদ বানিয়েছে এবং ইসলাম থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে বের করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

শরীয়াতে মুহাম্মাদীয়া (ইসলামের বিধান) কে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চাওয়া চরম গোমরাহী এবং জঘণ্য মোনাফিকী। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا (النساء ٢١-٢٠)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে। তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অমান্য করার জন্যই তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে গোমরাহ করে সত্যপথ থেকে বহুদূর নিয়ে যেতে চায় (অর্থাৎ চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়)। তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা অবতীর্ন করেছেন, তার প্রতি এবং রাসূল (সঃ) এর প্রতি চলে এসো, তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা সম্পূর্ণভাবে আপনার কাছ থেকে সরে গিয়েছে।" (আন-নিসা ঃ ৬০-৬১)

তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আর আল্লাহর প্রতি কুফরী করার (বা আল্লাহকে অস্বীকার করা) বিষয়ে ইসলামের ইমামদের মতামত।

এ ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) যে ইজমা (সর্ব সম্মত) অভিমত উদ্ধৃত করেছেন তাই (বিষয়টি অনুধাবনের জন্য) যথেষ্ট। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে শরীয়তের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি ও প্রমাণাদির ভিত্তিতে যে সর্বসম্মত আভিমতের বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য হেদায়াত লাভে আগ্রহী ব্যক্তির পক্ষে এত টুকুই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

৩য় অধ্যায়

আল-ইয়াসেক তাতারীর সাথে পূর্বসূরীদের আচরণ

হাফেজ ইবনে কাছীর (রহঃ) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ "তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে?"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ঐ সব লোকদের নিন্দা বা দোষারোপ করেছেন, যারা সার্বিক কল্যাণময় সকল মন্দকে নিষেধকারী আল্লাহর বিধান থেকে বের হয়ে গিয়েছে এবং যারা আল্লাহ তায়ালার শরীয়তের কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই মানুষের মনগড়া মতবাদ, চিন্তা-ভাবনা ও পরিভাষার দিকে ফিরে যায়। ঠিক যেমনি ভাবে জাহিলিয়্যাতে নিমজ্জিত লোকেরা গোমরাহী ও মুর্খতাপূর্ণ আইন দ্বারা ফয়সালা করে থাকে, এ আইন ও বিধান তারা রচনা করে তাদের নিজস্ব মতামত ও কামনা বাসনার ভিত্তিতে। তাতারীরা ও তাদের রাজা চেঙ্গিস খাঁনের রাজনীতি প্রসূত বিধানের সাহায্যে বিচার-ফয়সালা করতো যা ইয়াসেক কর্তৃক প্রণীত হয়েছিলো। তাদের সংবিধান ছিলো মূলতঃ বিভিন্ন শরীয়ত (বিধান) যথাঃ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম মিল্লাত থেকে সংগৃহিত ও সংকলিত একটি আইন গ্রন্থ। এখানে এমন বহু আইন রয়েছে যা আইন প্রণেতার শুধু ব্যক্তিগত দৃষ্টি-ভঙ্গি এবং মনের কামনা-বাসনা থেকে জন্ম হয়েছে । পরবর্তিতে এ মনগড়া আইনই একটি অনুসৃত বিধান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং এ আইনকেই কুরআন ও সুন্নাহর উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এমনটি করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের ।

তিনি আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াতে (১৩-১২৮) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ (সঃ) এর ওপর নাযিলকৃত মহান শরীয়ত (বিধান) কে পরিত্যাগ করবে, আর রহিত বা বাতিলকৃত শরীয়তের ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা চাইবে সে কুফরী করে। তাহলে যে ব্যক্তি ইয়াসার (মানব রচিত বিধান) কাছে বিচার-ফয়সালা চায় এবং একে আল্লাহর বিধানের ওপরে স্থান দেয় তার পরিনতি কি হতে পারে? এ রকম যে করলো সে মুসলমানদের (ওলামায়ে কেরামের) সর্ব সম্মত রায়ে কুফরী করলো।

এ হচ্ছে ইবনে কাছীর (রহঃ) এর কথা। মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চায় সে কাফের। এ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পূর্বসূরীগণ ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কায়্যিম এবং ইবনে কাছীর (রহঃ) উপরে বর্ণিত তাতারীদের কুফরী ও তাগুতী বিধানের মৃত্যু ঘটিয়ে ছিলেন। এর ফলে তারা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চায়নি, তারা মানব রচিত বিধান পড়েনি, তা শিক্ষা গ্রহন করেনি, তা তারা কার্যকর করেনি, তার সাথে তারা সম্পর্ক রাখেনি। বরং যে ব্যক্তিই মানব রচিত বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চেয়েছে তার সাথে তারা কুফরী করেছে (অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করেছে) ঐ যুগে মুসলমানরা কুফরী বিধানের সাথে এ আচরণ করেছে। সে যুগে মুসলমানরা যা করেছে তা যদি বর্তমান সময়ের লোকেরা করতো, তাহলো বর্তমান যমানার এ দূরাবস্থা হতোনা। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। যে ব্যক্তি হেদায়াত পেতে চায় তার জন্য এতটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালাকে যে বৈধ মনে করে তার সংশয়

প্রথম সংশয় ঃ এটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ সংশয় । আর তা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির কথা, যে বলে যে, এ কাজটি তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া নয়। বরং এটা হচ্ছে যে অধিকার খুব শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে, তার জন্য যাওয়া এবং চাওয়া।

জবাব ঃ আমরা বলতে চাই যে, মানুষ কখনো এমন কথা বলে, যা বিবেক সম্মত (বা যথার্থ) নয়। যদি এ কথা সমূদ্রের পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা মিশ্রিত হয়ে যায়। এ ধরনের কথা রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যা তিরমিজি ও আবু দাউদেও এসেছে। এধরণের কথা মূলতঃ আল্লাহর দ্বীনের সাথে, এবং আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ জিনিসের সাথে বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাতো সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরই জানা যে, নামের পরিবর্তনের কারনে কোন জিনিসের হাকিকত বা আসল নষ্ট হয়ে যায়না। আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন বলেন ঃ যে ব্যক্তি যে কোনো ধরনের ইবাদত গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলো সে মূলত ঃ ঐ গাইরুল্লাহরই ইবাদত করলো, তাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলো এবং আল্লাহর সাথে তার খাস অধিকারের ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহকে শরীক করলো, যদিও সে উলুহিয়্যাত, ইবাদত এবং শিরকের দিক থেকে তার কাজের নামকরণ থেকে দূরে ছিলো। জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন যে, জিনিসের হাকিকত (আসলরূপ) নাম পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়না । (মাজমুআতুত তাওহীদ আর রিসালাত আস সাবেয়াহ)

কোনো মুসলমানই এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেনা যে, বিচার-ফায়সালা চাওয়ার অর্থ হচ্ছে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য বিবাদপূর্ণ বিষয়টি যার কাছে মীমাংসিত হবে তার কাছে প্রত্যার্পন করা । এ বিষয়টি অন্তর দিয়ে সমাধা হয়না, এর জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাতে হয় (অর্থাৎ এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ, অন্তরের নয়)। অতএব যারা বলে যে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার বিষয়টিও যতক্ষণ পর্যন্ত তাগুতের নিকট বিচার-ফয়সালার জন্য যাওয়ার নিয়ত না করবে এবং তাগুতের বিধান আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী হবেনা, তাদের কথা আসলে ঐ ব্যক্তির মতোই যে বলে ঃ সেজদা করার কাজটি ততক্ষণ পর্যন্ত শেরেকী সেজদা হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেজদাকারী ব্যক্তি সেজদা গ্রহনকারী ব্যাক্তিকে সেজদার অধিকারী বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস না করবে। ইমাম ইবনে কায়্যিম এ ধরনের কথার জবাব দিয়েছেন। একথাটা ঠিক ঐ ব্যক্তির মতোই যে ব্যক্তি এ দাবী করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতকারী ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। তিনি বলেন ঃ পীরের উদ্দেশ্যে মুরীদের সেজদা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। সেজদাকারী এবং সেজদা

www.pathagar.com

গ্রহণকারী উভয়ের পক্ষ থেকেই এটা শিরক। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ এটা আসলে সেজদা নয়, এটা হচ্ছে পীরের সামনে তারই সম্মান রক্ষার্থে এবং বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মস্তক অবনত করা। তাদেরকে একথা বলা হচ্ছে যে, আপনারা যদিও এর নাম যা দেয়ার তাই দিয়েছেন। সেজদার হাকিকত বা মূলকথা হচ্ছে সেজদা গ্রহণকারীর সামনে মস্তক অবনত করা । (আল মুদারেজ৩৭৪/১)

অতঃপর আমরা বলতে চাই যে, রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা কারো কাছে সমস্যা বা প্রশ্ন হয়ে দাড়াতে পারে, আর তা হচ্ছে রাসূল (সঃ) মাতআম বিন আদীর (যে একজন মুশরিক ছিলো) আশ্রয়ে গিয়েছিলেন। (অর্থাৎ নবী হয়ে কি ভাবে তিনি একজন মুশরিকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন ?) এর জবাবে আমরা বলবো। যদি একজন মানুষ বিচার-ফয়সালা চাওয়ার অর্থ কি তা বুঝতে পারে তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন তার কাছে উদিত হতে পারতো না। ইতিপূর্বে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার যা অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে যার কাছে বিবাদের মীমাংসা হবে তার কাছে বিচার-ফায়সালার বিষয়টি প্রত্যার্পন করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا-

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে মীমাংসার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) দিকে প্রত্যার্পন করো, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও।"

(আন-নিসা ঃ ৫৯)

এটাই হচ্ছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার স্বরূপ । এর উদাহরণ হচ্ছে দু'জন লোকের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হওয়া এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদপূর্ণ বিষয়টিকে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য উভয়েই মীমাংসাকারীর কাছে যাওয়া। যদি এ বিচার প্রার্থনা তাগুতের কাছে হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা কুফরী এবং বড় ধরণের শিরক। আর কোনো কাফেরের কাছে [আদর্শকে জলাঞ্জলী না দিয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজনে] আশ্রয় চাওয়া হারাম, এর কোনো দলীল বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ধরণের আশ্রয় হযরত আবু বকর (রাঃ) ইবনুদ্দাগনার কাছে চেয়েছিলেন এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের মুশরিকদের জুলুম ও নির্যাতনের ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম খৃষ্টান রাজা নাজ্জাসীর আশ্রয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের কাছে যারা হিলফুল ফুজুলের ঘটনাকে (যা জাহেলী যুগে ইবনুজুদআনের সংঘঠিত হয়েছিলো) তাগুতী বিচারালয়ের কাছে যাওয়া এবং তাগুতী বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করার ক্ষেত্রে তাদের ভুলটা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিয়মান হচ্ছে। এ ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার যুক্তিটি সম্পূর্নরূপে ভুল। কেননা হিলফুল ফুজুলের লোকজন [ধারক বাহকেরা] কাহান জুহাইনা এবং কাআববিন আশরাফের মতো তাগুত ছিলোনা। কাআব বিন আশরাফ ও তার সংগীরা

www.pathagar.com

তাগুতী বিধানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতো। হিলফুল ফুজুলের লোকেরা ছিলো এমন মুশরিক যারা শুধুমাত্র মাজলুম ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য সমবেত হয়েছিলো। এটা একটি প্রশংসনীয় কাজ, এ ধরণের কাজের প্রতি ইসলাম মানুষকে উৎসাহিত করে।

আপনারা যারা এ ঘটনা থেকে প্রমাণ পেশ করতে চান, তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, আল্লাহর নবীর (সঃ) উপরোক্ত কথা কি কা'আব বিন আশরাফ ও কাহান জুহাইনার এবং অন্যান্য তাগুতদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলতে চান? যাদের কাছে জাহেলী যুগের লোকেরা বিচার-ফয়সালা নিয়ে যেতো? আপনারা যদি বলেন,না, আমরা একথা বলতে চাইনা। তাহলে আমরা বলবো ঃ কেন? এর উত্তরে আপনারা যদি বলেন ঃ কারণ তারা ন্যায় বিচার করতোনা, মাজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দিতো না, তদুপরি তারা ঘুষ গ্রহণ করতো। তখন আমরা বলবোঃ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য এবং তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা না চাওয়ার জন্য যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দেয়ার সময় কি এ কথা বলেছিলেন যে তারা ন্যায় বিচার করেনা, এবং তারা ঘুষ গ্রহণ করে? নাকি কারণ হিসেবে এ কথা বলেছিলেন যে তারা হচ্ছে তাগুত, তাদেরকে অস্বীকার করা ছাড়া আর তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া পরিত্যাগ করা ছাড়া কোন ব্যক্তির ইসলাম শুদ্ধ হবে না? **এটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন।**

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা বলেছেন ঃ আমরা তো ঐ সব ব্যাপারেই তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাই, যে ব্যাপারে তারা ন্যায় বিচার করবে। জুলুমের ব্যাপার হলে আমরা বিচার চাইনা। আমরা বলবো ঃ এ পাথর্ক্যের কি প্রমাণ আপনাদের কাছে আছে? তাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাইতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং এটাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের (তাগুতের) কাছে বিচার নিয়ে গেলো সে তাদেরকে (তাগুতকে) অস্বীকার করে না। এখানে আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যক্তি ন্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাগুতের কাছে বিচার চাইলো আর কোনো ব্যক্তি অন্যায়ের ব্যাপারে বিচার চাইলো, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। যে ব্যক্তি হিলফুলফুজুলের ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে, তার দলীল শুদ্ধ ও যথার্থ নয়। কেননা হিলফুলফুজুলের লোকজন তাগুত ছিলোনা। তারা তাগুতী বিধানে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালাও করেনি । তারা ছিলো কতিপয় মুশরিক ব্যক্তি যারা শুধুমাত্র মাজলুমের সাহায্যার্থে সমবেত হয়েছিলো। এখানে আমাদেরকে অবশ্যই ঐ দু'ব্যক্তির মাঝে পাথর্ক্য করার মতো জ্ঞান থাকতে হবে, যে ব্যক্তি মর্যাদাবান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে যারা তাগুত নয় মাজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সাহায্য চাওয়ার জন্য গিয়েছে, আর যে ব্যক্তি ঐ সব তাগুতী বিচারকদের কাছে-যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতী বিধান মোতাবেক মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করে, বিচার নিয়ে যায়। এর ফলে তাদের কাছে লোকেরা বিচার নিয়ে যায়, অতঃপর তাগুতী বিধানে তাদের বিবাদ মীমাংসা হয়। এ ধরনের কাজ কুফরী । একমাত্র জবরদস্তী মূলক অবস্থা ব্যতীত এ কাজ জায়েয নয়। আর জবরদস্তীর শিকার হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তির জীবন নিশ্চিত ভাবে হত্যা, জুলুম নির্যাতন জীবনের বিরাট ক্ষতির আশংকায় পতিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ-

"যে ব্যক্তির ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয়।" (নাহল ঃ ১০৬)

অতএব একজন মুসলমানকে এ ব্যাপারে শর্তক হতে হবে। তাড়াহুড়া করলে হবেনা, তাহলে বুঝের মধ্যে ত্রুটি থাকবে, ফলে তাকে অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলতে হবে, আর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হতে হবে । তখন দুঃখ করলেও কোনো উপকার হবে না ।

দ্বিতীয় সংশয় ঃ ঐ সব লোকদের কথা যারা বলে ঃ যাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তারাতো তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায়, এর কারণ হচ্ছে, তারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের (সঃ) ফয়সালায় সন্তুষ্ট ছিলো না, আর আমরা তো তাদের মতো নই। আমরা বিচার তাগুতের কাছে নিয়ে গেলেও আমরা তা চাইনা।

বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়ঃ

১। আল্লাহ তায়ালা যখন বলেছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ-

"তারা বিচার-ফয়সালার বিষয়কে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়।" তখন আল্লাহ তায়ালা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা কারীকে তাদের বলার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকে শর্ত করেননি। বরং যারা উপরোক্ত কথা বলে তারাই ইচ্ছাকে শর্ত বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যখন (তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়) বলেছেন তখন দু'ব্যক্তি অর্থাৎ ইহুদী এবং মোনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করছিলেন। তারা কা'ব বিন আশরাফ তথা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু ইহুদী কা'ব বিন আশরাফের কাছে যেতে অস্বীকার করেছিলো এ জন্য যে, সে জানতো, সে কাব বিন আশরাফ ঘুষ খায়। অতঃপর তারা উভয়ই নবীর (সঃ) কাছে গিয়ে বিচার চাইলো। মূলকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা যখন يُرِيْدُوْنَ (তারা চায়) বলেছেন তখন এর দ্বারা তিনি ইহুদী ও মুনাফিকের চারিত্রিক অবস্থার কথা বলেছেন। এখানে ইচ্ছাকে কুফরীর জন্য শর্ত করা হয়নি। অবস্থাটা ঠিক কারো উদ্দেশ্যে যদি বলা হয়, লোকটি এমন এমন করেছে অথচ তার ইচ্ছা ছিলো এমন করার, অতএব ইচ্ছা করে কথাটা যদি এ ধরনের বাক্যে বলা হয় তার দ্বারা তখন অবস্থা বুঝানো হয়।

২। তারা বলেছে যে, তারা তাগুতের কাছে বিচারের জন্য যায়, কিন্তু এমন কাজ করতে তাদের ইচ্ছা নেই। তাদের এ কথা নিঃসন্দেহে অশুদ্ধ বা ঠিক নয়। কেননা, এমন কোনো মানুষ নেই যে, সে কোনো না কোন কাজ করবে অথচ কাজের ইচ্ছা করবেনা । এটা হতে পারেনা। কেননা ক্রিয়া কখনো ইচ্ছার সম্পৃক্তি ছাড়া সংঘটিত হয়না। তবে ইচ্ছার বিষয়টা ভিন্ন। কেননা ইচ্ছার সাথে কাজ বা ক্রিয়া কখনো সম্পৃক্ত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।সম্ভবতঃ তারা তাদের কথার দ্বারা এ কথা

www.pathagar.com

বুঝাতে চায় এবং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায় বটে কিন্তু তারা এরকম হোক তা চায়না অর্থাৎ শিরকী এবং কুফরী তারা চায়না এবং তাদের উদ্দেশ্যও এটা নয়। তাদের কথা অনুযায়ী যদি এটাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কথা। এর জবাবে আল্লাহ চাহে তো সামনে ৬ নম্বরে বিবরণ আসছে।

৩। ইমাম আবুস সুউদ (রহঃ)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ-

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন ঃ এখানে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাকেই খারাপ এবং বিস্ময়কর বলা হয়েছে, বিচারের ফয়সালাকে নয়; এ বিষয়ে শতর্ক করে দেয়ার জন্য যে ইচ্ছেটাই হচ্ছে, তা যে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে তারই অংশ। তাই ইচ্ছাই না হওয়া উচিৎ। তাহলে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কি ধারনা ? (অর্থাৎ যে কাজের ইচ্ছা করাই অন্যায়, তার মূল কাজটা কত বড় অন্যায় তা ভেবে দেখতে বলা হয়েছে)

তাহলে প্রিয় পাঠক, তাঁর (ইমাম আবুস সুউদ এর) কথা ভেবে দেখুন । তিনি বলেছেন ঃ তাহলে মূল বিষয় অর্থাৎ "তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া" এর ব্যাপারে তোমার কি ধারনা।

৪। উম্মতে মুসলিমা এ ব্যাপারে একমত যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই হতে হবে। যদি তা গাইরুল্লাহর জন্য হয়, তাহলে ইবাদতকারী এমন জঘণ্য মুশরিক (শিরককারী) হিসেবে গণ্য হবে যা তাকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের করে দিবে, চাই সে (শিরক করার) ইচ্ছা করুক বা নাই করুক, চাই এতে সে রাজী থাকুক বা নাই থাকুক। তবে যদি কেউ বাধ্য হয়ে উক্ত কাজ করে তাহলে তার ব্যাপার আলাদা।

৫। এ কথা 'অসপষ্টতা' (মুশাবাহাত) এর দৃষ্টি কোন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, আর সুস্পষ্টতার দৃষ্টি ভঙ্গি যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন পরিত্যাগ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ "অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করার জন্য।"

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ "তোমরা তাগুত থেকে দূরে থাকো।"

আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল– শাইখ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য)। তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া ঈমানের বিপরীত ও পরিপন্থী কাজ। তাই তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত ঈমান শুদ্ধ হবে না । এমনি ভাবে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া বাদ

www.pathagar.com

দিতে হবে। যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতে পারবেনা সে মুমিন আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনতে পারবেনা। আমরা যখন মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতের মর্ম জানতে পারলাম তখন মুতাশাবিহকে (অস্পষ্ট থাকে) মুহাকামের দিকেই প্রত্যার্পন করবো। ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব কুফরীর صفات বা প্রকৃতি ও ধরণের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে তাগুতকে অস্বীকারের প্রকৃতি হচ্ছে যে গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল এ বিশ্বাস থাকতে হবে। তা পরিত্যাগ করতে হবে, গাইরুল্লাহর ইবাদতকে ঘৃনা করতে হবে। গাইরুল্লাহর ইবাদতকারীদেরকে কাফের বলে গণ্য করতে হবে এবং তাদের বিরোধীতা করতে হবে। (তাইসীরুল আজীজিল হামীদ ফি বায়ান তাওহীদ)

মানুষ যদি গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল বলে বিশ্বাস করলো, অথচ তা ত্যাগ করতে পারলো না, তাহলে সে তাগুতকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে না আর যদি গাইরুল্লাহর ইবাদতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করলো এবং তা পরিত্যাগ করলো, কিন্তু সে গাইরুল্লাহর ইবাদতকে সে মুহাব্বত করে , এবং এর প্রতি তার কোনো ক্রোধ নেই, ক্ষোভ নেই, তাহলেও সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা।

৬। ইচ্ছা দ্বারা আপনারা যদি নিয়ত বুঝিয়ে থাকেন, আর কাজ বাদ দিয়ে কথা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে এটা তো তাদের মতোই হলো, যারা কবর পূজা করে , কবর প্রদক্ষিণ করে (তাওয়াফ করে) অথচ মূখে বলে ঃ হা , আমরা কবরের চারদিকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করি এবং আমরা তাদের জন্য এ কাজ (ইবাদত)ও করি, তবে আমরা শিরক কখনোই চাইনা। তাওহীদে বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষই জানেন যে তাদের কথা সম্পূর্ণ রূপে বাতিল।

শাইখূল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন ঃ

মোদ্দাকথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এমন কথা বললো বা এমন করলো যা কুফরী, সে কাফের হওয়ার ইচ্ছা না করলেও সে উক্ত কথা ও কর্মের দ্বারা কুফরী করলো । কারণ কেউ উদ্দেশ্য করে বা ইচ্ছা করে কুফরী করেনা। অর্থাৎ কাফের হওয়ার নিয়তে কেউ কুফরী করে না ইল্লা মাশা আল্লাহ । (আছারেমু আলমাছলুল ১৮৭-১৮৮পৃঃ)

ইমাম তাবারী (রহঃ)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ط اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا-

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই সে লোক, যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে অথচ তারা মনে করে যে তারা সঠিক কাজই করছে।" (কাহফ ঃ১০৩,১০৪)

এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন ঃ

যারা এ কথা দাবী করে যে, ওয়াহদানিয়্যাত (আল্লাহর একত্ববাদ) সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর কুফরীর উদ্দেশ্য ছাড়া কুফরী না করলে সেটা আল্লাহকে অস্বীকার করা হবেনা, তাদের এ দাবীও যে সমপূর্ণ ভুল অত্র

www.pathagar.com

আয়াতটি এর সবচেয়ে বড় দলীল। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঐসব লোকদের খবর দিয়েছেন এবং গুনাগুণ (খারাপ অর্থে) বর্ণনা করেছেন যাদের সকল পার্থিব চেষ্টা সাধনা গোমরাহীতে পর্যবসিত হয়েছে, অথচ তারা কাজ করার সময় মনে করতো যে তারা খুব ভাল কাজ করছে।

হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর গ্রন্থে বলেন ঃ এখানে একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়াই দ্বীন থেকে বের হয়ে যায় এবং ইসলামের ওপর অন্য কোনো দ্বীনকে প্রাধান্য দেয়া কিংবা বাছাই করা ছাড়াই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন ঃ এ কথার দিকে যাদের ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তাদের মধ্যে ইমাম তাবারীও রয়েছেন। তিনি তাঁর তাহজীর গ্রন্থে এতদসংক্রান্ত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ এ বক্তব্যে ঐ ব্যক্তির কথাকে খন্ডন করা হয়েছে যে বলে, আহলে কেবলার (কাবা ঘরের দিকে ফিরে যারা নামাজ পড়ে) কাউকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, যাবতীয় অবস্থা প্রাপ্তির পরও তাকে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার রায় দেয়া যাবেনা, যদি না সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সজ্ঞানে পোষণ করে। তারা হক কথা বলে, তারা কুরআন পড়ে, অথচ তারা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন, ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইবনে কুদামা তাঁর আল-কাফীতে বলেনঃ মুরতাদ বিষয়টি অধিকন্তু হয়ে থাকে এমন সন্দেহ ও সংশয়ের কারণে, যা মুরতাদের কাছে প্রতিভাত হয়। (আল কাফি ইবনে কুদামা)

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন ঃ ইচ্ছা ও মনোনিবেশের সাথে আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য, প্রয়োজন পূরণের জন্য, দুঃখ ও বেদনায় সাহায্য করার জন্য তারা এ কাজ করে, ঠিক একাজটাই আরবের মুশরিকেরা রাসুল (সঃ) এর নবুয়ত লাভের পূর্বে করতো? না কি করতো না ?

চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো, সে কি মুমিন মুসলিম? তাকে কি কাফের বলা যাবে? এ কাজ দ্বারা তার আমল কি বরবাদ হয়ে যাবে, নাকি বরবাদ হবে না, যদি প্রথম বিষয়টি তোমার কাছে জটিল মনে হয়, তাহলে কবরে প্রশ্নকারী দু'ফেরেস্তার প্রশ্নের প্রতি এবং এর প্রতিউত্তরে তার (মৃত ব্যক্তির) কথা হায়! হায়!! আমি কিছুই জানি না, লোকেরা দুনিয়াতে যা বলতো আমি তাদের মতোই বলতাম " এর প্রতি তুমি দৃষ্টি দাও। আর যদি দ্বিতীয় বিষয়টি তুমি গ্রহণ করো (অর্থাৎ শিরকী ও কুফরী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে যদি কাফের বলো, তার আমল বাতিল বলে মনে করো) তাহলে তোমার এ সিদ্ধান্তে অটল থাকা উচিৎ। আর যদি তৃতীয় মত হিসেবে তুমি এ কথা বলো যে, এ উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য রকম উদ্দেশ্য। তাহলে তোমাকে দু' উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা কুরআন অথবা সুন্নাহ অথবা ইজমা (সর্ব সম্মত রায়) ইত্যাদি দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। চতুর্থ মত হিসেবে যদি তুমি বলতে চাও যে, সে যাই করুক না কেনো ইসলাম তাকে কুফরী থেকে হেফাজত করেছে তাহলে ভাল করে মুরতাদের হুকুম সংক্রান্ত বিষয় পড়াশুনা করে নিও। (মাজমুআতুল ফাতওয়া ওয়াররাসায়েলে ওয়াল আজওইবা লিল ইমাম আবদুল ওহাব পৃঃ ৮৮)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ আর রিসালা অছছুন্নিয়াতে শাইখ বলেছেন ঃ যখন খাওয়ারেজদের [ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া একটি গোমরাহ দল] সম্পর্কে এবং তাদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে এবং রাসুল (সঃ) এর পক্ষ থেকে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ সম্পর্কে বলা হলো, তখন তিনি বলেন ঃ রাসুল (সঃ) এবং তাঁর খলীফাগণের যমানায় যদি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোক থাকে যে, মর্যাদাকর ইবাদত সত্বেও ইসলামের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে' যার ফলে রাসুল (সঃ) তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন; তাহলে এটা তো অবশ্যই জানা গেলো যে, বর্তমান যমানায় ইসলাম ও সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত থেকেও ইসলাম থেকে কেউ বের হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। (তারিখে নজদ ৩৬৭পৃঃ)

ইমাম সানআনী (রহঃ) তাঁর তাতহীরুল "ই'তিকাদ আন আদরানিশ শিরক ওয়াল ইলহাদ" নামক পুস্তিকায় বলেনঃ তুমি যদি বলো, তারা মূর্খ, তাদের কর্মে তারা মুশরিক। আমি বলবো, সমস্ত ফিকাহর কিতাবে ফকীহগণ মুরতাদ হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে একথা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলবে , কথা তার উদ্দেশ্য না হলেও সে কাফের বলে গণ্য হবে। একথা এটারই প্রমাণ পেশ করে যে, তারা ইসলামের হাকীকত [আসল কথা] এবং তাওহীদের মর্মকথা সম্পর্কে জানে না। এতদসত্ত্বেও তারা মৌলিক দিক থেকে কাফের। (মাজমুআতুল ফাতওয়া ওয়াররাসায়েলে ওয়াল আজওইবা পৃঃ ৮৮)

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলার বিষয়ে ভুল পথ অবলম্বন করেছেন। এর ফলে তারা মনে করেন, যে ব্যক্তি বড় বা জঘণ্য শিরকের কাজ করে, ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং তারা ইসলাম থেকেও খারিজ হবে না। তারা কতিপয় বিষয়কে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যেমন খলীফা মামুনের ঘটনা। [ব্যাখ্যা সাপেক্ষে তিনি খালকে কুরআনের পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থ্যাৎ কুরআনকে খলীফা মামুন আল্লাহর সৃষ্টি বলে স্বীকার করতেন অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ওলামায়ে কেরাম কুরআনকে আল্লাহর মাখলুক বা সৃষ্টি বলে স্বীকার করেন না।] এমতাবস্থায় ইমাম, আহমাদ বিন হাম্মল তাকে কাফের বলে আখ্যা দেননি। নিঃসন্দেহে এটা একটা জঘণ্য রকমের ভূল। কেননা শিরক এবং কুফরে জলী, (অর্থাৎ সুস্পষ্ট বড় ধরনের প্রকাশ্য কুফরীর মধ্যে) যেমন ইবাদতের মধ্যে শিরক করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সঃ) নিয়ে উপহাস করা ইত্যাদি এবং কুফরে খফী বা গোপনীয় কুফরী, অপ্রকাশ্য কুফরী যেমন কুফরী খফী সংক্রান্ত কথা বা প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে পাথর্ক্য রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা কতিপয় সিফাতের বা গুণ বাচক নামের ব্যাখ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত যা কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে সুপ্ত বা অস্পষ্ট রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার কালাম বা কথা সংক্রান্ত সিফাত বা গুণ। এ বর্ণনার প্রতি যাদের ঝোঁক বা সমর্থন রয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব। এটা লক্ষ্য করা যায় শাইখ হুসাইন বিন গানামের নজদের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে সংরক্ষিত কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) যে মত গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছেন তা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে ইবাদতের মধ্যে শিরক এবং অপ্রকাশ্য কুফরী সংক্রান্ত কথার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতীন এবং শাইখ ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ হুকমু তাকফীবিল মুআইয়্যান নামক পুস্তিকায় - এর বিষদ বর্ণনা দিয়েছেন। এ ছাড়া বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও এর বর্ণনা দিয়েছেন।

<u>তৃতীয় সন্দেহ ও সংশয় ঃ</u> ঐ ব্যক্তির কথাই হচ্ছে তৃতীয় সংশয় যে বলে, বিচার ফয়সালা [তাগুতের কাছে] চাওয়া শিরক হলেও তা শিরকে আসগার [ছোট শিরক] বড় শিরক বা শিরকে আকবরের পর্যায়ে তা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নীত হবে না যতক্ষণ না এটাকে মনে করা এবং আক্বীদার বিষয় সাথে সংযুক্ত হয়। যেমন গাইরুল্লাহর নামে কসম করা।

প্রথম জবাব ঃ আমরা বলবো এটা তো জানা কথা যে, যে সব ইবাদত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয় অর্থাৎ অন্য কারো জন্য নিবেদন করা যায় না। তার মধ্যে রয়েছে, রুকু করা, সেজদা করা, সাহায্য চাওয়া, পশু জবাই করা, মানত করা, তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করা, বিচার চাওয়া, ভয়, আশা, আকাংখা তাওবার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করা, মুহাব্বত করা, সম্মান করা ইত্যাদি ইবাদতগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে কিছু ইবাদতের সম্পর্ক আক্বীদার সাথে, কিছু ইবাদতের সম্পর্ক কথার সাথে এবং কিছু ইবাদতের সম্পর্ক হচ্ছে কর্মের সাথে। যে সব ইবাদতের সম্পর্ক কথা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত যেমন দোয়া করা, সাহায্য চাওয়া, রুকু করা, সেজদা করা, পশু জবাই করা, মানত করা, তাওয়াফ করা, বিচার চাওয়া ইত্যাদি এ সব ইবাদতের কোনো একটিকেও যদি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে যেমন ঃ প্রতিমা অথবা, মৃত ব্যক্তি, অথবা তাগুত, তাহলে এর দ্বারা সে কাফের হবে এবং শিরকে আকবারে পতিত হবে। এ ক্ষেত্রে তার আক্বীদা এবং হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে জরুরী নয়। কারণ সে প্রকাশ্যেই তার ইবাদতকে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছে।

আর গোপন বা বাতেনী ইবাদত যা আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত যেমন ভয়, আশা, ভালবাসা ভক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইবাদতকারীর প্রতি কুফরী আরোপ করার জন্য তার ইবাদতকে মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে বা কথার মাধ্যমে তার আক্বীদা বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা জরুরী। কেননা, এ জাতীয় ইবাদত অন্তরে সুপ্ত। অতএব কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কুফরী কর্ম পাওয়া গেলে তার প্রতি কুফরী আরোপ করার জন্য তার আক্বীদা বিশ্বাস প্রকাশ করা জরুরী বলে মনে করে, সে মূলতঃ একটি বাতিল যুক্তি প্রদর্শন করেছে। এটা হয়েছে তাওহীদের অর্থ এবং ইবাদতের অর্থ সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণে। এর ফলে বিচার চাওয়ার বিষয়কে যা ইবাদত হিসেবে গণ্য গাইরুল্লাহর নামে কসম করার সাথে একীভূত করেছে, যা ইবাদত নয় বরং শিরকী শব্দ হিসেবে গণ্য।

কেউ হয়তো বলতে পারে , তাহলে আল্লাহর নামে কসম করাকে ওলামায়ে কেরাম কেন ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেন? এর জবাবে আমরা বলবো, কেননা আল্লাহর নামে কসম করার সাথে আল্লাহকে তাজীম

www.pathagar.com

ও সম্মান করার মতো ইবাদতের বিষয় এর সাথে সংযুক্ত আছে। আল্লাহর নামে কসমকারী ব্যক্তি কসম করার সময় সে একথা জানে যে, আল্লাহ হচ্ছেন মহান। তাঁর নামে কসমের হকদার একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর নামে সে কসম করে। এখন এ কসম করার আমলটি ইবাদত হিসেবে গণ্য। কেননা এর সাথে তা'জীম (আল্লাহর সম্মান) সংযুক্ত হয়েছে। এ জন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেনঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করলো সে ছোট শিরকের মধ্যে পতিত হলো। এ কসম তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বের করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে একথা বিশ্বাস না করে যে, যার নামে কসম করা হলো সে কসমের হকদার। তাকে কাফের বলার জন্য যার নামে কসম করা হলো, তার প্রতি সম্মান জাহির বা প্রকাশ করার শর্তারোপ করেছেন ওলামায়ে কেরাম। এর অর্থ হচ্ছে, গাইরুল্লাহর নামে তা'জীম বা সম্মান করার সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত নিবেদন করলো। এ ইবাদত গোপনীয় এবং অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যদি কোনো ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করে এবং যার নামে কসম করা হলো তার উদ্দেশ্যে তা'জীম বা সম্মান দেখায় তাহলে সে ব্যক্তি উলুহিয়্যাতের দিক থেকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, তাই সে মুশরিক। তাহলে তাঁর মুশরিক হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে ইবাদতকে প্রকাশ করেছে। তাই আমরা তাকে একথা জিজ্ঞেস করবো না যে তুমি কি এটা বিশ্বাস করো, না কি বিশ্বাস কর না। তাই তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া, সেজদা এবং তাওয়াফের মতোই প্রকাশ্য ইবাদত। এ ইবাদতকে যে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্য নিবেদন করে সে কাফের। এটা ইবাদতে কালবিয়া খাফিয়া (অর্থাৎ অন্তরের গোপনীয় ইবাদত নয়) যা মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

<u>দ্বিতীয় জবাব</u> ঃ এ কথা তো সবারই জানা যে, গাইরুল্লাহর নামে কসম করার বিষয়টি প্রাক ইসলামী যুগে নিষিদ্ধ ছিলোনা। এর পর গাইরুল্লাহর নামে কসম খাওয়ার বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যর মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) পরবর্তিতে গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করা নিষিদ্ধ করেছেন (বুখারী)। অতএব যে বিষয়টি প্রাক ইসলামী যুগে আদৌ নিষিদ্ধ ছিলোনা সেটাকে কি ভাবে বা কোন যুক্তিতে এমন বিষয়ের ওপর কেয়াস করা হয়, যা ছাড়া বান্দার ইসলামই ছহীহ শুদ্ধ হয়না। আর তা হচ্ছে সকল তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) বিধান ব্যতীত সকল বিধান অস্বীকার করা। আর সেটা করতে হবে তাগুতের কাছে বিচার না চাওয়ার মাধ্যমে।

অতঃপর আমরা আরো বলতে চাই যে, এ বাতিল 'কিয়াস' যে বিষয়টিকে অপরিহার্য করে তোলে তা হচ্ছে, যে আয়াতে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে সে আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদের জন্য গণক, আহলে কিতাব এবং তাদের তাগুতদের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়া জায়েয ছিলো। কেননা তাদের দাবী অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা চাওয়ার বিষয়টি কসম করার মতোই একটি কাজ (অর্থাৎ উভয় কাজই একই মানের তাই গাইরুল্লাহর নামে কসম করলে যেমন কাফের হয়না তেমনি তাগুতের কাছে বিচার চাইলে ও কাফের হবেনা) ।

www.pathagar.com

৪র্থ সংশয়ঃ কতিপয় লোক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর নিম্মোক্ত কথাকে (ভুল বুঝে) দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। তিনি তাঁর মাজমুআতুল ফাতাওয়া নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ সব লোক (ইহুদী ও খৃষ্টান) বা তাদের ধর্মীয় গুরুদেরকে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে দুভাবে তাদের আনুগত্য করেছে।

প্রথমত ঃ তারা (ধর্মীয় গুরুরা) আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, এ পরিবর্তনের কথা জেনে শুনেই তারা (ইহুদী খৃষ্টানরা) তাদের আনুগত্য করতো। তাই তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহর হারামকৃত বিষয় হালাল করা আর আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ক্ষমতা বা অধিকার তাদের নেতাদের রয়েছে। তারা এটাও জানতো যে তারা রাসূলের (সঃ) দ্বীনের বিরোধিতা করছে। এ রকম করা কুফরী।

দ্বিতীয়ত ঃ তাদের (অনুসারীদের) এ বিশ্বাস ও ঈমান আছে যে, তাদের ধর্মীয় গুরুদের হালাল কে হারাম করা, আর হারামকে হালাল করার বিষয়টি (সম্পূর্ণরূপে অবৈধ কাজ এ কথা) ঠিক আছে তবে তারা তাদের ধর্মীয় গুরুদের আনুগত্য করেছে আল্লাহর নাফরমানীর ক্ষেত্রে, যেমন একজন মুসলমান পাপকে পাপ জেনেই করে থাকে । এসব লোক তাদের মতোই পাপী ।

প্রথম জবাবঃ আমরা বলতে চাই যে, যারা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রহঃ) কথা (তাদের সংশয়ের) দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বিষয়টি বুঝতে পারেনি এবং শেরেকী আনুগত্য ও পাপ জনিত আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে তারা সক্ষম হয়নি । পাপ জনিত আনুগত্য হচ্ছে কোনো মানুষ কোনো পাপ কাজে সৃষ্টির, আনুগত্য এ বিশ্বাস নিয়ে করবে, যে এটি গুনাহ এবং হারাম কাজ । এ ধরনের আনুগত্যই পাপ জনিত আনুগত্য হিসেবে গণ্য। এ ধরনের আনুগত্য মুসলিম মিল্লাত থেকে আনুগত্যকারীকে বের করে দেয়না ।(ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়না) যতক্ষণ এর সাথে গুনাহকে হালাল মনে করার আক্বীদা সংযুক্ত হবে। আর শেরেকী আনুগত্য হচ্ছে কোনো মানুষ কোনো শেরেকীকাজ সৃষ্টির আনুগত্য করা যেমন ঃ তাকে (মানুষকে) বলা হলো তুমি মূর্তিটিকে সেজদা করো, অতঃপর সে সেজদা করলো। অথবা বলা হলো জ্বিনের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করো, সে তখন জবাই করলো। অথবা তাকে বলা হলো ঃ যাও আল্লাহর বিধান ও শরীয়ত বাদ দিয়ে বিচার চাও, সে এভাবে বিচার চাইলো। এটাই হচ্ছে শেরেকী আনুগত্য। এ ধরনের আনুগত্যকারী আল্লাহর সাথে শিরককারী বা মুশরিক, যদি সে এধরনের আনুগত্য ও পাপকে হালাল মনে নাও করে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া সে বিষয়টি তাঁর কথায় বুঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, এটা পাপ জনিত আনুগত্য শেরেকী আনুগত্য নয়। এটা হচ্ছে প্রথম জবাব।

দ্বিতীয় জবাবঃ আনুগত্য এবং বিচার-ফয়সালা চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । আনুগত্য কখনো পাপ জনিত হতে পারে, আবার কখনো শেরেকী আনুগত্যও হতে পারে। একথা আমরা প্রথম জবাবেই বর্ণনা করেছি। বিচার-ফয়সালা চাওয়ার কাজটি মানত এবং তাওয়াফের মতোই নিরেট ইবাদত হিসেবে গণ্য। তাই এসব ইবাদত গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

নিবেদন করলে ইবাদতকারী আল্লাহর সাথে শিরককারী বা মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হবে। ওলামায়ে কেরাম তাদের বই-পুস্তকে এ কথাই বর্ণনা করেছেন। শাইখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রাহমান বিন হাসান আল-শাইখ বলেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সঃ) সুন্নাতকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা চাইবে সে কাফের। (আদ দুরার আস সুন্নিয়া ৪৭৬/১০)

৫ম সংশয় ঃ ৫ম সংশয় হচ্ছে ঐ বক্তির কথা, যে বলে ঃ যে আইনের কাছে বিচার চাওয়া হবে তা যদি আল্লাহর আইনের বিরোধী হয় তাহলে ঐ আইনের কাছে বিচারফয়সালা নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। আর যদি ঐ আইন আল্লাহর আইনের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয় যেমন সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য ইনসাফপূর্ণ আইন, তাহলে ঐ আইনের কাছে বিচার চাওয়া জায়েয আছে। নিঃসন্দেহে এ কথাটিও দুটি দৃষ্টি কোন থেকে বাতিল।

প্রথমত ঃ আমরা আইন বা বিধানের দিকে দৃষ্টিপাত করবোনা। আমরা দেখবোনা, আইনটি কি ন্যায় সঙ্গত, নাকি জুলুমপূর্ণ বরং আমরা দেখবো কর্ম এবং প্রত্যার্পনের বিষয়টি। মূল ঘটনা হচ্ছে ন্যায় বিচারটি প্রার্থনা করা হচ্ছে তাগুতের মাধ্যমে। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ-

"তারা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়"

এর দ্বারা ক'াব বিন আশরাফ (ইহুদী) কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তার কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া এবং বিবাদ মীমংসা করাকে কুফরী বলা হয়েছে। কুফরীর কারণ হিসেবে এখানে একথা বলা হয়নি যে, সে ন্যায় বিচার করেনা, সে ঘুষ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ আমরা বান্দার ব্যাপারে এটা দেখবোনা যে, তার প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে, নাকি অন্যায় করা হবে। বরং আমরা দেখবো মা'বূদ অর্থাৎ আল্লাহর তায়ালার ব্যাপার, অর্থাৎ তাগুতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, তাগুতের কাছে বিচার না নিয়ে তাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এবং তাগুত থেকে মানুষকে সতর্ক করে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ। আপনারা যেহেতু তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার মধ্যে প্রথম, সেহেতু আপনারা লোকদেরকে তাগুত থেকে কিভাবে সর্তক থাকতে বলবেন।

৬ষ্ঠ সংশয়ঃ ঐ ব্যক্তির কথা যে বলে ঃ শরীয়ত সম্মত এমন ব্যবস্থা নেই, যে আমার অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে তাই আমি বাধ্য হয়েই এমন কাজ করছি।

জবাব ঃ এ কথারও দুটি জবাব।

প্রথম বিষয়ঃ এই যে, যে ব্যক্তি উপরোক্ত কথা বলে, আমরা তাকে আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর মাধ্যমে শর্তক করতে চাই ঃ

www.pathagar.com

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

"এটা এজন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে হেদায়াত করেননা ।"

(নাহল ঃ ১০৭)

শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার 'কাশফুল শুবহাত' নামক পুস্তিকায় এ আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ এখানে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ কুফরী ও শাস্তির কারণ বিশ্বাস কিংবা অজ্ঞতা, কিংবা ধর্মের প্রতি আক্রোশ অথবা কুফরীর প্রতি মুহাব্বত ছিলোনা । বরং কারণ ছিলো দুনিয়ার স্বার্থ। দ্বীনের ওপর দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল ।

তাই আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি যে মুসলমানের ঈমান আছে তার জন্য দুনিয়ার কোনো স্বার্থকে দ্বীনের কোনো স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া জায়েয নেই । চাই সে স্বার্থ কোনো পদবী অথবা নেতৃত্ব চাওয়ার মাধ্যমেই হোক, অথবা দুনিয়া ও সম্পদ নষ্ট না হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে হোক । কেননা দ্বীন হেফাজতের বিষয়টি সম্পদ হেফাজতের ওপর অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে । রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

تعس عبد الدينار والدرهم و عبد الخميصة ان اعطى رضى وان لم يعط سخط (رواه البخارى)

"দিনার, দিরহাম এবং পেট পূজারী ধ্বংস হোক, যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তাহলে খুশী, আর কিছু না দিতে পারলে ক্রোধান্বিত হয় ।"

(বুখারী)

আল্লাহ তায়ালা সূরায়ে আত-তাওবাহ্তে ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ-

"আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, সে ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমরা করো, এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো- তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না ।" (আত তাওবাহ ২৪)

www.pathagar.com

লক্ষ্য করুন আল্লাহ তায়ালা কিভাবে ঐ সব পার্থিব উপকরণের নিন্দা করেছেন, যে গুলোর সাথে তারা সম্পৃক্ত হয়ে জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আয়াতে উল্লেখিত (পার্থিব) আটটি জিনিসের (ভালবাসার) কারণে যে ব্যক্তি তাওহীদ পরিত্যাগ করে সে কি বেশী অন্যায় করলো, না কি একই কারণে যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ করলো সে বেশী অন্যায় করলো? এ আটটি বিষয় কি আল্লাহ তায়ালা যখন জিহাদ পরিত্যাগ করার ওযর (অযুহাত) হিসেবে গ্রহণ করেন নি, তখন কিভাবে এ বিষয়গুলোকে তাওহীদ পরিত্যাগ করার ওযর হিসেবে গ্রহণ করবেন? কুফরী কথা উচ্চারণ করার জন্য একমাত্র জবরদস্তি ছাড়া অন্য কোনো ওযর আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেননি । আর জবরদস্তির বিষয়টি হচ্ছে এমন কর্ম সম্পাদন করা, যা বাধ্য হয়ে হযরত আম্মার বিন ইয়াসীর (রাঃ) করেছেন । (অর্থাৎ অত্যাধিক অমানুষিক নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য নিজের অন্তরকে ঠিক রেখে শুধু মৌখিক ভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করা) শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য এর অনুমতি দেয়া হয়েছে তবে এমতাবস্থায় আজিমত অর্থাৎ জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করার বিষয়টিকে অতি উত্তম কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে এ ব্যাপারে বক্তব্য এসেছে। শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ (রহঃ) হেজাজের আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন আহমাদ আল-হিফজী বলেন ঃ হে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, আপনারা শতর্ক হোন, শতর্কতা অবলম্বন করুণ। হে উদাসীন ব্যক্তিরা আপনাদের জন্য রয়েছে তাওবা আপনারা তাওবার পথ অবলম্বন করুন। কেননা দ্বীনের মূল বিষয়েই ফেতনা (পরীক্ষা) হয়েছে প্রাসংগিক বিষয়ের ফেতনা হয়নি, দুনিয়াবী বিষয়ও ফেতনা হয়নি। তাই অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে পরিবার পরিজন, স্ত্রী, সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাড়ী-ঘর সবকিছুই থাকবে শুধু দ্বীন রক্ষার স্বার্থে। এ গুলো উৎসর্গিত হবে দ্বীনের জন্য। এগুলোর হেফাজতের জন্য কখনো দ্বীন উৎসর্গিত হবেনা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ-

"আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, সে ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা তোমরা করো, এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো, তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তবে আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেফাজত করেন না।" (আত তাওবাহ ২৪)

www.pathagar.com

প্রজ্ঞা সম্পন্ন মস্তিষ্কে ভেবে দেখুন, দেখবেন যে, আল্লাহ তায়ালা' আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এবং জিহাদের মুহাব্বত উল্লেখিত আটটি বিষয়ের মুহাব্বতের চেয়ে অধিক হওয়া ওয়াজিব বা আপরিহার্য করেছেন । ইহা ছাড়া এগুলোর যে কোনো একটি কিংবা একাধিক এবং এ ছাড়া যা এর চেয়ে বেশী মুহাব্বতের হকদার তার চেয়েও বেশী মুহাব্বত হতে হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য। তাই তোমার কাছে দ্বীন হতে হবে সবচেয়ে মূল্যবান এবং মর্যদা সম্পন্ন। তোমার কাছে তাওবা হবে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ এ কথা যারা বলে তাদেরকে আমরা আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ-

"মানব এবং জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাইনা, এবং এটাও চাইনা যে তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। আল্লাহ তায়ালাই তো রিযিক দাতা, শক্তির আধার পরাক্রান্ত।" (আয-যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৮)

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বান্দা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে "ইবাদত"। এর সাথে এটাও বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يا ابن ادم تفرغ لعبادتى املأ صدرك غنى واسد فقرك وان لا تفعل ملأت يدك شغلا ولم اسد فقرك-

"হে আদম সন্তান, তুমি আমার ইবাদতে আত্ম নিয়োগ করো, আমি তোমার বক্ষকে মুখাপেক্ষীহীনতা দিয়ে ভরে দিবো এবং তোমার দারিদ্র বিমোচন করে দিবো। যদি তুমি তা না করো, তাহলে তোমার হাতকে কাজে ব্যস্ত রাখবো, অথচ তোমার দারিদ্র বিমোচন করবোনা।" (আহমাদ)

আর সে যে বলেছে যে, সে এ কাজ (তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া) বাধ্য হয়ে করেছে এ কথা ও দু'দিক থেকে বাতিল।

এক ঃ লোকটি দু'টি বিষয়কে মিশ্রিত করে ফেলেছে। সে অনন্যোপায় হওয়া আর জোর জবরদস্তীর শিকার হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে সক্ষম হয়নি। সে মানুষের জন্য ওযর বা অজুহাত তালাশ করেছে যখন কুফরী করার জন্য সে অনন্যোপায় হয়েছে। নিঃসন্দেহে তার এ যুক্তি বাতিল, কেননা অনন্যোপায় মা'সিয়াত বা গুণাহের কাজের মাধ্যমে, কিন্তু কুফরীটা এ যুক্তিতে জায়েয হবে না যে, সে অনন্যোপায় অবশ্যই কুফরী কাজের জন্য তাকে হত্যা, নির্যাতন ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হবে। আর অনন্যোপায় হওয়ার অর্থ হচ্ছে, কোনো মানুষ দুটি বিপর্যয়

www.pathagar.com

সৃষ্টিকারী বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিপর্যয় সৃষ্টির বিষয়ের অবসানের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট অন্যায় কাজটি সম্পাদন করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

"যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমা লংঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই নিশ্চয় আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালূ ।" (আল-বাকারাহ ঃ ১৭৩)

জবর দস্তির অর্থ হচ্ছে, এমন শাস্তি ও কষ্ট প্রদান যা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুফরী কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। তাই যদি আমরা অনন্যোপায় এবং জবর দস্তি মূলক নিয়মটি একত্রিত করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে, একটির মধ্যে বিশেষ অবস্থা আর একটির মধ্যে সাধারণ অবস্থার একটি ব্যাপার নিহিত আছে। [অর্থাৎ এক অবস্থায় কুফরী কথা বলার সুযোগ আছে আরেক অবস্থায় এ সুযোগ নেই।

শাইখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ) বলেন ঃ যদি বলা হয়, যে অবস্থায় কুফরী কথা বলা যায় এমন জরবদস্তির পরিচয় কি? এর জবাবে আমরা বলতে চাই, যে কারণে এতদসংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়েছে সেটিই জবরদস্তির সবচেয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ তায়ালা হযরত আম্মার (রাঃ) এর ব্যাপারে বলেছেনঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ-

"যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান গ্রহণ করার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে।" (নাহল ঃ১০৬)

মুশরিকরা হযরত আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াছির তাঁর মাতা সুমাইয়া, হযরত ছোহাইর বিলাল, খাব্বাব, সালেম (রাঃ) কে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড শাস্তি দিচ্ছিলো। হযরত সুমাইয়া (রাঃ) কে দু'টি পশুর মাঝখানে বেঁধে ধারালো অস্ত্রের সাহায্য তাঁর গুপ্তাঙ্গ আঘাত করে হত্যা করা হয়। তাঁর স্বামী ইয়াসিরকেও হত্যা করা হয়। দু'জনই ইসলামের পথে প্রথম শাহাদত বরণ কারী নারী ও পুরুষ। অতঃপর হযরত আম্মার (রাঃ) কে মাইমুন নামক কুপের মধ্যে ফেলে তার মুখ বন্ধ করে মুশরিকরা বললোঃ মুহাম্মদকে (সঃ) অস্বীকার করো, এ চরম সংকটময় মূহুর্তে অন্তরে ঈমান ঠিক রেখে শুধু মৌখিক ভাবে তাদের কথানুয়ারী মুহাম্মদ (সঃ) কে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ জবরদস্তির শিকার হয়ে মন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুশরিকরা তার জবান থেকে যা বের করতে চাইলো তাই তিনি মুখে উচ্চারণ করেছেন। তারপর রাসূল (সঃ) কে এ খবর দেয়া হলো যে, আম্মার কুফরী করেছে, তখন রাসূল (সঃ) বললেন, কখনো না, আম্মারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পূরোটাই ঈমানে ভরপুর। ঈমান তার রক্ত মাংসের সাথে মিশে আছে। অতঃপর আম্মারকে রাসূল (সঃ) এর কাছে আনা হলো। তখন আম্মার অঝোরে কাঁদছিলেন। রাসূল (সঃ) বললেন ঃ কি

www.pathagar.com

হয়েছে তোমার, আম্মার বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। মুশরিকদের খোদাদের আমি ভাল বলেছি। রাসূল (সঃ) বললেন ঃ তোমার অন্তরের অবস্থা তখন কেমন ছিলো? নিশ্চিত ভাবে ঈমানে পরিপূর্ণ ছিলো, তখন আল্লাহর রাসূল (সঃ) আম্মারের দুচোখের পানি মুছে দিলেন, যদি তারা তোমার ওপর জুলুম করে থাকে, তাহলে তুমি তোমার পূর্বের কথা (ঈমানের দিকে) ফিরে যাও এবং তাদের কথা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। এ ঘটনার পরই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। হযরত মুজাহিদ (যিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন মুফাসসির ছিলেন) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদল লোক মদিনা হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হওয়ার পর রাস্তায় মক্কায় কাফেরেরা তাদেরকে ধরে ফেলে । ফলে জীবন রক্ষার্থে মন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ মুসলমানরা কুফরী কথা বলতে জবরদস্তী মূলক ভাবে বাধ্য হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত মুকাতিলের (রহঃ) এর বর্ণনা মতে একজন ক্রীতদাসের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়। এ ক্রীতদাসের মনিব তাকে কুফরী করতে বাধ্য করেছিলো। অতএব এসব ব্যক্তিগণের জীবনে যা ঘটেছে তা যদি কোনো ব্যক্তির ওপর দিয়ে ঘটে যায়, তাহলে তাদের জন্য যা জায়েয ছিলো, তার জন্য তাই জায়েয। হযরত আম্মার (রাঃ) কুফরী কথা তখনই বলতে বাধ্য হয়েছেন, যখন তার মাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর পিতাকেও হত্যা করা হয়েছে, তাকে আঘাত করা হয়েছে, তাকে কুয়ার মধ্যে ফেলে মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে । একই নির্মম পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন ঐসব মুসলমানরা যাদেরকে মুশরিকরা আটক করেছিলো। একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলো ঐ ক্রীতদাস যার মনিব তার ওপর কুফরী করার জন্য জবরদস্তি করেছিলো। এ ছাড়া সালফে সালেহীন (নেককার পূর্বসূরী) এমন অনেক মাজলুম মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কুফরী কথা বলছে অনেক কষ্ট ও অনেক নির্যাতনের পর। তাই যখনই কিছু সংখ্যক লোক ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর কাছে হযরত আম্মার (রাঃ) এর ঘটনা দ্বারা কষ্ট ও নির্যাতনের ব্যাপারে অজুহাত পেশ করতো. তখন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলতেন হযরত আম্মারকে তারা (মুশরিকরা) তাকে অনেক নির্যাতন করেছিলো, আর তোমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা তোমাদেরকে আঘাত করতে চাই। (অর্থাৎ তোমাদেরকে নির্যাতনের কথা শুধু বলাতেই বিভিন্ন অযুহাত পেশ করছো, এতটুকু দুর্বল ঈমান তোমাদের)।

দুই ঃ যে ব্যক্তি বলে যে, আমি বাধ্য হয়েই কুফরী করি, তার একথা বাতিল হওয়ার দ্বিতীয় দিক তার কাছে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই বলে দিতে চাই। যদি এমন কোনো শক্তি বা কর্তৃপক্ষ থাকে যার পূজা করা হয়। সে শক্তি যদি কোনো মানুষের ওপর চড়াও হয়ে তার সম্পদ কেড়ে নেয়, সম্পদ ফেরত দিতে যদি অস্বীকার করে, যদি বলে যতক্ষণ পর্যন্ত এ কবরকে কিছু উপহার না দিবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত এ কবরকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সম্পদ ফেরত দেয়া হবে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এমতাবস্থায় প্রতিমার উদ্দেশ্যে কোরবানী করা অথবা প্রতিমার চার পাশে তাওয়াফ করা অথবা মুর্তিকে সেজদা করা কি তার সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্য অনন্যোপায়ের অজুহাতে জায়েয হবে? তার এ কাজটি কি তার ওপর যে শেরেকী ফতোয়া অর্পিত হবে এর গ্লানি থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে? এ প্রশ্নের জবাব আমরা তার কাছে চাই।

www.pathagar.com

তিন ঃ যদি ধরা হয়, যে সম্পদ ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি জবরদস্তিরই অন্তর্ভূক্ত। এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, যখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহর উদ্ধৃতিগুলি একত্র করি, তখন এটা সুস্পষ্ট ভাবেই আমরা বুঝাতে পারবো যে, জবরদস্তি করে কুফরী কথা বললে কার ওজর গ্রহণ করা হবে আর কার ওজর গ্রহণ করা হবেনা প্রথম উদ্ধৃতাংশে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ-

"যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান গ্রহণ করার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে।" (নাহল ঃ১০৬)

এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের ব্যাপারে যখন মুশরিকরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করেছিল। এর ফলে তিনি অনন্যোপায় হয়ে বাধ্য হয়েই কুফরী কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ط قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ ط قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا-

"যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, এই অবস্থায় ফেরেস্তারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেস্তারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।" (আন নিসা ঃ ৯৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এই আয়াতটি ঐ সব মুসলমানদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে যারা (মুসলমান হয়ে ও ঈমানী দুর্বলতার কারণে হিজরত না করে কাফেরদের সাথে মক্কাতেই ছিলো) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলো তাদের কতিপয় লোক বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো, বাকীরা মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। রাসূল (সঃ) তাদের সাথে কাফেরদের প্রতি তিনি যে আচরণ করেছেন, সেই আচরণই করেছেন। অর্থাৎ কাফেরদের মতো তাদের কাছ থেকেও মুক্তিপন হিসেবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আবুল আসওয়াদের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান) বলেন ঃ শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মদিনা বাসীদেরকে নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করা হয়। এতে আমার

www.pathagar.com

নামও তালিকাভূক্ত করা হয়। আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম ইকরামার কাছে গিয়ে সব কিছু বললাম। তিনি আমাকে সেনা দলে যোগদান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তার পর বললেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছেন ঃ মুসলমানদের কিছু লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রাসূল (সঃ) এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের দল ভারী করেছিলো। যুদ্ধের ময়দানে নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাদের কারো শরীরে বিদ্ধ হলে সে মারা যেতো অথবা আহত হয়ে পরে মারা যেতো। তারপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ط قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ط قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا-

"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, ফেরেস্তারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলেঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম, ফেরেস্তারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।" (আন নিসা ঃ ৯৭)

ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে জারীর হযরত ছুদ্দী থেকে এর তাফসী প্রসংঙ্গে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছুদ্দী (রহঃ) বলেছেন ঃ যখন হযরত আব্বাস, আকীল এবং নওফেল বন্দী হয়ে রাসূল (সঃ) এর কাছে নীত হলেন, তখন রাসূল (সঃ) আব্বাসের উদ্দেশ্যে বললেনঃ তুমি তোমার এবং তোমার ভ্রাতুস্পুত্রের পক্ষ থেকে ফেদিয়া মুক্তি পনের (অর্থ দাও)। তখন আব্বাস বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার কেবলার দিকে ফিরে নামাজ পড়িনা? এবং আপনি যার সাক্ষ্য প্রদান করেন আমরা কি তাঁরই সাক্ষ্য দেইনা? তিনি বললেন ঃ হে আব্বাস নিশ্চয়ই তোমরা পরস্পরে ঝগড়া করো, তাই ঝগড়া করছো। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً "আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলোনা ?"

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ বুখারীতে আল-জিহাদ অধ্যায়ে মুশরিকদের মুক্তিপন সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি [(হযরত আনাস (রাঃ)] বলেন ঃ রাসূল (সঃ) এর কাছে যখন বাহরাইনের মাল আনা হলো, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে কিছু মাল (সম্পদ) দিন। কেননা আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং অকীলের পক্ষ থেকে মুক্তি পনের অর্থ দিয়েছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, লও, তখন রাসূল (সাঃ) তাঁর কাপড়ে কিছু মাল দিলেন।

কুরআন ও সুন্নাহর এসব উদ্ধতির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথার ব্যাপারে তাকে জবরদস্তি করা হবে বলে পূর্বেই জানতে পারে বা ধারনা করতে পারে এবং যদি মহা পরীক্ষা বা বিপদে

www.pathagar.com

পতিত হওয়ার পূর্বে তার শহর ও এলাকা থেকে হিজরত করা কিংবা পালিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি থাকে অথচ সে (পলিয়ে গেলোনা) বা হিজরত করলোনা তাহলে তার ওপর জবরদস্তি মূলক আচরণ কে তার কুফরী কথা বা কাজের ওযর হিসেবে গ্রহণ (যোগ্য) হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ওপর কাফেররা চড়াও হয়েছে অথচ উক্ত অবস্থা থেকে নিস্কৃতি লাভের কোনো শক্তি তাদের নেই। যার ফলে কাফেররা তাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করেছে, তাদের ওযর বা অজুহাত গ্রহণ যোগ্য। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক হওয়া উচিৎ এবং জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা উচিৎ। আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ বিন শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার লিখিত حكم موالاة اهل الاشراك নাম পুস্তিকায় বলেন ঃ

৬ষ্ঠ দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ط قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ط قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا-

"যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে, এই অবস্থায় ফেরেস্তারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেস্তারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা যে, দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ স্থান।" (আন নিসা ঃ ৯৭)

অর্থাৎ তোমরা কোন দলে ছিলে? তোমরা কি মুসলমানদের দলে ছিলে? নাকি মুশরিকদের দলে ছিলে? তারা তখন ওযর বা অজুহাত পেশ করেছিলো যে, তারা দুর্বল হওয়ার কারণে তারা মুসলমানদের দলে থাকতে পারেনি। ফেরেস্তারা কিন্তু তাদের এ ওজর গ্রহণ করেনি বরং তাদের কে লক্ষ্য করে বললো ঃ

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"তোমাদের হিজরত করার জন্য কি আল্লাহর যমীন প্রশস্ত ছিলোনা? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম। এটা খুব খারাপ স্থান।"

কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করবে না যে, যারা মুসলমানদের দল থেকে চলে গিয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে গিয়েছেলো তারা তাদেরই (মুশরিকদেরই) দল ও জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে গণ্য হয়েছিলো। অথচ এখানে আয়াত নাযিল হয়েছে এ সব লোকদের ব্যাপারে যারা ছিলো মক্কাবাসী, তারা ঈমান এনেছিলো তবে তারা হিজরত থেকে বিরত ছিলো। যখন মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো তখন তাদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাদেরকে (মক্কার মুসলমানদেরকে) জবরদস্তি করেছিলো। অগত্যা তারা ভয়ে ভয়ে তাদের সাথে বের হয়েছিলো। অবশেষে তারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদেরই হাতে নিহত হয়। যখন (নবীর সংগী) মুসলমানরা তাদের (নিহত মুসলমান)

www.pathagar.com

কথা জানতে পারলো, তখন তারা আফসোস করলো আর বলতে লাগলো, আমরা আমাদের ভাইদেরকেই হত্যা করলাম। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন। তাহলে ঐ সব লোকদের অবস্থা বা হুকুম কি হতে পারে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ছিলো, অতঃপর ইসলামের রজ্জুকে আপন স্কন্ধ থেকে খুলে ফেলেছে, মুশরিকদের দ্বীনের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে, তাদের অনুগত্য করেছে, তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে, তাওহীদে বিশ্বাসী লোকদেরকে আপমানিত করেছে, তাওহীদে বিশ্বাসী লোকদের পথ পরিহার করেছে, তাদেরকে দোষারোপ করেছে, তাদেরকে গালি-গালাজ করেছে, বদনাম করেছে, তাদেরকে উপহাস করেছে, বদনাম করেছে, তাদেরকে উপহাস করেছে, তাওহীদের ওপর অবিচল থাকাকে মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, জিহাদের ক্ষেত্রে তাদের ধৈর্যকে অপমানিত করেছে। জবরদস্তির ফলে নয় বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে, তারা ঐ সব লোকদের চেয়ে কাফের হওয়ার বেশী যোগ্য বা হকদার যারা হিজরত পরিত্যাগ করেছে সামান্য পার্থিব স্বার্থের কারণে। কাফেরদের কারণে বাধ্যহয়ে মুশরিক সৈন্যদের সাথে ভয়ে, ভয়ে বের হয়েছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যদি কেউ বলে ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জবরদস্তিতে মক্কা থেকে বের হয়ে যারা বদর যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো, কাফের কর্তৃক তাদের ওপর জবরদস্তি কি ওজর হিসেবে গ্রহণ যোগ্য হবে না? তখন উত্তর হবে না, গ্রহণ যোগ্য হবেনা। কেননা প্রাথমিক পর্যায়ে যখন তারা কাফেরদের সাথে **অবস্থান করছিলো তখন তাদের কোনো ওজর বা অযুহাত ছিলোনা। তাই পরবর্তীতে জবরদস্তির কারণে ওজর গ্রহণ যোগ্য হবে না, তার মূল কারণ হচ্ছে হিজরত পরিত্যাগ করে কাফেরদের সাথে তাদের থেকে যাওয়ার** সিদ্ধান্ত। (মাজমুআতুত তাওহিদ ৩০৫/১)

কাজী আইয়ায (রহঃ) আল-মাদারেক এর ২/৭১৯ পৃষ্টায় বলেন ঃ আবু মুহাম্মদ বিন আল-কারবানীকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যাকে বনু ওবায়েদ। (নামক একটি গোত্র) তাদের আহবানে সাড়া দেয়া অথবা মৃত্যু বেছে নেয়ার ব্যাপারে জবরদস্তি করা হয়েছিলো। তিনি জবাবে বললেন ঃ মৃত্যুকেই বেছে নিবে,তবু অন্যায় আহবানকে ওযর হিসেবে গ্রহণ করা যাবেনা। তবে প্রথম থেকেই যদি সে (অন্যায় আহবানকারী লোকদের) শহরে প্রবেশ করে থাকে এবং তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে থাকে এবং ঈমানের জন্য ভয়ের কোনো কারণ না থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। পরবর্তীতে ঈমানের ওপর হুমকি প্রকাশ পেলে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। কিন্তু কাফের মুশরিকদের সাথে সব কিছু জেনে-শুনে অবস্থান করতে থাকলে ভীতি বা জবরদস্তির কোনো অযুহাত গ্রহণ যোগ্য হবেনা। কেননা যে অবস্থান অধিবাসীদের কাছে শরীয়ত বাতিলের দাবী করে, সে অবস্থানে থাকা (শরীয়ত বাতিলের আহবানে সাড়া দেয়া) কিছুতেই জায়েয নয়। এ থেকে ওলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন, ওযর মুসলমানদের জন্য তাদের শত্রুদের মাঝে এমন অবস্থায় বসবাস করা অনুচিৎ, যে আবস্থায় তাদের শত্রুরা তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ দিক ঃ ইতিপূর্বে পেশকৃত প্রশ্ন ও উদাহরণের এখানে প্রশ্ন করতে চাই, যদি অসংখ্য মুসলমান এমন কোনো শহরে বাস করে, সেখানে কুফরী শাসন চলে। এক সময় মুসলমানদের ওপর যদি কাফেররা চড়াও হয়, আর তাদের সম্পত্তি হরণ করে নেয়, আর নগরের প্রশাসন একথা বলে ঃ তোমাদের ধন-সম্পদ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত দিবনা যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহকে গালি দাও , অথবা তোমাদের রাসূলকে (সঃ) গালি দাও, অথবা তোমাদের দ্বীন ইসলামকে গালি দাও, অথবা গাইরুল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তোমরা পশু জবাই করো ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর তারা (মুসলমানরা) তাদের ডাকে সাড়া দিলো এবং কাফেদের সাথে তারা বেশ কিছু বছর অতিবহিত করলো? তারপর তারা কুফরী শক্তির বিচারালয়ে ততদিন পর্যন্ত নিজেদের সম্পদ ফিরে পাওয়ার জন্য গেলোনা, যতদিন না তারা আল্লাহকে গালি দিলো। এটাকে জবরদস্তি গণ্য করে তাদের ওজর হিসেবে গণ্য করা যাবে? নিঃসন্দেহে এর জবাব হবে 'না,। অতএব আমরা বলতে চাই, সে জাতির সকলেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আল্লাহকে ইচ্ছা মতো গালমন্দ করে এবং যে কুফরী কাজ ইসলামের গন্ডি থেকে মানুষকে বের করে দেয়, এমন কাজ করে তার মধ্যে আর যে জাতির সবাই তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যায় আর এমন কাজ করে, যা ইসলামের গন্ডি থেকে কোনো ব্যক্তি বের করে দেয় তার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

পরিশেষে আমরা একথা বলতে চাই, যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে এ ফেৎনা আর বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? এর উত্তরে ফেৎনা থেকে বাঁচার নিম্মোক্ত উপায়ের কথা বলবো।

<u>প্রথম উপায়</u> ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللهِ ط وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

"যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী । আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী করুণাময়।" (আল-বাকারাহ ঃ ২১৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۭ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-(النحل ٤١)

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ (হিজরত) করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দিবো, আর পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানতো।"

(নাহল ঃ ৪১)

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل- ١١٠)

"যারা দুঃখ কষ্ট ভোগের পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে, এবং ধৈর্য ধারন করেছে. নিশ্চয় আপনার রব এ সব বিষয়ে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (নাহল ঃ ১১০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً-

"যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও স্বাচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে।" (আন নিসাঃ ১০০)

হাফেজ ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে বলেন ঃ سعة শব্দের অর্থ হলো রিযিক এটা একাধিক আলেমের কথা। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত কাতাদাহ (রহঃ)। তিনি বলেন ঃ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً গোমরাহী থেকে হেদায়াত এবং দৈন্যতা থেকে সমৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে। এটা হলো এ ধরনের ফেতনা থেকে বাঁচার প্রথম উপায় আর এ উপায়টির নাম হচ্ছে হিজরত। হিজরত হতে হবে দারুল কুফুর থেকে দারুল ইসলামের দিকে। দারুল কুফর বলতে ওলামায়ে কেরাম ঐ দেশকেই বুঝিয়েছেন যেখানে কুফরী শাসনের কর্তৃত্ব ও প্রধান্য বিরাজমান।

ইমাম ইবনুল কয়্যিম (রহঃ) আহলে জিম্মাহর হুকুম আহকাম বা বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন ঃ দারুল ইসলাম বলতে ঐ স্থানকেই বলে যেখানে মুসলমানরা অবস্থান বা বসবাস করে এবং ইসলামের বিধান সেখানে জারি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে ইসলামের বিধান জারি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্থানকে দারুল ইসলাম বলা যাবে না । এর সাথে যদি ইসলামের নাম সংযোগ করাও হয় তবুও নয়। দাওয়াতে নাজদিয়ার ওলামায়ে কেরাম বলেন ঃ যে শহর বা স্থান কুফরী বিধান দ্বারা পরিচালিত সে স্থানই দারুল কুফর। ইবনু মফলিহ বলেন ঃ যে স্থান ইসলামের বিধানে কর্তৃত্বশীল সেটাই হলো দারুল ইসলাম। আর যদি সে স্থানে কুফরী বিধান কর্তৃত্বশীল হয় তাহলে সেটাই হলো দারুল কুফর। এ দু অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থার স্থান নেই।

শাইখ সুলাইমান বিন সামহান আননাজদী (রহঃ) তাঁর এক বর্ণনায় বলেন ঃ দারুল ইসলামে যদি কুফরী শক্তি বিজয়ী হয়, আর সেখানে কুফরী বিধান জারি করে, তাহলে সে স্থান দারুল কুফরে পরিণত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন ঃ

যদি কোনো কাফের চড়াও হয়
কোনো দারুল ইসলামে,
আর সেখানে যদি স্থান নেয়
ভয় ভীতি আর শঙ্কা,
যদি চালু করে কুফরী বিধান
নির্বিঘ্নে প্রকাশ পায় কুফরী আইন
রহিত করে দেয় সেখানে
নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর বিধান
সেখানে প্রকশিত হয়না ইসলাম,
গৃহীত হয়না তথা ইসলামী বিধান
সে স্থান হয় দারুল কুফর
সকল গুণী ও বিজ্ঞ জনের কাছে।
তবে কাফের নহে যে সবাই,
যারা আছে সেই খানে।
হয়তো বা আছে সেথা পূণ্যবান
স্বীয় নেক কর্ম ও গুণে।

শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল-শাইখকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে মুসলিম মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসিত হয়, সেখান থেকে হিজরত করা কি ওয়াজিব ? জবাবে তিনি বলেন, যে দেশ মানব রচিত বিধানের মাধ্যমে শাসিত হয়, সে দেশ ইসলামের দেশ নয়। এ দেশ থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। এমনিভাবে যখন সেখানে নির্দ্বিধায় পৌত্তলিকতার উন্মেষ ঘটে, সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব। কেননা কুফরী শাসন সর্বদাই কুফরীর প্রচারও প্রসার ঘটায়, তাই এমন দেশকে কুফরীর দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

দ্বিতীয় উপায় ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ আল বুখারীতে 'ঈমান অধ্যায়ের ফেতনা থেকে পালায়ন করা, দ্বীনি কাজের অন্তর্ভূক্ত, অনুচ্ছেদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) বলেন ঃ রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومـــواقع القطر يفر بدينه من الفـــتـــن-

"অতি শীঘ্রই সে দিন আসবে যখন মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগল। তা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে আর বৃষ্টির স্থানে যাবে। ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য তার দ্বীন নিয়ে সে পালিয়ে বেড়াবে।"

www.pathagar.com

তৃতীয় উপায় ঃ তৃতীয় উপায় হচ্ছে একজন তাওহীদবাদী মুসলিম এমন একটি শহর কিংবা গ্রাম অনুসন্ধান করবে এবং বেছে নিবে, যেখানে কুফরী রীতিনীতি ও বিধানের কর্তৃত্ব নেই। সে তার দ্বীন এবং দুনিয়া রক্ষার জন্য এবং জীবন যাপন করার জন্য সেখানে যাবে।

চতুর্থ উপায় ঃ চতুর্থ উপায় হচ্ছে ঐ জনসমষ্টির জন্য যারা হিজরত করেনি এবং ইসলাম থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়নি, যেমন দারুল কুফরের কোন গ্রাম বা শহরবাসী। তারা তাদের মধ্য থেকে এমন একজন আলেম, অথবা একজন বিজ্ঞ লোক অথবা একজন বিচারককে বাছাই করে নিবে, যে ব্যক্তি তাঁদের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবে এবং তারা এমন পারস্পরিক চুক্তি ও ওয়াদায় আবদ্ধ হবে যে, তারা তাদের সমস্ত বিষয় ও ঝগড়া বিবাদ সবই ঐ বাছাইকৃত ব্যক্তির কাছে ইসলামের বিধান মোতাবেক ফয়সালা করার জন্য নিয়ে যাবে। তাদের এ অনুসরণ হবে ইমাম বা তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ ইমামের (মুসলমানদের নেতার) অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক শহরে এবং যে এলাকায় কাজী (শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালাকারী) নেই সেই সব এলাকায় কাজী নিয়োগ করা। কোনো প্রদেশের গর্ভনর অথবা কোনো শহরের আমীরকে ও ইমাম (মুসলামান সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি) কাজী (বিচারক) পদের জন্য নিয়োগ দিতে পারেন যদি সেখানে শরীয়তের বিধান মোতাবেক বিচার কার্য চালাবার জন্য কোনো লোক না থাকে। কেননা তিনিই হচ্ছে, ওয়াকিল বা দায়িত্বশীল প্রতিনিধি, এমনি ভাবে যদি মুসলমানদের কাউকে কাজী বা বিচারক বেছে নেয়ার বিষয় ন্যাস্ত করা হয়, কোনো পিতার অধিকার নেই তার সন্তানকে বিচারক হিসেবে বেছে নেয়া বা নিয়োগ দেয়া। যেমনিভাবে নিজের জন্য বেছে নেয়া যায় না। যদি শহরবাসীকে বলা হয় ঃ তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তিকে বেছে নাও এবং বিচার-ফয়সালার জন্য তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করো। ইবনু কাজ বলেনঃ সহীহ মতানুযায়ী এটা জায়েয আছে।

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর 'আল মুগনী' নামক কিতাবে বলেন ঃ যদি ইমাম কোনো মানুষকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে, তাহলে তা গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয আছে অতএব তার জন্য কাউকে উকিল বা প্রতিনিধি বানানোও জায়েয আছে, যেমনটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েয আছে। যদি তাকে বিচারক বাছাই করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে তাহলে সেটাও তার জন্য জায়েয আছে তবে নিজেকে বিচারক হিসেবে বাছাই করা তার জন্য জায়েয হবে না। এমনি ভাবে নিজ পিতাকে কিংবা নিজ সন্তানকে বিচারক হিসেবে বাছাই করতে পারবে না। ঠিক যেমনিভাবে, ছদকা বা যাকাতের মালের ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা অর্পন করলে তা গ্রহণ করা এবং পিতা ও সন্তানকে প্রদান করা জায়েয হতো না। তবে যদি তার পিতা ও ছেলে নেতৃত্বের যোগ্যতায় সক্ষম হয়, তাহলে তাদেরকে বিচারক নিয়োগ করা ঐ ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জায়েয হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা এ নির্বাচন বা বাচাই সাধারণ ভাবে যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করার যে ক্ষমতা ও অনুমতি তাকে দেয়া হয়েছে তার মধ্যে এটা শামিল। আল্লাহ চাহে তো খুব শীঘ্রই এ অধ্যায়ের আলোচনা

www.pathagar.com

শেষ হলেই এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত এবং শরীয়তের কাজী বা বিচারক কোনো শহরে না পাওয়া গেলে কি করতে হবে এ ব্যাপারে ও ওলামায়ে কেরামের মতামত আসবে। এ ফেতনা থেকে বাঁচার উল্লেখিত ৪টি উপায় বর্ণনা করা হলো। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপন ফেতনা থেকে রক্ষা করুন এবং মুক্তিদান করুন। আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান। আল্লামা শাইখ সুলাইমন বিন ছামহান (রহঃ) যিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী আলেম ছিলেন, তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে, অনন্যোপায় হয়ে যদি কেউ তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যায়, তাহলে তার হুকুম কি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি যা বলেছেন তা বলেই এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধটি শেষ করছি।

দ্বিতীয় অবস্থান ঃ দ্বিতীয় অবস্থান হচ্ছে এ কথা বলা, অতএব তুমি জানতে পারলে যে, তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কুফরী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে কুফরী হচ্ছে হত্যার চেয়ে জঘন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ "ফেতনা হচ্ছে হত্যার চেয়েও জঘণ্য।" (আল বাকারা ২১৭)

তিনি আরো বলেন ঃ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ "ফেতনা হচ্ছে হত্যার চেয়েও কঠিন (গুনাহ)।" (আল বাকারা ১৯১)

" কুফরীই হচ্ছে ফেতনা "। শহুরে আর গ্রাম্য দু জনের মধ্যে যদি খুনা খুনী শুরু হয়ে যায়, আর তারা মারা যায় সেটা আল্লাহর জমীনে তাগুতকে প্রশাসক নিয়োগ করার চেয়ে অনেক সহজ কেননা তাগুত আল্লাহর যমীনে সেই ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে শাসন করবে, যে শরীয়ত দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে (সঃ) পাঠিয়েছেন।

তৃতীয় অবস্থান ঃ আমরা বলতে চাই, তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া যদি কুফরী হয় আর ঝগড়া বিবাদ যদি একমাত্র দুনিয়ার জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে কুফরী করা তোমার জন্য জায়েয হতে পারে? কেননা মানুষ প্রকৃত পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসে পরিণত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর রাসুল (সঃ) তার কাছে তার সন্তান, তার পিতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশী মুহাব্বাতের বস্তু হবে। তোমার দুনিয়ার সকল স্বার্থও যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবু দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া তোমার জন্য জায়েয নেই। যদি কোনো জালেম ব্যক্তি তোমার ওপর চড়াও হয়ে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া আর তোমার দুনিয়ার সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার মাঝে কোনো একটিকে বেছে নিতে তোমাকে বাধ্য করে, তাহলে দুনিয়া বাদ দেয়া তোমার জন্য ওয়াজিব, তবু তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া জায়েয নেই।

তাই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী প্রত্যেক মুমিন, মুমেনা যে তার দ্বীন ও তাওহীদের হেফাজত চায়, তার জন্য উচিৎ হচ্ছে তাদের সমস্ত বিবাদপূর্ন ও বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালার জন্য ঐ সব ওলামায়ে কেরামের কাছে বিচার চাওয়া যার, তাঁদের রবের কিতাব আর তাদের নবীর সুন্নত মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে। আর তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

তাদের অনুচিৎ। কেননা তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার অর্থই হচেছ তাগুতের প্রতি ঈমান আনা এবং তারই উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদন করা। অবশ্যই কেয়ামতের দিন তাগুতের অনুসারী হয়ে উঠাকে ভয় করা উচিত। রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানুষকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করে বলবেন ঃ যে ব্যক্তি যে জিনিসের এবাদত করতো দুনিয়াতে, সে যেনো তারই অনুসরণ করে। এরপর যে ব্যক্তি সূর্যের ইবাদত করতো সে সূর্যের ইবাদত করবে, আর যে ব্যক্তি চন্দ্রের ইবাদত করতো সে চাঁদের অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তি তাগুতের ইবাদত করতো সে তাগুতের অনুসরণ করবে। (বুখারী)

হে আল্লাহ, মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে জীবিত রাখো, আর মুসলমান করে মৃত্যু দান করো, আমরা যেনো নেককারদের সাথে হাশরে মিলিত হতে পারি। আমরা যেনো আপমানিত না হই, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হই। দুরূদ ও সালাম নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর ওপর, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

(সংযোজিত প্রবন্ধ)

বিবদমান দুব্যক্তির বিচারক নিয়োগের বৈধতা এবং কোনো শহরে শরীয়তের বিচারক না পাওয়া গেলে করণীয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামতঃ

আল খাতাবী (রহঃ) তাঁর সুনানে আবী দাউদ নামক গ্রন্থে সফরের সময় আমীর নিয়োগ সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اذا خرج ثلاثة فى سفر فليامروا احدهم-

"তিনজন সফরে বের হলে তাদের একজনকে তারা যেনো আমীর ঠিক করে নেয়।"

রাসূল (সঃ) তাদেরকে আমীর ঠিক করে নেয়ার নির্দেশ এজন্য দিয়েছেন যে, তারা যেনো ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং মতামতের ক্ষেত্রে তারা যেনো বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। তারা যেনো মতানৈক্যের মধ্যে পতিত না হয়, আর পরস্পরে কঠোরতা অবলম্বন না করে। এ হাদীসে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিবাদমান দুব্যক্তি যদি কোনো সমস্যার মীমংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নেয় এবং সে যদি হক বিচার করে তাহলে তার রায় কার্যকর হবে। (মাআলিমুস সুনান)

আবু বকর বিন আল-মুনযির আন-নাইসাবুরী তাঁর "আল ইজমা, নামক কিতাবে বলেন ঃ ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, (নিয়োগকৃত সরকারী) কাজী (বিচারক) ব্যতীত অন্য কাজী যদি কোনো ফয়সালা দেয়, আর তা যদি শরীয়ত সম্মত হয় তাহলে তা জায়েয (বৈধ) (কিতাবুল ইজমা)

আবু বকর বিন আল-মুনযির অন্য কাজী বলতে দারুল ইসলামের নিয়োগ প্রাপ্ত বা বিচারের কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজী বা বিচারককে বুঝানো হয়েছে। এবং যদি শরীয়ত সম্মত হয় এ কথার দ্বারা ইসলামী শরীয়তকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম ইবনে কুদামা তাঁর 'আল মুগনী' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ যদি বিবদমান দু'ব্যক্তি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিচার নিয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি দু'জনের মধ্যে বিচার যোগ্য বিষয়ে সন্তোষ জনকভাবে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার বিচার করা জায়েয এবং তার রায় বিচার প্রার্থী দু'ব্যক্তির মধ্যে কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এ মতই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফী (রহঃ) এর এ ব্যাপারে দু'টি মতামত ব্যক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে এই যে, এখানে বিচার প্রার্থী দু'জনের সন্তুষ্টি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির ফয়সালা দু'জনের জন্য অপরিহার্য নয়। কেননা ফয়সালা তখনই অপরিহার্য হবে যখন এর ব্যাপারে সে রাজী হবে। আর বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে জানার পরই সন্তুষ্টি সম্ভব হয়। আর আমাদের কাছে আবু শুরাইহের বর্ণনাই গ্রহণ যোগ্য প্রমাণ। আর তা হচ্ছে রাসুল (সঃ)

www.pathagar.com

আবু শুরাইহকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন ন্যায়ের আধার অতএব " আবুল হাকাম " উপনামে কেনো তোমাকে ডাকা হয়? (অর্থাৎ আবুল হাকাম উপনাম কেনো তুমি গ্রহণ করেছো) শুরাইহ বললো ঃ আমার জাতি তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য আমার কাছে আসে। আমি তাদের মধ্যে এমনভাবে ফয়সালা করে দেই যে, বিবদমান উভয় পক্ষই তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসুল (সঃ) তখন বললে এটা কতোই না ভাল কাজ। আচ্ছা, তোমার বড় ছেলের নাম কি? সে বললো ঃ শুরাইহ রাসুল (সঃ) বললেন, অতএব তুমি আবু (শুরাইহ) শুরাইহের পিতা]

(নাসায়ী)

হাদীসে বর্নিত আছে, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি বিবদমান দু'জনের মধ্যে বিচার করলো, এবং এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হলো কিন্তু যদি বিচারক ইনসাফ না করে তবে সে হবে অভিশপ্ত। যদি বিচারকের বিচার উভয়ের জন্য অপরিহার্য না হতো তাহলে বিচারকের সাথে এ বদনাম সংযুক্ত হতো। হযরত ওমর (রাঃ) এবং উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হযরত যায়েদের কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরাবি (বেদুইনের) বিরুদ্ধে দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে শুরাইহের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন। হযরত ওসমান এবং তালহা (রাঃ) হযরত জবাইর বিন মাতআমের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন অথচ তারা কেউই কাজী বা বিচারক ছিলেন না।

ইমাম আলমাওয়ারদী (রহঃ) বলেন ঃ কোনো শহরের দু'বিবদমান ব্যক্তি যদি প্রজাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তিকে তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালার, জন্য বিচারক ঠিক করে তাহলে ঐ শহরের নিয়োগকৃত বিচারক থাকুক বা নাই থাকুক পূর্ণ বিষয়ের মীমংসা করা জায়েয হবে। হযরত ওমর এবং উবাই বিন কা'ব (রাঃ) হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) এর কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছিলেন হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) যখন ইমামতির ব্যাপারে ফয়সালা দিলেন তখন ইমামতী ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করা তো আরো বেশী যুক্তিযুক্ত। এমনিভাবে আবদুর রহমান বিন আওফ ইমামতীর ব্যাপারে আহলে শুরাকে ফয়সালা দিয়েছেলেন। (আল হাদি আল কাবির)

কাজী আবু ইয়ালা আল-হাম্বলী সুলতানী আইন কানুন সংক্রান্ত বিষয়ে বলেন ঃ যদি কোনো শহরের অধিবাসীরা কাজী শূন্য হয় অথার্ৎ তাদের নির্ধারিত কোনো বিচারক যদি না থাকে, তারা যদি কোনো কাজীর অনুকরণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে এ ব্যাপারে আমার কথা আছে। যদি তাদের ইমাম ধর্মীয় নেতা, বর্তমান থাকে। তা হলে কাজীর অনুকরণ বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি ইমাম বর্তমান না থাকে তাহলে অনুকরণ শুদ্ধ হবে এবং কাজীর রায় তাদের ওপর কার্যকর হবে। (আহকামে সুলতানিয়া)

ইবনু আবেদীন আল-হানাফী তাঁর হাশিয়া বা টিকায় বলেন ঃ যদি কাফেরদের আধিক্যের কারণে কোনো স্থানে ধর্মীয় নেতা বা অভিভাবক না পাওয়া যায়, তাহলে মুসলামনদের জন্য অবশ্যকরণীয় হচেছ জুমআর জন্য একজন ইমাম ঠিক করে নেয়া।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ যদি কোনো দেশের প্রশাসকেরা সকলেই কাফের হয়, তাহলে মুসলমানদের জুমআ ও ঈদের নামাজের জন্য একজন লোক নিয়োগ করা জায়েয আছে এবং তাঁদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নিয়োগকৃত কাজী , কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। মুসলামনদের মধ্যে থেকে একজন শাসক খুঁজে বের করা তাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

তিনি আরো বলেন ঃ যদি মুসলমানদের জন্য এমন কোনো শাসক কিংবা এমন কোনো কাজী না পাওয়া যায় যার অনুকরণ বা অনুসরণ করা জায়েয, যেমন বর্তমান কসোভার মত কতিপয় মুসলিম দেশ তাহলে মুসলমানদের উচিৎ হচ্ছে তাদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে একজনকে শাসক ঠিক করে নেয়া। যিনি তাদের বিচারের দায়িত্ব পালন করবেন । তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবেন সাথে সাথে ইমামের দায়িত্ব পালনার্থে জুমআর নামাজও পড়াবেন। (হাসিয়া রদ্দে মুখতার ও দুররুল মুখতার ৩০৮/৪)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সংযোজিত প্রবন্ধ)

জাতিসংঘের কাছে বিচার প্রার্থী হওয়া ও তার সদস্য পদ লাভ করা।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করা মূলতঃ আল্লাহর শরীয়তকে বাদ দিয়ে (মানব রচিত আইনের কাছে) বিচার প্রার্থী হওয়ারই নামান্তর। এটা এ জন্য যে তাতে গাইরুল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করা এবং ঐ আইনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি জড়িত আছে।

জাতিসংঘ সনদের দ্বিতীয় পৃষ্টায় লেখা আছে ঃ 'এ সব উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে আমরা পারস্পারিক ক্ষমার নীতি গ্রহণে এবং আমরা একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে ও সহ অবস্থান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শান্তি ও আন্তজার্তিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমরা আমাদের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা এর নির্দিষ্ট মূলনীতি ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমাদের সশস্ত্র শক্তি যৌথ স্বার্থ সংরক্ষণ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করবোনা। আমারা আন্তর্জাতিক উপকরণগুলোকে সকল জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যয় করবো।'

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সনদে লিখিত বক্তব্যের যা অর্থ দাড়ায় তা দ্বারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ) বাতিল হয়ে যায়। অথচ এ জিহাদের মধ্যেই বান্দাগণকে বান্দার গোলামী থেকে বান্দার রবের গোলামীর দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিহিত আছে। শুধু তাই নয় এ সনদের বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের জিজিয়া বা করের নীতিকে বাতিল করা হয়েছে।

জাতিসংঘ সনদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম ধারায় এর উদ্দেশ্যাবলী ও মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

১। আন্তজার্তিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান শান্তির জন্য হুমকি প্রদানকারী এবং শান্তি বিনষ্টকারী সকল কারণগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকারী যৌথ ব্যবস্থা গ্রহন করবে। আন্তজার্তিক আইন ও ন্যায়ের মূলনীতি অনুযায়ী শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল আগ্রাসী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন শান্তিপূর্ণ উপায় উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করা, যা শান্তি বিনষ্টের দিকে ধাবিত করতে পারে।

২। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হবে সেই মূলনীতির সম্পূর্ন প্রদর্শন যা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার নিশ্চিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রনাধিকার থাকবে। এমনি ভাবে সাধারণ শান্তিকে অধিক শক্তিশালী করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতির এবং মানবিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আন্তজার্তিক সমস্যার সমাধানের জন্য এবং সকল মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে জোরদার করার জন্য আন্তজার্তিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও ভাষার মধ্যে কোনো তারতম্য না করে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না করে নির্বিশেষে সকলকেই উৎসাহ প্রদান।

এক নম্বর ধারার কথাগুলো লক্ষ্য করুন, আন্তর্জার্তিক আইন ও ন্যায়ের মূলনীতি অনুযায়ী শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল আগ্রাসী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন শান্তিপূর্ণ উপায় উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে করবে। জিহাদ বাতিলের সুস্পষ্ট ঘোষণা এখানে রয়েছে এবং সকল দিক থেকেই আন্তজার্তিক বিধানের কাছে বিচার চাওয়াকে অপরিহার্য করা হয়েছে। যা মূলতঃ তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনারই নামান্তর। দুই এবং তিন উপধারার কথার দিকে লক্ষ্য করুন যা সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে " সকল মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে জোরদার করার জন্য আন্তজার্তিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।" এ ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও ভাষার মধ্যে কোনো তারতম্য না করে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না করে নির্বিশেষে সকলকেই উৎসাহ প্রদান, কে রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করে, আর কে মূর্তি, প্রতিমা , জড় পদার্থ, গরু ও পাথরের পূজা করে এর মধ্যে কোনো পার্থক্যের কথা এখানে বলা হয়নি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব অধিকার আছে। যে ব্যক্তিই এ প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে, সদস্যপদ লাভ করবে তাকেই উপরোক্ত বাতিল কথাগুলোর স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতিসংঘ সনদের ৪র্থ ধারার প্রথম উপধারায় লেখা আছে।

১। শান্তিপ্রিয় অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করা বৈধ। যে দেশ সনদের সন্নিবেশিত সকল বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে এবং যে দেশের ব্যাপারে এ প্রতিষ্ঠান মনে করবে যে, দেশটি যাবতীয় বাধ্যবাধকতা মেনে চলার জন্য সক্ষম এবং এ প্রতিষ্ঠান যে দেশের ব্যাপারে আগ্রহী হবে সে দেশের জন্য সদস্য পদ লাভ করা বৈধ ।

সনদের ৬ষ্ঠ ধারায় লেখা আছে ঃ জাতিসংঘের কোনো সদস্য যদি অনুধাবন করে কোনো দেশ কর্তৃক সনদের মৌলিকত্ব খর্ব হবে, তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার জন্য ঐ দেশের সদস্যপদ বাতিল করার বৈধতা রয়েছে।

এই কুফরী উপধারার স্বীকৃতির দ্বারা জিহাদ, জিজিয়া এবং ইসলামের অভিভাবকত্বের নীতি বাতিল করা হয়েছে এবং দ্বীন ইসলামকে বিশ্বজনিনের পরিবর্তে প্রাদেশিক দ্বীন বানানো হয়েছে। [আল্লাহর] একাত্ববাদে বিশ্বাসী লোকদের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতা ও মুর্খতার পতাকাতলে কাফেরদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বিবাদপূর্ন বিষয়ের ফয়সালার জন্য তাদের দাবী অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইন তথা আন্তজার্তিক আদালতের কাছে যেতে বলা হয়েছে। এ সব বিষয়ের প্রত্যেকটিই ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হওয়াকে অপরিহার্য করে তোলে। তাই যে দেশই জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভে অংশ গ্রহণ করবে, সে দেশই জাতিসংঘ সনদের স্বীকৃতির মাধ্যমে কলেমা লা-ইলাহা

www.pathagar.com

ইল্লাল্লাহর বিরোধিতা দ্বারা কুফরী করবে। নিচে সংক্ষেপে জাতিসংঘ সনদে কুফরীর কয়েকটি বিষয় প্রদত্ত হলো।

১। সদস্য পদ লাভের সময় জাতিসংঘের সকল আইন-কানুন মেনে নেয়া অপরিহার্য (৪র্থ ও ৬ষ্ঠ ধারা)।

২। অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যের ক্ষেত্রে একজন মূর্তি পূজারী কাফের এবং একজন তাওহীদবাদী মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এবং এতে রয়েছে ইসলামের জিজিয়া বা কর প্রথা রহিত করণ (১ম ধারা ৩য় উপধারা)।

৩। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ [আল্লাহর পথে সংগ্রাম] এর ফরজিয়াত বাতিল বা রহিত করণ (১ম ধারা প্রথম উপধারা।)

৪। সিদ্ধান্ত এবং ফয়সালা চুড়ান্ত হয় সংখ্যাঘরিষ্ট লোকের রায়ের ভিত্তিতে, আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) বিধানের ভিত্তিতে নয়। (১৮তম ধারা ২য় উপধারা) এতে লেখা রয়েছে, সাধারণ গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী উপস্থিত (সভায়) দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের রায় বা ভোটের ভিত্তিতে। যে সব বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত সেগুলো হচ্ছে, আন্তজার্তিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ সুপারিশ। নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচন (৮৬ নং ধারা মোতাবেক) জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণ। সদস্যগণের সদস্য পদ সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগ স্থগিতকরণ এবং তা ভোগ করা। সদস্যদের বহিস্কার। সুপারিশ ও উপদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় এবং বাজেট সংক্রান্ত বিষয়।

৫। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক ও যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্ম কান্ড পরিচালনা করবে, তা গঠিত হবে সমস্ত কুফরী রাষ্ট্রগুলো নিয়ে। সৈন্য পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যগুলোই হচ্ছে মূল নিয়ন্ত্রক। দেশগুলো হচ্ছে ঃ (১) চীন (২) ফ্রান্স (৩) রাশিয়া (৪) বৃটেন (৫) আমেরিকা।

কোনো অবস্থায়ই এদেশগুলোর নেতৃত্ব বদলাবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালিত হবে তাদের নেতৃত্বে। এ ব্যাপারে ২৩ নং ধারা ১ নং উপধারায় লিখিত আছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত ১৫টি দেশ নিয়ে। দেশগুলো হচ্ছে - চীন, ফ্রান্স, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, উত্তর আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, এ সব দেশগুলোর এ'তে স্থায়ী সদস্য থাকবে। সাধারণ সভা জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে থেকে নিরাপত্তা পরিষদের জন্যে অস্থায়ী সদস্য হিসাবে দশ জনকে নির্বাচিত করবে।

আন্তজার্তিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে জাতিসংঘের সদস্যদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। যেমনভাবে ন্যায় সংগত ভৌগোলিক বন্টনের বিষয়টি খেয়াল রাখা হয়।

একইভাবে জাতিসংঘের ৪৬তম, ৪৭তম এবং ৪৮তম ধারায় যে বর্ণনা এসেছে তা দ্বারা এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে যুদ্ধ পরিচালিত হবে মুশরিকদের তত্ত্বাবধানে।

www.pathagar.com

৪৬তম ধারায় বলা হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহারে জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহন করবে, নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ পরিচালনা কমিটির সহযোগিতায়।

৪৭তম ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে " ষ্টাফ অফিসারদেরকে নিয়ে কমিটি গঠিত হবে। এ কমিটির কাজ হবে নিরাপত্তা পরিষদকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান এবং আন্তজার্তিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে শক্তি ব্যবহার করার জন্য সশস্ত্রকরণ ব্যবস্থাপনা এবং যথাসাধ্য নিরস্ত্রীকরণের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান।

৪৮তম ধারার প্রথম উপধারায় রয়েছে" নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘের সকল সদস্য অথবা কতিপয় সদস্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্ম তৎপরতা চালাবে।

৬। বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ইসলামী দৃষ্টিকোণ রহিত করণঃ এ ব্যাপারে ৪৭তম ধারায় বলা হয়েছে, সকল মানুষের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা জোরদার করার জন্য জাতি, ধর্ম ও ভাষার মধ্যে কোন তারতম্য না করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য না করে নির্বিশেষে সকলকেই **উৎসাহ প্রদান এবং বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে পারস্পারিক কি সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য উৎসাহ প্রদান।**

৭। তাগুতের (বা খোদাদ্রোহী শক্তির) কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। (৯২তম ধারা) জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতই হচ্ছে তার বিচার সংক্রান্ত উপকরণ বা মাধ্যম। এ আদালত কাজ করবে সনদের সাথে সম্পৃক্ত মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী। এ সনদের ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্থায়ী আদালতের মৌলিক নীতি, যা জাতিসংঘ সনদের অবিচ্ছেদ অংগ।

৯৪তম ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে ঃ জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য যে কোন বিষয়ে বা মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মেনে নিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

উপরোক্ত এ সব বিষয়গুলো দ্বীন ইসলাম এবং তাওহীদে বিশ্বাসী জাতির সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ। অথচ এ আদর্শ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ-

"আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসূল প্রেরণ করেছি, এ মর্মে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দুরে থাকো।"

(নাহল ঃ৩৬)

এটা নিঃসন্দেহ যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভকারী প্রতিটি রাষ্ট্রই এ জঘণ্য কুফরীতে পতিত হয়েছে। কেননা এর মধ্যে রয়েছে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা, জিহাদ এবং জিজিয়া (কর প্রথা) রহিত করণ,

www.pathagar.com

মুশরিকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহন করা এবং তাদেরকে সাহায্য করা তাওহীদবাদী লোকদের বিরুদ্ধে তাদের পতাকা ও নিশান সমুন্নিত রাখার বাধ্যবাধকতা যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের মূর্তি ও প্রতিমাগুলো তাদের আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি এবং সরকারী প্রতীক সমুহের সম্মান প্রদর্শন। জাতিসংঘ সনদে সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন এবং কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং সমাবেশে তা ঘোষণা দেয়া। আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভোট প্রদান, আল্লাহর হুকুমে নয়। ভোট প্রদান যদি আল্লাহর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে কিংবা কোনো নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে হয় তবুও ভোট দেয়া। যেমন-ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা না করা অথবা লুটেরা উপনিবেশবাদীকে বহিষ্কার করা। কোনো তাওহীদবাদী দেশ যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর কোনো দেশ জয় করে, তাহলে এসব নাস্তিক, খোদাদ্রোহী দেশগুলোর পক্ষে থেকে ঐ মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য। কেননা এসব [জাতিসংঘভূক্ত] রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সীমারেখা একে দেয়া হয়েছে, তা সংরক্ষনে ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যের ক্ষেত্রে কাফের মুসলিম নির্বিশেষে সকলের অধিকার সমান। এ নীতিতে জিহাদ, জিজিয়া (কর) গনিমত এবং বন্দী সংক্রান্ত বিষয়ের কোনো অবকাশ নেই। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্যের জন্যই এ বিষয়গুলো অপরিহার্য। যে সদস্যই এর বিরোধিতা করবে তাকে বুঝতে হবে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। আর প্রকাশ্য কিংবা গোপনে যে কোনো অবস্থায় উপরোক্ত বিষয়গুলোতে সম্মতি জ্ঞাপন করার অর্থই হচ্ছে সুস্পষ্ট ভাবে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

মীরাসুল আম্বিয়া

বা

নবীদের উত্তরাধিকার

তৃতীয় প্রবন্ধ

৩য় সংস্করণ

বর্ধিত এবং সংশোধিত

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَـأْذَنْ بِهِ اللهُ
(الشورى : ٢١)

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন ঠিক করে দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি?"

[সুরা আশ-শুরা ঃ ২১]

www.pathagar.com

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম রাহমাতুললিল আলামীন হিসেবে প্রেরিত আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর ওপর, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবায়ে কেরামের ওপর। অতঃপর কথা হলো, এ প্রবন্ধটি হচ্ছে মূলতঃ ইসলামী উম্মাহর প্রজ্ঞা সম্পন্ন পূর্ব সূরীদেরকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে যারা ভুল বুঝেছে, তাদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞান গত জবাব, যার ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জ্ঞানগম্ভ আলাপচরিতার আদব বা শিষ্টাচার। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ ভাবে লোকেরা যেনো আইন প্রণয়নকারী বৈঠকগুলোর হাকিকত বা মৌলিকত্ব বুঝতে সক্ষম হয়। এমনি ভাবে এ প্রবন্ধের কথাগুলো ঐ সব লোকদের জন্য সুস্পষ্ট জবাব যারা আইন প্রণয়নকারী বৈঠকাদিতে যোগদান কে ইসলামেরই অংশ বলে মনে করে। এ চিন্তা ধারা লেখকদের মধ্যে আচ্ছাদিত হয়ে আছে । এর প্রমাণ (১) আইন প্রণয়নকারী বৈঠকাদিতে যোগদান করার বৈধতা " নামক বই এবং (২) মন্ত্রী পরিষদ এবং পার্লামেন্টারী বৈঠকাদিতে যোগদানের হুকুম নামক বই। বর্ণনা ও উপদেশ হিসেবে এ উদাহরণ পেশ করা হলো, কেননা সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে সত্য সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে এ বিষয়টি মানুষের রব আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত। তাওহীদই হচ্ছে মুসলমানের জ্ঞানের ভিত্তি। তাওহীদের ভিত্তিতে বান্দার সকল আমল কবুল হয়। তাওহীদ ঠিক না থাকলে তার সব আমলই ব্যর্থ। তাই এ প্রবন্ধে জবাবের ধরন হবে দু'রকমের।

একটি হচ্ছে ইজমালী বা সাধারণ জবাব, যা মানব স্বভাব ও প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আর একটি জবাব হচ্ছে বিস্তারিতভাবে লেখা, তাদের জন্য যারা এ বিষযে সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত।

প্রথমে ইজমালী বা সাধারণ জবাব ঃ

সুস্পষ্ট পদ্ধতি ও অতিসাধারণ উপমার মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর কর্ম আছে।

فهو الذى يخلقهم ويرزقهم ويميتهم ويحييهم ويدبر امرهم وينفعهم

ويضرهم ويصدر لهم الاحكام وهو المالك لكل شيئ سبحانه-

"তিনি বান্দাগণকে সৃষ্টি করেন, তাদের রিযিক দান করেন, তাদের মৃত্যু দেন। জীবন দান করেন, তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাদের কল্যাণ সাধন করেন, অকল্যাণ সাধন করেন, তাদের জন্য হুকুম জারি করেন, তিনিই সমস্ত কিছুর একমাত্র মালিক।"

একজন মুসলমান কখনো হালাল, হারামের বিধান এবং আইন প্রণয়ন ও আইন জারি সংক্রান্ত আল্লাহর কর্মের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেনা।

আল্লাহ তায়ালার তাহলীল বা হালাল সংক্রান্ত বিধান হচ্ছে বান্দার জন্য তিনি যে সব ভালো বিষয় বৈধ করে দিয়েছেন যেমন ঃ বিয়ে-শাদী, উত্তম খাদ্য ভক্ষন করা ইত্যাদি। তাহরীম অর্থাৎ হারাম সংক্রান্ত বিধান

www.pathagar.com

হচ্ছে যা তিনি বান্দার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। যেমন জ্বিনা, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি।

আল্লাহ তায়ালার আইন প্রণয়ন হচ্ছে, যে সব বিষয় তিনি তাঁর বান্দার জন্য বিধান হিসেবে জারি করেছেন। যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, অপরাধ সংক্রান্ত, এবং উত্তরাধিকার সক্রান্ত আইন বা বিধান।

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে কেউ আল্লাহর তায়ালার অংশীদার নয়। যদি ধরা যায় যে, দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এমন একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে যার কাছে ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে এবং আল্লাহর যে সব বিষয় হালাল, হারাম করেছেন সেই সব বিষয়ে হালাল হারামের বিধান প্রণয়ন করার অধিকার দেয়া হয়েছে, এ ছাড়া দুনিয়ার এমন সব বিষয়ে হালাল হারামের বিধান জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যা শরীয়তের দৃষ্টি কোন থেকে হালাল ও হারাম করার মধ্যে গণ্য হয় না, আর এ শক্তি বা ক্ষমতার নাম দেয়া হলো হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা। এমতাবস্থায় ইসলামী দাওয়া ও ইসলামের স্বার্থের কথা বলে এ ধরনের ক্ষমতা সম্পন্ন কতৃপক্ষের মধ্যে আমরা ঢুকতে পারবো? কোনো মানুষকে এ ধরনের পরিষদে যাওয়ার প্রার্থী হিসেবে বাছাই করা হবে? যে ব্যক্তি নিজেকে এ ধরনের পরিষদের প্রার্থী হিসেবে দাড় করালো, হালাল-হারাম করার পরিষদ নির্বাচনের জন্য যারা ভোট প্রদান করলো তাদের ব্যাপারে কি হুকুম, এর জবাব কি হবে, তা তাওহীদ বাদী প্রতিটি মুসলিম যে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্মার্থ জানে তার কাছে খুবই সুস্পষ্ট। প্রার্থী এবং ভোট প্রদান কারী উভয়েই বড় ধরনের শিরকের মধ্যে নিপতিত। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এর বিরোধিতা করতে পারে না। কেননা তাওহীদ শুদ্ধ এবং গ্রহণ যোগ্য হবেনা তিনটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত; আর বিষয় তিনটি হচ্ছে, আক্বীদা (বিশ্বাস) কথা এবং কাজ। ঈমান ও তাওহীদ কবুল হওয়ার এটাই হচ্ছে সালফে সালেহীনের (অর্থাৎ পূন্যবান পূর্ব সূরীদের) আক্বীদা। যদি একজন মানুষের নিয়ত এবং কথা ঠিক থাকে, কিন্তু কর্ম যদি নিয়ত এবং কথার পরিপন্থী হয় যেমন ঃ কর্মের বহ্যিক দিকটা যদি কথার পরিপন্থী হয় তাহলে তার কথা এবং নিয়ত কোনটাই উপকারে আসবেনা। শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) তাঁর কাশফুশ শুবহাত নামক পুস্তিকায় বলেন ঃ এতে কোনো মতভেদ নেই যে, তাওহীদ অবশ্যই অন্তর, জবান ও কর্মের মাধ্যমে হতে হবে। যদি এর কোনো একটিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকে তাহলে একজন মানুষ কখনো মুসলমান হতে পারবেনা।

আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ করাকে যারা বৈধ বলে, তাদের উদ্দেশ্যে জরুরী প্রশ্ন হচ্ছে হালাল হারামকারী পরিষদ আর ঐ আইন প্রণয়নকারী পরিষদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে যে পরিষদ বর্তমান রীতি ও আইন মোতাবেক মনে করে যে, পরিষদের সদস্যদের আইন বা বিধান প্রণয়ন করার প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার আছে, চাই সে আইন বা বিধান আল্লাহ যে বিষয়ে বিধান দিয়েছেন তার অন্তর্ভূক্ত হোক অথবা না হোক । কর্তৃপক্ষের কোনো সদস্য যদি এমন কোনো প্রস্তাব পেশ করে, যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার বিধান রয়েছে অতঃপর তা সংখ্যা গরিষ্ট রায়ের ভিত্তিতে আইন হিসাবে জারি করা হয়। তাহলে বিষয়টি শুধু আল্লাহর

www.pathagar.com

অধিকারের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন হয়নি বরং আল্লাহর আইনের উপরে রচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ط وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

"তারা কি দেখে না আমি কিভাবে তাদের দেশকে চারিদিক থেকে সংকুচিত করে আনছি। আল্লাহ শাসন ও ফয়সালা দান করেন, তাঁর ফয়সালার পুর্ণবিবেচনাকারী কেউ নেই। তিনি খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (রাদ ঃ ৪১)

এই ইজমালি (সাধারণ) জবাব, এ ধরণের শরীয়ত বিরোধী পরিষদে অংশ গ্রহণ করাকে যারা বৈধ মনে করে, তাদের বিপক্ষে এক বড় প্রমাণ। অতএব মানুষের উচিৎ এ সব কথাগুলো অনুধাবন করা এবং এর দ্বারা দলীল প্রমাণ পেশ করা যাতে আল্লাহর কাছ থেকে বিরুদ্ধবাদীরা যা করছে সে ব্যাপারে সে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত বিস্তারিত জবাব

একঃ আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ হারাম এবং শিরকের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার দলীলঃ

১ম দলিল ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ-

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন ঠিক করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি।"

(আশ-শুরা ঃ ২১)

নিঃসন্দেহে জ্বিনা, চুরি, মিথ্যা অপবাদ ও মদ্যপান ইত্যাদির শাস্তি প্রদান দ্বীনি দায়িত্ব পালনেরই অংশ। আর এসব বিষয়ই তারা [আল্লাহর বিধানের ওপর আইন প্রণয়নে বিশ্বাসী এ সব বিষয়ে] আইন প্রণয়ন করে। অথচ এগুলো এমন দ্বীনি বিষয় যেগুলোতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য বিধান রচনা করার বৈধ অধিকার নেই। অতএব যারা এসব বিষয়ে বিধান রচনা করার অধিকার রয়েছে বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তারা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর সাথে শিরককারী। অতএব এ ক্ষেত্রে নিয়ত এবং কথার প্রতি কোনো দৃষ্টি দেয়া হবে না। বলা হবে না যে, এ সব চেয়ারগুলো [যেখানে বসে আল্লাহর আইন থাকা সত্ত্বেও একই বিষয়ে আইন রচনা করা হয়] আহবানের মঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। আইন প্রণয়নকারীর চেয়ারে যেই বসবে সে রাজী থাকুক বা না থাকুক আইন প্রণয়নকারী হিসেবেই তার পরিচয়। সাংবিধানিক ধারা মোতাবেক সে আইন প্রণয়নকারী, এর ফলে সকল কতৃপক্ষই তার সাথে আইন প্রণয়নকারী হিসেবেই তার সাথে আচরণ করবে, শিরকী মাধ্যম শরীয়ত সম্মত নয়। মুসলমান হিসেবে এ ক্ষেত্রে আমাদের নীতি বলেঃ উদ্দেশ্য কখনো ওয়াসিলা বা মাধ্যমের সত্যতা প্রমাণ করে না। আর ওয়াসিলা

www.pathagar.com

(মাধ্যম) তাদের কাছে এমন শিরক যুক্ত, যা আল্লাহ তায়ালার কর্মের সাথে অন্যের সাদৃশ্য ও সমকক্ষতা প্রমাণ করে [যা শরীয়তে সম্পূর্নরূপে নিষিদ্ধ ।]

২য় দলীল ঃ এটা সকলের ভালভাবে জানা যে, আইন প্রণয়নকারী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ, ঝগড়া ও মতানৈক্য হলে তারা বিবাদপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা বা নিষ্পত্তি করার জন্য তাগুতের কাছে তথা সংবিধানের কাছে সোপর্দ করে। সংবিধানই হচ্ছে তাদের বিবাদের ফয়সালার মধ্যমনি এবং সংবিধান হচ্ছে তাদের সকল বিবাদপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসাকারী। এটা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী বিষয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (النساء ٦٠)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি , যারা দাবী করে যে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে গোমরাহীর চরমে নিয়ে যেতে চায়।" (আন নিসা ঃ ৬০)

আল্লামা শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-শাইখ তাঁর تيسير العزيز الحميد নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ তাগুতের কাছে কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালার জন্য না যাওয়া ফরজ। এ কথার দলিল এ আয়াতে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যাবে সে মুসলমানও নয় মোমিনও নয়।

আল্লামা শাইখ আস-সালাফী মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন আল-কাসেমী তাঁর محاسن التأويل নামক তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ-

"তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

(আন নিসা ঃ ৬০)

এখানে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা বলা হয়েছে আর তাগুতের প্রতি ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কুফরী করা। ঠিক যেমনি ভাবে তাগুতের প্রতি কুফরী করা মানেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার অর্থ যে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা এ প্রসংগে কতিপয় আলেমের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

৩য় দলীল ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً-

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং সে সব লোকদেরও আনুগত্য করো, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব সম্পন্ন। আর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে মীমাংসার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের নিকট প্রত্যার্পন করো যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই মঙ্গলজনক এবং পরিণতির দিক দিয়ে এটাই উত্তম।" (আন নিসা-৫৯)

ইমাম ইবনে কায়্যিম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ মানুষের মধ্যে বিবাদপূর্ণ সকল দ্বীনি বিষয়ের ফয়সালার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহর ও তাঁর রাসুলের কাছে প্রত্যার্পন করা যে ওয়াজিব তার অকাট্য দলিল হচ্ছে এ আয়াত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ছাড়া অন্য কারো নিকট তা প্রত্যার্পন করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রত্যার্পন করলে সে আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করলো। যে ব্যক্তিই বিরোধিতাপূর্ণ বিষয়ের বিচার-ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ব্যতীত অন্য কারো দিকে আহবান জানালো সে মুলতঃ জাহেলিয়াতের দিকে আহবান জানালো। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দারা বিরোধপূর্ণ বিষয়টিকে মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দিকে প্রত্যার্পন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দা ঈমানের আওতায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ-

"যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো।" একটি বিষয় আমরা আগেই আলোচনা করেছি তা হচ্ছে, শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তকৃত বিষয়ও পাওয়া যায় না। অতএব প্রমাণিত হলো যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (সঃ) বাদ দিয়ে অন্য কাউকে প্রত্যার্পন করলো, সে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমানের যে দাবী তা থেকে বের হয়ে গেলো। বর্ণনা ও সমাধানের দিক থেকে এ রক্ষাকারী ও অকাট্য আয়াতই যথেষ্ট। এটা অকাট্য হচ্ছে বিরোধিতাকারীদের ক্ষেত্রে, আর রক্ষাকারী হচ্ছে যারা এ আয়াতের নির্দেশাবলীকে মেনে চলে।

www.pathagar.com

হাফেজ ইবনে কাছীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ সমস্ত ঝগড়া এবং অজ্ঞতা জনিত বিবাদ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) কাছে প্রত্যার্পন করো এবং তোমাদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) কাছে নিয়ে যাও।

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ –

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলোর মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) কাছে প্রত্যার্পন না করলো, সে মূলতঃ আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে পারলো না।

৪র্থ দলীল ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আমরা যদি ধরে নেই যে, আইন প্রণয়নকারী পরিষদের কোনো একজন সদস্য এমন একটি প্রস্তাব পেশ করলেন, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কোনো একটি বিধানকে তিনি বাস্তবায়ন করতে চান। আর নিঃসন্দেহে তিনি এ বিধানটি আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্যদের সামনে ভোটের জন্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন। অতঃপর তার ওপর আলোচনা হবে এবং ফলাফল সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে হয়তো প্রস্তাবটি পাসও হতে পারে আবার নাকচও হতে পারে। যদি আইন প্রণয়ন পরিষদের কাছে উপস্থাপিত আল্লাহর আইন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে নিয়মানুযায়ী এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রস্তাবটি পুনরায় উপস্থাপন করা যাবে না। এমতাবস্থায় এ কুফরী কর্মের চেয়ে জঘণ্য আর কি কুফরী কর্ম হতে পারে? সমগ্র বিশ্বের প্রভূ, রাজাধিরাজ, মহাপ্রভূ আল্লাহ তায়ালার আইন বিবেচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে মানুষের কাছে। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর আইন কবুলকারী এবং প্রত্যাখ্যানকারী উভয়েই বিরাট বড় কুফরীতে নিপতিত হয়েছে। কবুলকারী কুফরীতে নিপতিত হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহর আইন বেছে নেয়ার জন্য বা বিবেচনার জন্য উপস্থাপনা করা হয়েছিলো [অথচ আল্লাহর আইন কখনো বিবেচনা করে কবুল বা প্রত্যাখ্যান করার বিষয় নয় বরং তা প্রয়োগ করাই হচ্ছে বান্দার ওপর ফরজ] আল্লাহর বিধানকে পরিষদে প্রস্তাব আকারে পেশ করার মাধ্যমে এবং আল্লাহর আইনকে বাছাই করার পথ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কুফরী করার পথকে সুগম করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা কুফরী। বিষয়টা ভাল করে অনুধাবন করার জন্য আমরা বলতে চাই, প্রস্তাব পেশকারী সদস্যের জন্য আইন প্রণয়নকারী পরিষদের কাছে ফরজ নামাজের রাকাত নির্ধারনের জন্য যেমন জোহরের নামাজ চার রাকাত নাকি তিন রাকাত অথবা আসরের নামাজ কি চার রাকাত নাকি পাঁচ রাকাত হবে এ প্রস্তাব আলোচনার জন্য পেশ করা হয়, অতঃপর তার চূড়ান্ত ফয়সালা যদি অধিকাংশ সদস্যের ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে হয়, তাহলে এ কাজটি কি জায়েয হবে? এটা আপনাদের কাছে কুফরী বলে গণ্য হবে? যদি জবাব হাঁ বোধক হয় তাহলে নামাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বিবেচনার জন্য আইন প্রণয়নকারী পরিষদের কাছে উপস্থাপন করলো তার মধ্যে আর যে যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সহ কেসাসের (হত্যার বদলে হত্যার) ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বিবেচনা করার জন্য পেশ করলো তার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

৫ম দলীল ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى-

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো সে এমন সুদৃঢ় হাতল (অবলম্বন) ধারণ করেছে যা কখনো ভাংবে না।" (আল বাকারাহ ঃ ২৫৬)

নিঃসন্দেহে এসব মানব রচিত বিধান এবং আল্লাহর আইনের পরিপন্থী সকল আইন কানুন তাগুতের অর্ন্তভূক্ত। কারণ এ আইনের মাধ্যমে আল্লাহর আইনের সীমা লংঘন করা হচ্ছে এবং এ আইনের কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালা নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এ আইন পৃথিবীতে এমন প্রতিমারূপ নিচ্ছে যার ইবাদত ও উপাসনা করা হয়।

আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তাকে বলে মাবুদ বা উপাস্য। এ ধরনের মাবূদ বা উপাস্যের সংখ্যা হচ্ছে **চার। যথাঃ সানাম (মূর্তি), ওয়াসান (প্রতিমা) ইলাহ** (আল্লাহ ছাড়া যাকে ইলাহ মনে করে ইবাদত করা হয়) ***রব*** (আল্লাহ ছাড়া যাকে রব মনে করা হয়) এ চার উপাস্য যখন একত্রিত হয় তখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার যখন তারা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন থাকে তখন অন্যদিক থেকে তাদের মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব তারা যখন বিচ্ছিন্ন ভাবে আসে তখন তাদের "কারণ" পর্যালোচনা করলে একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য পাওয়া যায় আর তা হচ্ছে তারা সকলেই (আল্লাহ ছাড়া) উপাস্য। তারা যখন একত্রে আসে তখন তাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন

সানাম (মূর্তি) হচ্ছে ঐ সব খোদাই করা অচেতন পদার্থ, যা মানুষ কিংবা কোনো পশু বা অন্য কোনো কিছুর আকৃতিতে তৈরী করে (আল্লাহকে বাদ দিয়ে) উপাসনা করা হয়।

ওয়াছান (প্রতিমা) হচ্ছে ঐ সমস্ত বস্তু আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়। চাই তা চেতন পদার্থ হোক অথবা অচেতন পর্দাথ হোক, খোদাইকৃত হোক অথবা না হোক। যেমন গাছ, পাথর, কবর, মানব রচিত সংবিধান এবং এ সাদৃশ্যপূর্ণ যা কিছু আছে। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসুল (সঃ) এর বাণী

اللهم لا تجعل قبرى و ثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياءهم مساجد (رواه مالك في موطئه)

"হে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে এমন প্রতিমাতে পরিনত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির ওপর আল্লাহর গজব তীব্র হয়েছে যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিনত করেছে (অর্থাৎ কবর উপাসনালয় বানিয়েছে (মুত্তয়াত্তা মালেক)

খোদাই করে নির্মিত মূর্তি "ওয়াসান " (আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়) হতে পারে। কারণ যে সব স্থবির ও অচেতন পদার্থের উপাসনা করা হয় সবই "ওয়াসান " এর অন্তর্ভূক্ত। প্রত্যেক মর্তি "ওয়াসান " কিন্তু

www.pathagar.com

প্রত্যেক "ওয়াসান " মূর্তি নাও হতে পারে। কেননা মূর্তি এবং অন্যান্য যে সব বস্তুকে আল্লাহ ব্যতিত ইবাদত করা হয় এর সবই ওয়াসানের অন্তর্ভূক্ত।

ইলাহ ঃ আল্লাহর উলুহিয়াতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ইবাদত যারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় তাকেই 'ইলাহ' বলা হয়। চাই তা জ্যান্ত মানুষ হোক, অথবা খোদাই করা অথবা অখোদাইকৃত কোনো অচেতন পদার্থ হোক। এর দলিল বা প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا–

"তারা বলে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদা সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নসরকে।" (নূহ ঃ২৩)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ –

"আল্লাহ তায়ালা যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়াম, তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো? ঈসা বলবেন আপনি পবিত্র।"
(আল মায়েদাহ ঃ ১১৬)

রব ঃ আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত কর্মসমূহের মধ্যে যে কোনো কর্ম যার দিকে সম্পৃক্ত করা হয় তাকে রব বলা হয় এর দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ–

"তারা তাদের পন্ডিত ও দরবেশদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে। এমনকি মরিয়াম তনয়কেও (রব বানিয়ে নিয়েছে) অথচ একমাত্র মাবুদের ইবাদত করার জন্য তারা আদিষ্ট ছিলো । তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তারা তাঁর সাথে যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি সম্পুর্ণ পবিত্র।" (আত তাওবাহ ঃ ৩১)

তাগুত ঃ মূর্তি, ওয়াসান, ইলাহ এবং রব সবই তাগুতের মধ্যে শামিল।

ইলাহ এবং রব থেকে ঐ সমস্ত আম্বিয়া কেরাম এবং পূর্ণ্যবান ব্যক্তিরাই ব্যতিক্রম, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইবাদত করা হয়। কিন্তু তারা এ ইবাদতে রাজি ও সন্তুষ্ট নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে যাদেরই ইবাদত করা হয় তারা যদি এ ইবাদত সন্তুষ্ট না হন বা রাজী না

www.pathagar.com

হন তাহলে তারা তাগুত হওয়ার অন্যায় এবং গুনাহ থেকে রেহাই পেলেন। আক্বীদাগত দিক থেকে, কথার দিক থেকে এবং আমলের দিক থেকেও তারা এ অন্যায় নিষ্কৃতি পেলেন। আল্লাহ ব্যতীত এসব মাবুদ বা উপাস্যগুলোর কথা যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, সকল মূর্তিই তাগুত এবং সকল আওসান বা প্রতিমাও তাগুত। অতএব ঐসব সংবিধান এবং বিধি-বিধান আওসান নামক তাগুতের মধ্যে শামিল যেগুলো আল্লাহ তায়ালার বিধানের পরিপন্থী, এবং বিচার-ফয়সালার জন্য ও এগুলোর কাছে মানুষ যায়। এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, যে ব্যক্তি তাগুতের সম্মান করার শপথ করেছে, সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারেনি। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করা তাওহীদের এমন একটি রুকন অর্থাৎ এমন একটি মৌলিক অপরিহার্য বিষয় যার দ্বারা একজন মানুষ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে মুসলমানে পরিণত হয়।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ বলেন ঃ এটা وَقَدْ أُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ এ আয়াতকেই নিশ্চিত করে কেননা তাগুতকে অস্বীকার করা তাওহীদের রুকন (অপরিহার্য মৌলিক বিষয়) । (সূরা বাকারার) একটি আয়তের ব্যাখ্যায় এ কথা এসেছে ঃ এ রুকন যদি অর্জিত না হয় তাহলে কেউ "মুওয়াহহিদ" (আল্লার একত্ববাদে বিশাসী) হতে পারবেনা (ফাতহুল মাজিদ ৩৪৫ পৃঃ)

www.pathagar.com

দুই ঃ আইন প্রণয়নকারী পরিষদে বসাকে যারা বৈধ মনে করে তাদের সংশয়ঃ

প্রথম সংশয় ঃ নাজ্জাসীর ঘটনাই হচ্ছে তাদের প্রমাণ مشروعية الدخول فى المجالس التشريعية [আইন প্রণয়নকারী পরিষদে প্রবেশ করার বৈধতা] নামক গ্রন্থের লিখক বলেন ঃ আইনের ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে অংশ গ্রহণ থেকে দূরে থাকা যদি ইসলামের অপরিহার্য বিষয় এবং কোনো শর্তের অন্তর্ভূক্ত হতো, তাহলে নাজ্জাসীর মৃত্যুর পর রাসূল (সঃ) সে যে ভাল মানুষ ছিলো তার স্বীকৃতিও দিতেন না এবং এ প্রশংসাও করতেন না।

জবাব ঃ এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই যে, সম্ভবতঃ লেখক এখানে ভুল করে ফেলেছেন। এটা ছাড়া তার আর কোনো অজুহাত নেই। কেননা লেখকের লেখা তাঁর দ্বীন সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞতার প্রমাণ পেশ করে। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কাফেরদের সাথে অংশ গ্রহণ পরিত্যাগ করা কিভাবে ঈমানের জন্য শর্ত আর ইসলামের জন্য অপরিহার্য না হতে পারে। অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন করে না তাদের ব্যাপারে কুরআনে কারীম কুফরী, জালেমী, এবং ফাসেকী বলে তাদের কর্মকে চিত্রিত করা হয়েছে। তাই আল্লাহর আইনের ব্যাপারে কাফেরদের সাথে অংশ গ্রহণ পরিত্যাগ করা কিভাবে ইসলামে অপরিহার্য বিষয় এবং শর্ত না হয়ে পারে? অথচ আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির ঈমানের দাবীকে অস্বীকার করেছেন, যে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়। তাই আইন রচনার ব্যাপারে কাফের সাথে অংশ গ্রহণের বিষয়টি পরিত্যাগ করা কিভাবে ইসলামের অপরিহার্য বিষয় ও শর্ত না হয়ে পারে? অথচ আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কাছ থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় সেই তাগুতের কাছ থেকে মুসলমানদের নিস্কৃতি ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তাই একজন মুসলমানের জন্য একটা আইন প্রণয়নকারী শক্তি বা কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য হওয়া জায়েয হতে পারে অথচ আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতিত যারা আইন প্রণয়ন করে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করে, এবং তারা নিজেদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে। একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী আইনের কাছে বিচার-ফয়সালার কাছে যাওয়া কি ভাবে জায়েয হতে পারে? অথচ আল্লাহ তায়ালা বিচার-ফায়সালা চাওয়ার বিষয়টি কে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেন। তাই বিচার-ফায়সালা চাওয়ার বিষয়টিকে যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে তাগুতের আইনের কাছে প্রত্যার্পন করবে সে মুশরিক এবং কাফের, চাই সে বিশ্বাস করুক বা না করুক, চাই সে বিষয়টি কে হালাল মনে করুক বা না করুক। কেননা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া বড় ধরনের কুফরী কাজ। আর বড় কুফরী কাজের জন্য ইসতিহলাল অর্থাৎ হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই বরং তাকে কাফের গণ্য করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ অস্বীকৃতি হবে অবশ্যই তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা না চাওয়ার মাধ্যমে। অতএব যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা

www.pathagar.com

চাইলো, সে তাগুতকে অস্বীকার করেনি। কেননা তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা না চাওয়াই হচ্ছে তাকে অস্বীকারের শর্ত। শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ (রহঃ) তাঁর তাইছিরুল আজীজিল হামীদ গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ এ আয়াতে এ প্রমাণ রয়েছে যে, কিতাব এবং সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা না চাওয়াই হচ্ছে ফরজ। এবং তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী মুমিনও নয় মুসলিমও নয়। শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বলেন তাগুতকে অস্বীকার করার প্রকৃতি হচ্ছে গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল বলে বিশ্বাস করা , গাইরুল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করা, এর প্রতি ঘৃনা পোষণ করা, গাইরুল্লাহর ইবাদত কারীরা কুফরী কর্মে লিপ্ত মনে করা এবং তাদের বিরোধিতা করা । (মাজমুআতে তাওহিদ রিসালাতে উলা)

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর ইবাদতকে বাতিল বলে বিশ্বাস করে অথচ তা পরিত্যাগ করতে পারেনা, তাহলে সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা। আবার যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর ইবাদত বাতিল বলে বিশ্বাস করলো অতঃপর তা পরিত্যাগ করলো, কিন্তু এর প্রতি মুহাব্বত থাকার কারণে এর প্রতি ঘৃনা প্রদর্শন করতে পারলোনা, তাহলে সেও তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলোনা।

শাইখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে বিচার চাইলো সে কাফের। (আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া ৪৭৬/১০ পৃঃ)

অতএব গ্রন্থকারের উচিৎ এ বিষয়ের জন্য তিনি যা মূল ভিত্তি হিসেবে দাড় করিয়েছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। কেননা তাঁর এ ধরনের কথা প্রচার হওয়ার ক্ষেত্রে তার ভাল উদ্দেশ্য আর পরিশুদ্ধ নিয়ত তার জন্য কোনো সুপারিশ করতে পারবেনা।

এ সব বাক্যগুলো তার পরিণতি নিয়ে আসতে এবং ফল দিতে শুরু করেছে। এ ফলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে কেউ কেউ ত্রুটিমুক্ত বিচার ও ফয়সালা প্রত্যক্ষ করছে, আবার কেউ কেউ লাহুকুক কলেজে পড়া শুনা করছে। এবং বিচার ও ওকালতিতে ঢুকে পড়ছে অথচ কোনো প্রকার অসুবিধা মনে করেনা।

হায়, আমি যদি জানতাম
ওটা কে করেছে বৈধ,
জাতিকে জড়িয়েছে মহা সংকটে
আর নিয়ে গেছে ধংসের দ্বার প্রান্ত
করেছে আঘাত,
হে মহা শক্তি ও নেয়ামতের আধার
তোমার কাছেই পেশ করি আমি
ইসলামের কঠিন পরীক্ষার
শেফায়েত ও অজুহাত।

www.pathagar.com

এর পর আল্লাহ তায়ালার মেহেরবাণীতে এ সন্দেহের জবাব আমরা এখনই দিচ্ছি, আমরা বলেতে চাই, প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

"আপনি বলুন তোমরা তোমাদের প্রমাণাদী নিয়ে এসো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও।"

কবী বলেন ঃ

দাবীদার যদি দাবীর পক্ষে
না দেয় কোনো প্রমাণ,
দাবীদার হবে নিছক দাবীদার
থাকবে না তার কোনো মান।

যে ব্যক্তি এই দাবী করে যে, নাজ্জাসী তাগুতের বিধানে বিচার-ফয়সালা করতো, তার একটি প্রমাণ অন্তত ঃ আপনারা নিয়ে আসুন, অথবা এর ওপর কোনো ঐকমত্য হয়ে থাকলে তাও নিয়ে আসুন, অথবা এমন কোনো নির্ভর যোগ্য তথ্য নিয়ে আসুন যার সূত্র ন্যায়ের যাত্রী সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পর্যন্ত পৌছেছে এবং যারা নাজ্জাসী সমকালীন থেকে বিষয়টি জানতে পেরেছে যে নাজ্জাসীর অবস্থা এমন ছিলো অথবা নাজ্জাসীর তার ইসলাম গ্রহণের পর অন্ততঃ একটি বারের জন্যও তাগুতের আইনে বিচার-ফয়সালা করেছে। এটা হচ্ছে একটি দিক।

দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে এইযে, নাজ্জাসীর ঘটনা থেকে প্রমাণ গ্রহণ করা মূলত ঃ কিয়াসের অন্তর্ভূক্ত। আর জানা মতে কেয়াস হচ্ছে, যে প্রাসংগিক বিষয়ে "নস" (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) আসেনি সে বিষয়কে যে বিষয়ে "নস" এসেছে এমন দুটি বিষয়ের কারণগত সামঞ্জস্য সৃষ্টি এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দূরীকরনের জন্য তার (যে বিষয়ে "নস" এসেছে) মূলের সাথে সম্পৃক্ত করা। কেয়াসের শর্ত হচ্ছে প্রাসংগিক বিষয়ে কোনো "নস" থাকবেনা। আল্লাহর বিধান বাতিল করে মানব রচিত বিধান দিয়ে তা পরিবর্তন করা কুফরী এ বিষযে বহু "নস" এসেছে। বরং আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধানের কাছে বিচার চাওয়াই হচ্ছে তাগুতী বিধানের কাছে বিচার প্রার্থনা করা এবং তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (النساء ٦٠)

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি , যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে। তারা বিচার-ফয়সালাকে তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে গোমরাহীর চরমে নিয়ে যেতে চায়।" (আন নিসা ঃ ৬০)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল্ শাইখ (রহঃ) বলেন ঃ ওটাই হচ্ছে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়া এবং তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা (ফাতহুল মাজীদ বাবে কাওলিহি তায়ালা)

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান আস সা'দী (রহঃ)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا-

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং সে সব লোকদেরও আনুগত্য করো, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব সম্পন্ন। আর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে মীমাংসার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিকট প্রত্যার্পন করো যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই মঙ্গলজনক এবং পরিণতির দিক দিয়ে এটাই উত্তম।" (আন নিসা-৫৯)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ এ আয়াত এটাই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি বিবাদপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা ও ফয়সালার জন্য বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) কাছে প্রত্যার্পন করতে পারেনা সে প্রকৃত পক্ষে মুমিন নয়। বরং সে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করে যেমনটি এর পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে । (তাইসিরুল কারিম আররাহমান ফি তাফসীরে কালামিল মান্নান ৩৯৭/১)

অতএব "নস" পাওয়া যাওয়া সত্বেও আমরা কিভাবে "কেয়াস" করবো? এ ক্ষেত্রে মৌলিক নীতির বক্তব্য হচ্ছে "নস" এর বিপরীতে "কেয়াস" বাতিল। এটি একটি দিক।

অন্য দিকটি হচ্ছে : কেয়াসের শর্ত হচ্ছে মূল এবং শাখা, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী থাকবে না। এখানে মূল ধরা হয়েছে " নাজ্জাসীর কর্মকে"। আর শাখা বা প্রাসংগিক বিষয় ধরা হয়েছে সেই আইন রচনাকারী পরিষদে যোগদান করাকে যেখানে আল্লাহর শরীয়তকে অকার্যকর করে গাইরুল্লাহর শরীয়তের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়া হয়। তারা বলেন: নাজ্জাসী রাজা হয়ে শরীয়তে মুহাম্মদী অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা বা শাসন করেনি একটি (বিশেষ) স্বার্থের জন্য আমরাও নাজ্জাসীর ওপর কিয়াস করে বর্তমান পার্লামেন্টে যোগদান করি এবং অংশ গ্রহণ করি।

www.pathagar.com

এর জবাবে আমরা বলতে চাই : যখন আমরা এ কথা জানতে পারলাম যে, শুদ্ধ কেয়াসের জন্য অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে, মূল এবং শাখার মধ্যে কোনো পার্থক্যকারী থাকবে না, তখন এটাও জেনে নিলাম যে দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী পাওয়া যাওয়ার কারণে কিয়াস বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

প্রথম পার্থক্যকারী বিষয় ঃ নাজ্জাসী মারা গিয়াছিলো ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে। (ইসলামের সকল বিষয় নাযিল হওয়ার পূর্বে এবং

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (আল মায়েদা -৩)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে। হিজরী দশম সনে বিদায় হজ্জের সময় এ আয়াত নাযিল হয়েছে। অথচ নাজ্জাসীর মৃত্যু হয়েছে মক্কা বিজয়ের অনেক আগে। এতে প্রমাণিত হয় যে নাজ্জাসীর শাসনামলে ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধান তখনো পুরোপুরি নাযিল হয়নি। সুরা মায়েদা থেকে আরো দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। এ সুরাটির মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান অনেক বেশী । এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা ফয়সালা দিয়েছেন যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন করে না তারা কাফের। এ সংক্রান্ত আয়াত নাজ্জাসীর মৃত্যুর পর নাযিল হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো বর্ণনায় এটি হচ্ছে নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরা। এ তথ্য দ্বারা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হলো যে নাজ্জাসীর মৃত্যুর পরই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। অতএব কোন্ যুক্তিতে ইসালামী শরীয়তের পূর্ণতা লাভের আগেই যে নাজ্জাসী মারা গেলো তার অবস্থাকে বর্তমান সময়ে যখন ইসলামী শরীয়ত পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে তখনকার পার্লামেন্ট সদস্যদের অবস্থার সাথে তুলনা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পার্থক্যকারী ঃ পৃথিবীর রাজা বাদশাদের নিকট যখন রাসুল (সঃ) ইসলামী শরীয়া মোতাবেক দেশ পরিচালনা অথবা জিজিয়া প্রদানের জন্য চিঠি লিখেছিলেন, এর পূর্বেই নাজ্জাসীর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত হাদীসের গ্রন্থ ছহী মুসলিম শরীফের জিহাদ অধ্যায়ের 'কাফের রাজা বাদশাহদের নিকট ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে রাসুল (সঃ) এর চিঠি' অনুচ্ছেদে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল (সঃ) রোম পারস্যের বাদশাহ, নাজ্জাসী এবং প্রত্যেক অত্যাচারী বাদশাহর নিকট ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। তবে ঐ নাজ্জাসীর নিকট চিঠি লিখেন যার (গায়েবী) জানাযা রাসুল (সঃ) পড়িয়েছিলেন।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) যাদুল মাআদ কিতাবের ৩/৬৯০ পৃষ্ঠায় রাসুল (সঃ) এর প্রতি নাজ্জাসীর চিঠির কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ বিষয়টি আল্লাহই ভাল জানেন, নাজ্জাসীর বিষয় বর্ণনাকারী ব্যক্তি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে, যে নাজ্জাসীর জানাযার নামাজ রাসুল (সঃ) পড়িয়েছিল, তিনি রাসুল (সঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে খুব সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন তার মধ্যে, আর যে নাজ্জাসীকে ইসলামের

www.pathagar.com

দিকে আহবান জানিয়েছিলেন তার মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে নাজ্জাসী দু'জন ছিলো। ছহীহ মুসলিম গ্রন্থে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, রাসুল (সঃ) নাজ্জাসীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ঐ নাজ্জাসীর কাছে চিঠি পাঠাননি যার জানাযার নামাজ তিনি পড়িয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে কাসীর আল বেদায়া ওয়ান্নেহায়াতে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়ে পৃথিবীর রাজা বাদশাহদের নিকট রাসুল (সঃ) এর চিঠি প্রেরণের রীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন যে, এ ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে হুদাইবিয়ার পরে সংঘঠিত হয়েছিলো। আর ইমাম বায়হাকী এ অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন "মওতার" যুদ্ধের পর। এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে উক্ত ঘটনা শুরু হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং আবু সুফইয়ানের কথানুযায়ী হুদাইবিয়ার পর। হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলো সে কি গাদ্দারী বা বিশ্বাস ঘাতকতা করে? জবাবে আবু সুফইয়ান বলেছিলো ! না। আমরা তাকে দীর্ঘ সময় থেকেই জানি। এর মধ্যে সে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এমন কথা আমাদের জানা নেই। বুখারীতে এসেছে এটা সেই সময়ের কথা যে সময়ে আবু সুফইয়ান রাসুল (সঃ) এর সহযোগিতা করেছে। অতঃপর এ হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি বলেন রাসুল (সঃ) নাজ্জাসীর কাছে চিঠি লিখেছেন, তবে এ নাজ্জাসী সেই নাজ্জাসী নয় যার জানাযার নামাজ তিনি পড়িয়েছেন।

তৃতীয় পার্থক্যকারীঃ নাজ্জাসী এমন শরীয়তের অনুসারী ছিলো যার অনেক আইন-কানুন তখনো পরিবর্তিত হয়নি । আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَ كَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللهِ-

"তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে? অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে ।"

(আল মায়েদা ঃ ৪৩)

আইন প্রণয়ন ও রচনাকারী পরিষদের সদস্যরা ওরকম নয় অর্থাৎ এর আওতাভূক্ত নয়। এ তিনটি পার্থক্যকারী বিষয়ের যে কোনো একটি পাওয়া গেলেই "কেয়াস" বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর যদি উল্লেখিত তিনটি পার্থক্যকারী বিষয়ই পাওয়া যায় তাহলে নিঃসন্দেহে "কেয়াস" বাতিল।

<u>তৃতীয় দিকঃ</u> আমরা বলতে চাই, নিঃসন্দেহ নাজ্জাসী (রাঃ) এমন একটি পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো যার অবস্থান ছিলো জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বলেন যে, যে ব্যক্তি এমন দূরাবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ব্যাপারে এমন বহু বিষয়ই ওযর (অজুহাত) হিসেবে গ্রহণযোগ্য যা অন্যের ব্যাপারে গ্রহণ যোগ্য নয়। এমনিভাবে বর্তমান যুগের মত ঐ সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা উন্নত ছিলোনা। তাই শরীয়তের বিধি বিধান কোনো ব্যক্তির কাছে পৌছতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতো। এমনকি কোনো কোনো সময় এমনও হতো যে লোকটি মারা গিয়েছে অথচ তখনো তার কাছে শরীয়তের বিধান পৌছেনি। এ ব্যাপারে একটি উপমা গ্রহণ করুন। আর তা হচ্ছে এই যে,

www.pathagar.com

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূল (সঃ) কে নামাজরত অবস্থায় সালাম দিতাম পরে যখন আমরা নাজ্জাসীর কাছ থেকে ফিরে এলাম এবং নামাজরত অবস্থায় সালাম করলাম তখন আর তিনি নামাজে সালামের জবাব দেননি। পরে তিনি বললেন ঃ নামাজে কাজ আছে (অর্থাৎ নামাজের নির্ধারিত কাজ আছে, সালামের জবাব দেয়ার মতো কোনো সুযোগ নেই)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর মতো একজন বিজ্ঞ মর্যাদাবান আলেম সাহাবীর কাছেই যদি নামাজের মধ্যে কথা ও সালাম বিনিময় রহিত হওয়ার খবরটি পৌছে না থাকে, অথচ নামাজের বিষয়টি দিনে ও রাত্রে পাঁচবার হওয়ার কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য। তাহলে শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের কথা মানুষের কাছে না পৌছা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই যে ব্যক্তি আরবী জানে না, আর রাসুল (সঃ) এর সাহচার্যও পায়নি তার ব্যাপারে ওযর বা অজুহাত গ্রহণ করা অধিক যুক্তি সংগত।

চতুর্থ দিক ঃ এ ধরনের অস্পষ্ট বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ অস্পষ্ট বিষয় বাদ দিয়ে "মুহকাম" সুস্পষ্ট বিষয়কে অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রমাণ সম্বলিত যে সব বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো এগুলো মুহকাম বা (সুস্পষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত) তাই আমরা অবাক হচ্ছি এ জন্য যে, তারা (কুরআন ও সুন্নাহর) সুস্পষ্ট "নস" (বক্তব্য উদ্ধৃতি) থাকা সত্ত্বেও অস্পষ্টতা ও কল্পণা প্রসূত প্রমাণাদির দিকে গিয়েছে।

ইমাম তাবারী তাঁর তাফছীর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ-

"তিনিই (আল্লাহ) তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে আয়াত মুহকামাত (সহজবোধ্য), যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

'মুহকামাত' হচ্ছে ঐসব আয়াত , যে গুলো অন্য আয়াতকে রহিতকারী ও যে গুলোতে রয়েছে হালাল ও হারামের বিধান, শরীয়তের সীমারেখা, ফরজ সমূহের বিবরণ রয়েছে। যেগুলোর প্রতি ঈমান আনা যায় এবং আমল করা যায়। وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ আর মুতাশারিহাত হচ্ছে ঐ সব আয়াত যেগুলো অস্পষ্ট, যে গুলোকে রহিত করা হয়েছে। এর প্রারম্ভিক এবং শেষ, এর মতো, এবং যত শ্রেণী এবং যা শুধু বিশ্বাসই করা যায় কিন্তু তা দ্বারা আমল করা যায়না।

নাজ্জাসী সম্পর্কিত ঘটনার হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। এ রহিত করণের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত রাজা বাদশাদের কাছে রাসুল (সঃ) এর চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে যাতে তারা ইসলামী আইনে শাসন করে এবং জিজিয়া (কর) আদায় করে। আর এটা হয়েছিলো নাজ্জাসীর মৃত্যুর পর। এর প্রমাণ ইতিপূর্বে পেশকৃত মুসলিমের বর্ণনাকৃত হাদীস, যাতে বর্ণিত আছে যে রাসুল (সঃ) নাজ্জাসীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তবে এ নাজ্জাসী ঐ নাজ্জাসী ছিলোনা যার জানাযার নামাজ তিনি পড়িয়েছিলেন।

www.pathagar.com

৫ম দিক ঃ গাইরুল্লাহর আইনে যে ব্যক্তি শাসন করে আপনাদের কাছে তার সর্ব নিম্ন অবস্থা হচ্ছে এই যে, শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে সে জালেম, ফাসেক, পাপীষ্ঠ এবং যারা তাগুতী বিধানে শাসন করে তাদের প্রত্যেকের পাপের ভাগ তাকে নিতে হবে। সে তার এ অপকর্মের দ্বারা ঐ ব্যক্তির মতো হলো, যে ব্যক্তি কবর তৈরী করে তাওয়াফের মতো ইবাদতে মানুষকে লাগিয়ে দিলো, যে তওয়াফ একমাত্র আল্লাহর ঘর ছাড়া আর কোথাও করা যায়না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের দিকে বিচার-ফয়সালা প্রত্যার্পন করতে বাধা প্রদান করে, আর তাগুতী আইনে বিচার-ফয়সালা করতে মানুষকে বাধ্য করে, আর যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা যায়না, সে ইবাদত এসব তাগুতের জন্য নিবেদন করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি এ কর্মের দ্বারা ফাসেক, জালেম ও পাপীষ্ঠে পরিণত হয়েছে। এটাই হচ্ছে আপনাদের কাছে তাদের সর্বনিম্ন অবস্থা। তাই আমরা বলতে চাই যে নাজ্জাসী (রাঃ) এ অবস্থায় ও এ ধরনের গুণবিশিষ্ট হয়ে পূর্বে উল্লিখিত পাপীষ্টের পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে অথচ রাসূল (সঃ) নেককার বান্দা বলে তাকে প্রশংসা করেছেন। তাহলে নিঃসন্দেহ বলা যায়, তাদের কথা ঠিক নয় বরং বাতিল । কেননা নাজ্জাসী "তাওরাতের" বিধান অনুসারী ছিলেন। তিনি তাগুতী বিধানের অনুসারী ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব তথা আল কুরআনে তাঁর (নাজ্জাসী) এবং তার সত্যানুসারী সাথী সঙ্গীদের প্রশংসা করেছেন।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ-

"মানুষের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী শত্রুতা আপনি দেখতে পাবেন ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার দিক থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী পাবেন তাদেরকে যারা বলেছিলোঃ আমরা খ্রীষ্টান এটা এ জন্য যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ বর্তমান আছে। তাদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকা বোধ নেই।" (আল মায়েদাহ ঃ ৮২)

আমরা মনে করি । নিম্নোক্ত আয়াতগুলো যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য তাদের মধ্যে নাজ্জাসী ও রয়েছেন। আয়াতগুলো হচ্ছে ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى ج وَّ نُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ-

www.pathagar.com

"আমি তওরাত নাযিল করেছি। যাতে রয়েছে হেদায়াত ও আলো। আল্লাহর অজ্ঞাবহ নবী, দরবেশ ও আলেমগন এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষনা-বেক্ষনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, আর তাঁরা ছিলো এর সাক্ষী । অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করোনা, আমাকে ভয় করো। আর আমার আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করোনা। যে সব লোক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করেনা তারাই কাফের"। (আল মায়েদাহ ঃ ৪৪)

এ প্রতিবেদনের পর আপনার কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে। এবং দুটি অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা পরিস্কার হয়েছে। অর্থাৎ নাজ্জাসীর অবস্থা আর যে ব্যক্তি আইন রচনাকারী পরিষদের সদস্য তার অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য তা সুস্পষ্ট হয়েছে। নাজ্জাসীর কাহিনীতে অবস্থা ছিলো এমন এক রাজার, যে ছিলো কাফের, সে ঈমানের প্রতি আহবান কারীর আহবানে সাড়া দিয়ে ঈমান গ্রহণ করলো, ঈমানের কাছে আত্মসমর্পন করলো, অন্তর দিয়ে সবকিছু মেনে নিলো, যতটুকু সত্য তার কাছে পৌছলো ততটুকু প্রতিষ্ঠা করলো, তার সাধ্য মতো সত্যকে সাহায্য করলো দ্বীনের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিতে তার আগ্রহ প্রকাশ করলো, তার রাজ্যে অনৈসলামি কর্মকান্ড যা ছিলো সব পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলো, আল্লাহর পথে হিজরত করার জন্য সে প্রস্তুত ছিলো এবং দ্বীনের বিরোধী সব কিছু থেকে মুক্ত বলে ঘোষনা করলো, কিন্তু ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই তার জীবন প্রদীপ নিভে গেলো।

পক্ষান্তরে আরেকটি অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। তারা ছিলো এমন এক কওম যা করতে তাদেরকে নির্দেশ দেননি, তারা তাই করলো, আবার যা করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করলো, তাও তারা করলো, যাবতীয় অবৈধ পন্থা তারা গ্রহণ করলো, শিরককে তারা তাওহীদের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলো, আর নাফরমানী বেছে নিলো আনুগত্যের পথ হিসেবে। তাদের এ অবস্থা হয়েছিলো ইসলামী শরীয়তের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও সত্য প্রকাশের পর।

তাহলে উপরোল্লেখিত একটি অবস্থাকে অপর অবস্থার উপরে কিয়াস করা কিভাবে সম্ভব? অথচ দুটি অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়ে গেছে। মূলনীতি বলে যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলে সে অবস্থায় কিয়াস বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ মূল কাহিনী দ্বারা কিভাবে প্রমাণ পেশ করা যাবে, যাতে অন্যকিছু প্রবৃষ্ট হওয়ার বহু সম্ভাবনা রয়েছে? মূলনীতি বলে যে,দলীলের মধ্যে যখন অন্যকিছু প্রবৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন তা বাতিল হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় সংশয় ঃ আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ) 'কর্ম' দ্বারা তারা প্রমাণ পেশ করে। তারা বলে ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) কুফরী নীতির অধীনে ধন-সম্পদ ও অর্থ বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অতএব আমাদের জন্য এসব আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ করা জায়েয। বিভিন্ন দিক থেকে এর জবাব ঃ

www.pathagar.com

প্রথম দিক ঃ তারা " নস " এর ওপর কিয়াসকে পেশ করেছে। কিয়াস মূলতঃ ইজতিহাদ (কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বা ফয়সালা না থাকলে চিন্তা ভাবনা করে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী নয় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা) আর "নস " (কুরআন সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য) কোনো বিষয়ে পাওয়া গেলে ঐ বিষয়ে ইজতিহাদের কোনো প্রয়োজন নেই। ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) 'আস্‌সাওয়ারিক আল-মুরসালা' নামক গ্রন্থে বলেন ঃ কিয়াস যদি "নস " এর সাথে সাংঘর্ষিক ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তাহলে কিয়াস বাতিল বলে গণ্য হবে। আর এ কিয়াসকে ইবলিসী কিয়াস নামে অভিহিত করা হবে। কেননা এ কিয়াসের মাধ্যমে বাতিল দ্বারা হকের বিরোধীতা করা হয়। এ জন্যই এর শাস্তির পরিণতি হচ্ছে এই যে, তার আকল (জ্ঞান বৃদ্ধি) বিঘড়ে যায় তার দুনিয়া ও আখেরাত নষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তিই তার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে 'অহি " এর মোকাবেলা করবে আল্লাহর তায়ালা তার আকলকে (জ্ঞান বুদ্ধিকে) বিগড়িয়ে দিবেন, যার ফলে সমস্ত জ্ঞানীরা হাসবে।

দ্বিতীয় দিক ঃ কিয়াসের জন্য অবশ্যই কিছু শর্ত থাকতে হবে। শর্তের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আসল (মূল) এবং শাখার মধ্যে কোনো পার্থক্যকারী বিষয় থাকতে পারবে না। তাহলে কিয়াস শুদ্ধ হবে। তা না হলে কিয়াস বাতিল বলে গণ্য হবে, যার নাম "কিয়াস মাআল.ফারেক"। এখানে পার্থক্যকারী বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

এক ঃ পরিষদের প্রকৃতি বা ধরণ ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কাজ ছিলো মানবীয়। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ-

"বাদশাহ বললো ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখবো। অতঃপর তার সাথে মতবিনিময় করলো তখন বললো ঃ নিশ্চয় আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।" (ইউসুফ ঃ ৫৪)

আর আইন প্রণয়নকারী পরিষদের সদস্যদের বিষয়টি হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে, আর বিধান-দাতা হিসেবে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে। কেননা তাদের প্রতি আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, অধিকার একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত আর কারো নেই, তারা এ জঘন্য কর্ম থেকে মুক্তিও নেয়নি, তা পরিত্যাগও করেনি। এর প্রমাণ হচ্ছে তাদের সাংবিধানিক ধারা। যে ধারার বক্তব্য হচ্ছেঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করবেন সংবিধান অনুযায়ী আমীর এবং জাতীয় সংসদ। এমনিভাবে আরেকটি ধারার বক্তব্য ঃ রাষ্ট্রের শাসননীতি হবে গণতান্ত্রিক । সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছে জাতি। আর জাতিই হচ্ছে সকল ক্ষমতা উৎস।

দুই ঃ আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন করা ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

كَذٰلِكَ كِـدْنَا لِيُـوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِى دِيْـنِ الْمَلِكِ-

"এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছি। সে বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনো নিতে পারতো না।" (ইউসুফ ঃ ৭৬)

মুফাসসিরগণ বলেন ঃ অর্থাৎ মিশরের রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী তার [ইউসুফ (আঃ)]-এর ভাই বিনয়ামিনকে রেখে দেয়া ঠিক ছিলো না। বরং তিনি তাঁর ভাইকে রেখে দিয়েছিলেন আল্লাহর বিধান মোতাবেক। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর শরীয়ত ছিলো চোরকে চুরিকৃত মালের মালিকের কাছে সমর্পণ করা এবং চুরির শাস্তি হিসেবে এক বছর কাল মালিকের গোলাম হিসেবে চোরের বন্দী জীবন কাটানো । আর আইন প্রণয়নকারী পরিষদের সদস্যদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা গাইরুল্লাহর বিধানের দিকে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায় এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহর আইনকে বাছাই করার ক্ষততা ও সুযোগ দানের মাধ্যমে। এর প্রমাণ হচ্ছে সেই সাংবিধানিক ধারা, যাতে বলা হয়েছে ঃ জাতীয় সংসদের বৈঠক বৈধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে অর্ধেকের বেশী সদস্যের উপস্থিতি। আর সিদ্ধান্তসমূহ জারি হবে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ রায় ও মতামতের ভিত্তিতে। এবং সেই ধারাও এর প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখযোগ্য, যাতে বলা হয়েছেঃ জাতীয় সংসদ সদস্যের আইন ও বিধান প্রস্তাব করার অধিকার আছে এবং প্রতিটি আইন বিল কোনো সদস্যকর্তৃক উত্থাপিত হওয়ার পর সংসদ কর্তৃক যদি তা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে উক্ত বিল দ্বিতীয়বার একই সেশনে পেশ করা বৈধ হবে না। ১০ নম্বর ধারার বক্তব্য হচ্ছেঃ জাতীয় সংসদ সদস্য পরিষদের কাছে অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছে তার কাছে উদিত যে কোনো মতামত এবং চিন্তা ধারা প্রকাশ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো অবস্থাতেই এর জন্য তাকে জবাব দিহি করা যাবে না।

তিন ঃ পবিত্র ও মুক্ত থাকা ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের সকল মূর্তি প্রতিমা এবং উপাস্য মুক্ত ছিলেন। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّايُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ
اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْئٍ ط ذٰلِكَ مِنْ
فَضْلِ اللهِ عَلَيْـنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْـكُرُوْنَ يٰـصَاحِبَىِ
السِّـجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْـبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ
اِلَّآ اَسْمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰـنٍ ط اِنِ الْحُـكْمُ
اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ

"আমি ঐ সব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং পরকালে তারা অবিশ্বাসী। আমি আপন পিতৃ পুরুষ

www.pathagar.com

ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। কোনো বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করা আমাদের জন্য শোভা পায়না। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্যসব লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অনুগ্রহের কথা স্বীকার করেনা। হে কারাগারের সঙ্গীরা। পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত করছো, সেগুলো তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছো। আল্লাহ এ গুলোর কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার অধিকার নেই। তিনি নির্দেশ নিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করোনা। এটাই সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

(ইউসূফ ঃ ৩৭-৪০)

আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের অবস্থা হচ্ছে এই যে তারা তাদের মূর্তি, তাদের প্রতিমা, তাদের উপাস্য, তাদের তাগুত এবং তাদের সংবিধানকে সম্মান করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছে এর প্রমাণ একটি সাংবিধানিক ধারা, যাতে বলা হয়েছে ঃ জাতীয় সংসদের সদস্য তার সংশ্লিষ্ট পরিষদ ও কমিটির কর্মভার গ্রহণ করার পূর্বে একটি প্রকাশ্য অধিবেশনে পরিষদের সামনে নিম্মোক্ত শপথ বাক্য পাঠ করবেন ঃ আমি মহান আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, আমি আমার দেশ ও আমীরের প্রতি একনিষ্ঠ হবো। আমি সংবিধান ও রাষ্ট্রের আইন কানুনকে শ্রদ্ধা করবো। আমি জনগনের স্বাধীনতা, তাদের স্বার্থ এবং তাদের সম্পদ রক্ষা করবো। আমি আমার দায়িত্ব আমানতদারী এবং সততার সাথে আদায় করবো।

চার ঃ

শক্তি ও স্থিরতার মাধ্যম ঃ হযরত ইউসূফ (আঃ) শক্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিলেন মু'জেযার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لا لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ج فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ-

"হে ইউসূফ, হে সত্যবাদী! সাতটি জীর্ণ-শীর্ণ গাভী, সাতটি মোটা তাজা গাভীকে খাচ্ছে, আর সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যান্যগুলো শুস্ক, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিন যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে অবগত করাতে পারি। সে বললো ঃ তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা ফসল তোমরা কাটবে তা থেকে অল্প কিছু যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজন-বের

www.pathagar.com

করে নিবে। আর বাকীগুলোকে তাদের গুচ্ছসহ রেখে দিবে। এরপর সাতটি বছর খুব কঠিন আসবে। এসময়ের জন্য তোমরা সে সব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা থেকে খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমান ব্যতীত যা তোমরা তুলে রাখবে, এর পরই একটি বছর, তখন রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে।" (ইউসূফ ঃ ৪৬-৪৯)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ج فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ ج اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ج يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ط نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"বাদশাহ বললো ঃ তাকে কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখবো। অতঃপর যখন তার সাথে মত বিনিময় করলো, তখন বললোঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। ইউসুফ বললো, আমাকে দেশের ধন- ভান্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। এমনি ভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিলো। বস্তুতঃ আমি আমার রহমতের সাহায্যে যাকে ইচ্ছা ধন্য করে দেই। পূণ্যবাণ লোকদের কর্মফল কখনোই আমার কাছে নষ্ট হয় না।"

(ইউসুফ ঃ ৫৪-৫৬)

এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নকারী পরিষদের সদস্যদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের কাছে শক্তি ও স্থিতিশীলতার মাধ্যম হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জামায়াতের মধ্যে নির্বাচন। এটি মূলতঃ জাহেলী নিয়ম-নীতি। এর প্রমাণ হচ্ছে একটি সাংবিধানিক ধারা, যার বক্তব্য হচ্ছেঃ জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে ৫০ জন সদস্যকে নিয়ে, যারা সরাসরি গোপন সাধারণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। এটা অবশ্যই সেই বিধান অনুযায়ী হতে হবে যা নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিতে লেখা আছে।

পাচ ঃ সিদ্ধান্ত জারী করাঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) যে মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত জারি করেছিলেন তার সদস্য তিনি একাই ছিলেন। এর প্রশাসন হচ্ছে আল্লাহর তায়ালার বাণীঃ

وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ج فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ-

"বাদশাহ বললো ঃ তাকে কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখবো। অতঃপর যখন তার সাথে মত বিনিময় করলো, তখন বললোঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।" (ইউসুফ ঃ ৫৪)

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নকারী পরিষদের সদস্যদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের কাছে পঞ্চাশটি মস্তিষ্কের পঞ্চাশটি দৃষ্টি ভঙ্গি। এর প্রশাসন হচ্ছে সেই সাংবিধানিক ধারা, যার বক্তব্য হচ্ছে ঃ জাতীয় পরিষদের বৈঠক সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজন পরিষদের অর্ধেকের বেশী সদস্যের উপস্থিতি। আর সিদ্ধান্ত জারি হবে উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের রায় ও মতামতের ভিত্তিতে।

মুসলমানের একথা জেনে রাখা উচিৎ যে, উপরোল্লিখিত ৫টি পার্থক্যকারী বিষয়ের যে কোনো একটি পাওয়া গেলেই কিয়াস বাতিল বলার জন্য যথেষ্ট। আর যদি ৫টি পার্থক্যকারী বিষয় পাওয়া যায় তাহলে নিঃসন্দেহে এটি (কেয়াস মাআল ফারিগ হওয়ার কারণে) বাতিল কেয়াস বলে গণ্য হবে।

৩য় সংশয় ঃ তারা বলে আমরা আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ করি স্বার্থরক্ষা করার জন্য, অসুবিধা দুর করার জন্য এবং বাতিল পন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য।

জবাব ঃ আমরা বলবো ঃ নিঃসন্দেহে এটি মহৎ উদ্দেশ্য, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হচ্ছে শরীয়ত পরিপন্থী। মুসলমান হিসেবে আমাদের নীতির বক্তব্য, উদ্দেশ্য ও মাধ্যমের সততার প্রমাণ পেশ করে না। তোমাদের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হচ্ছে শিরক এবং বিদআত মিশ্রিত যা আল্লাহ তায়ালার কর্মকে অস্বীকার করে।

আল্লাহর সাথে শিরক এবং কুফরী করা যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়, এ ব্যাপারে তাওহীদবাদী কোনো মুসলমানেরই সন্দেহ নেই। তাই শিরকী এবং কুফরীর চেয়ে বড় গুণাহও নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করলে তা মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলো, সে বিরাট মিথ্যা রচনা করলো এবং কঠিন গুনাহর কাজ করলো।" (আন নিসা ঃ ৪৮)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ অহী নাযিল হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেন , তাহলে আপনার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।" (আযঝুমার ঃ৬৫)

www.pathagar.com

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

"তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম তনয় মসীহ-ই আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেন; হে বনী ইসরাইল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" (মায়েদাহ ঃ ৭২)

মানুষ নিজেকে আল্লাহর সাথে আইন প্রণয়নকারী বানানো (সাব্যস্ত) করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। এরফলে সে আইন প্রণয়নকারীর চেয়ারে বসে এবং আইন প্রণয়নকারীর পদবী গ্রহণ করে। তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া শিরকের অন্তর্ভূক্ত। বিচার-ফয়সালা চাওয়া বান্দার ইবাদত সংক্রান্ত কর্ম যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্য নিবেদন করা যায় না।যে ব্যক্তি এ ইবাদত (বিচার চাওয়া) কে তাগুতের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে, সে আল্লাহর সাথে শিরককারী (মুশরিক) হিসেবে গণ্য হবে।

আর যে তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ তায়াল নির্দেশ দিয়েছেন, সেই তাগুতের সম্মান রক্ষা করার জন্য শপথ গ্রহণ করা কুফরী।

আল্লাহর আইনকে প্রস্তাব আকারে বাছাই করার জন্য ভোটা-ভোটির উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে পেশ করাও কুফরী। আল্লাহ তায়ালার আইনকে ভোটের মাধ্যমে বাছাই করার নীতি উদ্ভাবনের দ্বারা আল্লাহর সাথে কুফরী করার দ্বার উন্মুক্ত করা কুফরী।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটিই মুরতাদ হওয়াকে অপরিহার্য করে তোলে। তাই তাদের সাবধান হওয়া উচিৎ, তারা কিসের সামনে দাড়ানো আছে। তাদের আরো জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর সাথে শিরক এবং কুফরী হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়। আর উদ্দেশ্য মাধ্যমেরও পথ ও পদ্ধতির সত্যতার প্রমাণ পেশ করে না। আর তাদের কাছে মাধ্যম হচ্ছে কুফরী ও শিরকী কর্ম, যা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কর্মকে অস্বীকার করে।

৪র্থ সংশয় ঃ কসম ও শপথ করার ব্যাপারে তারা বলেঃ আমরা যখন পরিষদে অংশ গ্রহণ করি সংবিধান এবং আইন কানুনের ব্যাপারে শপথ করে তখন সত্য ও হক বিষয়গুলোকে আমরা ব্যতিক্রম করে রাখি এবং নিয়তের মধ্যে আমরা বলি যে, এর (সংবিধানের) মধ্যে যে সব হক বিষয়াবলী আছে তার সম্মান রক্ষার জন্য আমরা শপথ গ্রহণ করি।

জবাব ঃ আমরা বলতে চাই যে, যদি তারা জানতো, তাওহীদ কি, এবং মিল্লাতে ইব্রাহীম (আঃ) কি, তাহলে তারা এ ধরণের কথা বলতে

www.pathagar.com

পারতো না এবং দ্বীনের ব্যাপারে তারা এভাবে মোহাবিষ্ট হতে পারতো না, নিজেরাও গোমরাহ হতো না, অপরকেও গোমরাহ করতো না, তাদের এ সংশয়ের কয়েকটি জবাব রয়েছে।

এক ঃ আমরা বলতে চাই, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইসলাম সর্ম্পকে সামান্য জ্ঞান দান করেছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে তাওহীদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্য বা হক যখন বাতিল ও শিরক দ্বারা মিশ্রিত হয়, তখন প্রথমেই মানুষের শিরক এবং কুফরীর মতো বাতিলকে পরিহার করে সত্যকে তা থেকে পৃথক করা অতঃপর তা প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ। যেমনটি তাওহীদবাদীদের ঈমান সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ-

"যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা যাদের পূজা করো,তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করবেন।" (আয যুখরুফ ঃ ২৬-২৭)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্ব প্রথম তাদের যাবতীয় মা'বূদ বা উপাস্যদের ব্যাপারে নিজেকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করলেন, অতঃপর সত্যকে সেই পঙ্কিলতা থেকে পৃথক করলেন। আর সত্যটি হচ্ছে, এক আল্লাহর ইবাদত করা, এটাই হচ্ছে মিল্লাতে ইব্রাহীম যা থেকে বিমুখ হলে নিজেকে কলঙ্কিত করা হয়।

দুই ঃ এটাতো জানা কথা যে, যে ব্যক্তি জবরদস্তি ছাড়া এবং হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া স্বেচ্ছায় তাগুতকে সম্মান করার জন্য শপথ করে, সে তাগুতকে অস্বীকার করলো না, অথচ অন্তর জবান ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে তাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্য। এ কথা জেনে রাখা উচিৎ যে, দ্বীনের স্থান হতে হবে অন্তরে বিশ্বাস, ভালবাসা এবং ঘৃণার (নাফরমানীর ক্ষেত্রে) মাধ্যমে। দ্বীনের স্থান জবানে হতে হবে সত্যের উচ্চারণ এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। এমনিভাবে দ্বীনের স্থান হতে হবে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে, কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে । এ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়ে বিনষ্ট হলে মানুষ কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে।(আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া কিতাবু হুকমিল মুরতাদ ৮৭/৭ পৃঃ)

যে ব্যক্তি কুফরী কথা ও কর্মের প্রকাশ ঘটালো, সে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ফয়সালার ব্যাপারে এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট কথা। অতএব যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আমি শপথ করি এবং আমার নিয়তের মধ্যে হককে আলাদা করে রাখি। (অর্থাৎ নাফরমানীর কাছে শপথ করার সময় খারাপ কাজে তা ব্যবহার করবো না, এ নিয়ত করি) তাদের এ কথা সম্পূর্নরূপে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। কেননা বাহ্যত ঃ এটা কুফরী কথা। যেহেতু আল্লাহকে বাদ দিয়ে হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া কিংবা জবরদস্তি মূলক হত্যা অথবা শাস্তির আশংকা ছাড়াই তাগুতী আইনকে সম্মান করা গাইরুল্লাহর ইবাদত করার জন্য যেহেতু শপথ করা হয়েছে, সেহেতু তার কথা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

www.pathagar.com

শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) তাঁর কাশফুশ শুবহাত নামক পুস্তিকায় বলেন, "প্রত্যেক মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম " মুরতাদের হুকুম সংক্রান্ত যে অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ কি? মুরতাদ হচ্ছে ঐ মুসলমান, যে ইসলামকে গ্রহণ করার পর ইসলামকে অস্বীকার করে। অতঃপর এর অনেক প্রকার ও শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, উল্লেখিত সব বিষয়েই কুফরী সংক্রান্ত। এমনকি তারা অতিসামান্য বিষয়ের কথা ও হুকুম সহ উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ এমন কথা যা মুখে বলা হয় অথচ অন্তরে নেই, অথবা এমন কথা, যা শুধুমাত্র ঠাট্টা ও খেলাচ্ছলে বলা হয়।

লক্ষ্য করুন, বলা হয়েছে, অতি সামান্য বিষয়ের কথাও তার হুকুম সহ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এমন কথা যা মুখে আছে অথচ অন্তরে নেই। তিনি তাঁর পুস্তিকার শেষ দিকে বলেন ঃ এটা যখন নিশ্চিত সত্য যে, যে সব মুনাফিক রাসুল (সঃ) এর সাথে রুমের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো, তারা কাফের হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো কিছুকথা শুধুমাত্র খেলাচ্ছলে এবং ঠাট্টাচ্ছলে বলার কারণে তখন এটা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলে অথবা কুফরী কর্ম করে সম্পদের স্বল্পতার আশংকায়, অথবা কারো দয়া বা সাহায্য লাভের আশায়, সে ব্যক্তির অপরাধ অবশ্যই তার চেয়ে জঘণ্য যে ব্যক্তি কুফরী কথা বলে শুধুমাত্র ঠাট্টাচ্ছলে।

আল্লামা শাইখ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেন ঃ মুসলমান যখন এ কলেমার মহান মর্যাদার কথা এবং এর বাধ্যবাধকতার কথা জানতে পারলো, তখন তাকে এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে, জবান দ্বারা উচ্চারণের মাধ্যমে এবং এর মৌলিক বিষয়গুলো আমলে পরিণত করার মাধ্যমে, এ তিনটি বিষয়ের কোনো একটিও যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কিতাবের বর্ণনা মতে মুসলমান হতে পারবে না। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালনের মাধ্যমে যদি একজন মানুষ মুসলমান হয়, অতঃপর তার মধ্যে যদি এমন কোনো কথা, কাজ এবং বিশ্বাসের সূত্রপাত হয়, যা ইসলামের বিপরীত, তাহলে, তার কোনো লাভ নেই। আল্লাহ তায়ালা তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে যারা কুফরী কথা বলেছে তাদের প্রসংগে বলেন ঃ

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ-

"তোমরা ছলনা করো না। তোমরা যে ঈমান গ্রহণ করার পর কুফরী করেছো।" (আত-তওবাহ ঃ ৬৬)

অন্যদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ-

"এ সব লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা সে কথা বলেনি। অথচ তারা কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে।" (আত-তওবাহ ঃ৭৪)

www.pathagar.com

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ মোদ্দা কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এমন কথা বলে অথবা এমন কাজ করে যা কুফরী, সে এর দ্বারা কুফরী করলো, যদিও সে এর দ্বারা কাফের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেনি। তবে ইল্লা-মাশাআল্লাহ কাফের হওয়ার ইচ্ছা কেউ পোষণ করেনা। এ প্রসংগে ওলামায়ে কেরামের কথা অনেক।

৫ম সংশয়ঃ ঐ সব লোকের কথাই এখানে প্রযোজ্য, যারা নিজেদেরকে আইন প্রণয়নকারী না হয়েও বিধান রচনা কারী কর্তৃপক্ষ হওয়ার জন্য প্রার্থী হিসাবে দাড় করায়, যাতে তারা এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে [অর্থাৎ আইন প্রণয়নকারী হিসাবে নিজেদের আসন সুদৃঢ় করতে পারে] এমনি ভাবে তাদের ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য যারা বলেঃ যে আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ করার সময় তারা নিজেদেরকে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে আল্লাহর অংশীদার বানাচ্ছে না। এবং যারা তাদেরকে প্রার্থী ঠিক করেছে তাদের মধ্যেও তাদেরকে রব এবং বিধান দাতা বানানোর কোনো নিয়ম নেই। বরং তারা যা করেছে তা মূলতঃ কল্যান সাধনের নিয়তেই করেছে।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই ঃ তারা যে বলছে, তারা আইন প্রণয়নকারী নয় তাদের একথা সম্পূর্নরূপে বাতিল। তারা নিজেরা বলছে যে, তারা আইন প্রণয়কারী নয়, এখানে তাদের একথা বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে জ্ঞান, বাস্তবতা, সংবিধান এবং প্রচলিত রীতি-নীতিতে যা প্রমাণিত হয় তা। একজন ব্যক্তি এসে আইন প্রণয়নকারীর চেয়ারে বসলে এবং তার দায়িত্ব পালন করলে সেই আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে আইন প্রণয়নকারী। এক্ষেত্রে সে রাজী থাকুক বা না থাকুক, অথবা ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসেনা। [অর্থ্যাৎ কুফরীর ব্যাপারে নিয়ত, ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো প্রভাব নেই]। **এটি হচ্ছে প্রথম কথা।**

দ্বিতীয় কথা হচ্ছেঃ তারা বলে, তারা আইন প্রণেতা নয়, অথচ তারা নিজেদের আইন প্রণেতার পদে আসীন করে রাখে, এটা মূলতঃ জন সাধারনের জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে প্রতারণা ও অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যেনো ঐ ব্যক্তির ন্যায় বলা, যে নিজেকে বিচারকের পদে আসীন করে " আমি বিচারক নই" বলে নিজেকে নেতৃত্বের আসনে বা পদে আসীন করে আমি নেতা নেই বলা। এমনিভাবে প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়ে "আমি প্রেসিডেন্ট নই বলা" তাদের দাবী বাতিল বলে গন্য করার জন্য এতটুকু কথাই যথেষ্ট। " তারা আইন প্রণয়নকারী নয়" এ কথার জবাবে উপরোক্ত কথাগুলো বলা হয়েছে।

আবার তারা বলেঃ আল্লাহর সাথে আইন প্রণয়নকারী হিসেবে শরীক করা আমাদের নিয়ত নয়, তাদের এ কথাও কয়েক দিক থেকে বাতিল।

একঃ আমরা বলতে চাই, নেক নিয়ত কখনো কি বিবেচনা করা হয় বা উপকারে আসে নিয়তকারীর কাজ যখন অবৈধ হয়? অর্থাৎ কাজ না জায়েয হলে নিয়তের কোনো মূল্য নেই। দ্বীনের নীতির মধ্যে এটাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত মূলক কথা, যে বেদআতী ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য

www.pathagar.com

অবৈধ কাজ করে অথচ এ কাজ করার জন্য তার কাছে কোনো দলীল প্রমাণ নেই, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার এ কাজ সম্পূর্ণ রূপে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ দলীল ছাড়া যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করলো সে ব্যক্তির কাজ প্রত্যাখ্যাত। অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যার মধ্যে আমাদের দ্বীনের কোনো ভিত্তি নেই, সে কাজ প্রত্যাখ্যাত। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি দ্বীনের এমন কোনো বিষয় বা কাজ উদ্ভাবন করলো যার কোনো ভিত্তি বা প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহ্তে নেই। এ কাজ প্রত্যাখ্যাত। এ কাজ দ্বারা সে গুণাহর অধিকারী হয়েছে। এক্ষেত্রে তার নেক নিয়তের প্রতি কোনো দৃষ্টি দেয়া হবেনা । তাহলে যে ব্যক্তি শেরেকী কাজ করলো এবং আইন প্রণয়নকারী চেয়ারে বসে বিধান দাতা স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ন হলো, তার ক্ষেত্রে কি হুকুম বা ফয়সালা হতে পারে? আইন প্রণয়নের যে নিরঙ্কুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, সেই পদবী আকড়ে থাকার মাধ্যমে যে অপরাধ সে করেছে এ জন্যই তার নিয়তের দিকে কোনো দৃষ্টি দেয়া হবেনা । (কারণ শিরকী গুণাহ বা বড় গুনাহের ক্ষেত্রে নিয়তের কোনো প্রভাব নেই)।

দুই ঃ তারা একথা স্বীকার করে, যে ব্যক্তি আইন প্রণয়নকারীর চেয়ারে বসে আইন প্রণয়নকারী হওয়ার নিয়ত করবে, সেই প্রণয়কারী বা বিধান দাতা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু তারা এ কথা স্বীকার করেন না যে, কল্যাণ সাধনের নিয়তে আইন প্রণয়নকারীর চেয়ারে বসে কাজ করলে বিধান দাতা হিসেবে গণ্য হবে। একথার দ্বারা তারা একজন মানুষ আইন প্রণয়নকারী বা বিধান দাতা হওয়া এবং না হওয়ার মধ্যে নেক নিয়তকে পার্থক্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিঃসন্দেহে প্রকৃত বিষয়টি তারা যা বলছে তার বিপরীত। তাই যদি কোনো মানুষ নিজেকে আইন প্রণয়নকারী হিসেবে বিশ্বাস করে অতঃপর মুখে এ বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করে বলে ঃ আমি একজন আইন প্রণয়নকারী, আইন প্রণয়নের অধিকার আমার আছে, তাহলেই সে আইন প্রণেতা হিসেবে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না সে আইন প্রণেতার পদে আসীন হয়। এখানে মূল কথা হচ্ছে মানুষ আইন প্রণয়নকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করে, তার আইন প্রণেতার স্থানে আসীন হওয়া এবং উক্ত পদবী গ্রহণ করার ওপর। এখানে বিশ্বাস এবং মৌখিক উচ্চারণ বিবেচনার কোনো বিষয় নয়।

তিন ঃ শিরক বিশ্বাস, কথা ও কর্মের মাধ্যমে হয় এ কথা যে বিশ্বাস করে সে এ ধরনের কথা বলতে পারে না। শাইখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর দ্বীন হতে হবে অন্তকরণে বিশ্বাস , ভালবাসা (অন্যায় ও পাপের প্রতি) ঘৃনার মাধ্যমে। দ্বীন হতে হবে জবানে হক কথা উচ্চারণ এবং কুফরী কথা বর্জনের মাধ্যমে। দ্বীন হতে হবে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যে পরিণত করা এবং কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। এ তিনটি বিষয়ের একটি বিষয়ও যদি বাদ পড়ে যায়, তাহলে (মুসলমান) কাফের এবং মুরতাদ হয়ে যাবে।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেন ঃ মুসলমান যখন এ কলেমার মহান মর্যাদার কথা এবং বাধ্যবাধকতার

www.pathagar.com

কথা জানতে পারলো, তখন তাকে এ কলেমার প্রতিফলন ঘটাতে হবে আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে, জবান দ্বারা উচ্চারণের মাধ্যমে এবং এর মৌলিক বিষয়গুলো আমলে পরিণত করার মাধ্যমে। এ বিষয়গুলোর কোনো একটি যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে যা বর্ণনা করেছেন সে মতে মুসলমান হতে পারবে না। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ যদি মুসলমান হয়, অতঃপর তার মধ্যে যদি এমন কোনো কথা, কাজ, এবং বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় যা ইসলামের বিপরীত, তাহলে এ ধরণের ইসলামে তার কোনো উপকার নেই। (মাজমুআতুত্ তাওহিদ আররিসালাত সালেসা)

৬ষ্ঠ সংশয় ঃ এ সংশয় তাদের, যারা বলে ঃ রুবুবিয়্যাতের তাওহীদ হচ্ছে বিশ্বাস ও স্বীকৃতির নাম। এ সব প্রার্থীরা আর ভোটাররা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো আইন দাতা নেই, তাহলে তাদেরকে কেনো আপনারা এ বিশ্বাস থাকার পরও আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের শিরককারী বলছেন ?

বিভিন্ন দিক থেকে এর জবাব ঃ

একঃ আমরা বলবো, নিঃসন্দেহে উপরোক্ত ব্যক্তির কথা ঠিক। অর্থাৎ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের মূল হচ্ছে বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি। এটা শরীয়তের দিক থেকে [বান্দার ওপর চাপিয়ে দেয়া] একটি দ্বায়িত্ব। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে এবং তাঁর রুবুবিয়্যাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকে বিশ্বাস করার জন্য একথা কারো অজানা নয়। কিন্তু এখানে আমরা যে কথাটি বলতে চাই, তা হচ্ছে এইযে, মানুষ আল্লাহর প্রতি মুমিন হতে পারে, তাঁর রুবুবিয়্যাত সংক্রান্ত কর্মের ওয়াহদানিয়্যাতে বিশ্বাসী হতে পারে, এ গুলোর স্বীকৃতিও সে দিতে পারে, তারপরও তার এ বিশ্বাস আর স্বীকৃতি তার কোনো উপকারে নাও আসতে পারে। এটা তখনই হয়, যখন বান্দা গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে এমন কাজ করে, যে কাজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। আর তখন সে কর্মের দিক থেকে আল্লাহর সাথে শিরককারীতে পরিণত হয়। এ কথা ইসলামের সমস্ত ওলামায়ে কেরাম স্বীকার করেছেন।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) কিছু নামের ওপরে শুধুমাত্র (শিরকী) নাম প্রয়োগ করলেই শিরক হয়ে যায় না, বরং শিরক হচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করা যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস। চাই গাইরুল্লাহর ওপর সেই নামই প্রয়োগ করে থাকুক যা জাহেলী যুগে প্রয়োগ করা হতো অথবা তার ওপরে অন্য কোনো নামই প্রয়োগ করা হোক। অতএব এখানে নামটা কোনো বিচার্য বিষয় নয়। (আদ দাররে তাফদীদ দিমনা রিসালাত আসসালাফিয়াত)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তিনি বলেছেন ঃ বরং শিরক হচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করা যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস। শাইখ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিনের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ যদি একজন মানুষ মুসলমান হয় এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালন করে, অতঃপর তার মধ্যে যদি

www.pathagar.com

এমন কোনো কথা,কাজ এবং বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামের বিপরীত তাহলে এ ধরণের ইসলাম তার কোনো উপকারে আসবে না। (মাজমুআতুত্ তাওহীদ আররিসালাতে সানিয়া)

দুই ঃ তাওহীদ অবশ্যই হতে হবে অন্তরে, জবানে এবং আমলের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে আমরা একাধিক স্থানে ওলামায়ে কেরামের কথা এবং তাদের সর্ব সম্মত রায় বা "ইজমার" কথা উল্লেখ করছি।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব তাঁর কাশফূল শুবহাত নামক পুস্তিকায় বলেনঃ এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, তাওহীদ হতে হবে অন্তরে, জবানে এবং আমলের মাধ্যমে। এর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয় বাদ পড়লে কোনো মানুষ মুসলমান হতে পারবে না।

বিষয়টি যখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন জেনে রাখা প্রয়োজন যে, বিষয়টি শুধু তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা এবাদতের তাওহীদের জন্যই খাস (নির্দিষ্ট) নয়। বরং বিষয়টি রুবুবিয়্যাতের তাওহীদেও ক্ষেত্রে ও সমভাবে প্রযোজ্য বরং এ ক্ষেত্রে রুবুবিয়্যাতের তাওহীদের অনুপ্রবেশ বেশী প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের মধ্যে শিরক করা উলুহিয়্যাতের মধ্যে শিরক করার চেয়ে বেশী জঘণ্য অপরাধ। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক তিন ধরনের।

১। বিশ্বাসের দিক থেকে রুবুবিয়্যাতের শিরক। যেমন ঃ মানুষ অন্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও আইন বা বিধান দাতা রয়েছে।

২। কথার দিক থেকে রুবুবিয়্যাতের শিরক। যেমন ঃ মানুষ তার জবানে একথা উচ্চারণ করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের বিধান প্রণয়নের অধিকার রয়েছে।

৩। আমল বা কর্মের দিক থেকে রুবুবিয়্যাতের শিরক। যেমন ঃ মানুষ এমন মাখলুক বা সৃষ্টির জন্য কাজ করা, যে মাখলুকের এমন অধিকার রয়েছে বলে মনে করা (যেমন নিরঙ্কুশ ভাবে আইন প্রণয়ের অধিকার) যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। যেমনটি ইমাম শাওকানী বলেছেন ঃ শিরক হচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য এমন কাজ করা, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস (নির্দিষ্ট)। আমরা ঐ সব লোকদেরকে প্রশ্ন করছি যারা মাখলুককে বাছাই করে তাদেরকে আইন রচনার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন, যদি এটা আমলের দিক থেকে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের তাওহীদের মধ্যে শিরক করার উপমা না হয়। যা মূলত মাখলুককে আইন রচনার মসনদে বসানোর মাধ্যমে আইন রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান। তাহলে আপনাদের কাছে এর উপমা কি হবে? পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, পূর্বের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে, এ ধরনের আইন প্রণয়নকারী পরিষদের অংশ গ্রহণ শিরকে আকবার বা বড় শিরক। আর যে ব্যক্তি নিজেকে এ পরিষদে জন্য প্রার্থী বানিয়েছে এবং বিধান রচনা কারীর পদকে আকড়ে রেখেছে সে শিরকে পতিত হয়েছে। বরং সে তাগুতে পরিণত হয়েছে, কেননা সে তার নিজের জন্য আমলের মাধ্যমে আল্লাহর একটি বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি তাকে ভোট প্রদান করে তাকে আইন প্রণয়নকারীর স্থানে বসিয়েছে,

www.pathagar.com

সেও শিরকে পতিত হয়েছে, চাই সে এর জন্য ভাল নিয়ত করে থাকুক অথবা মন্দ নিয়ত করে থাকুক। কিন্তু আমরা এখানে যা বলতে চাই এবং সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, অনেক মানুষই ভুল করে যখন বলে, এ সব লোক যারা আইন রচনাকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ করে তারা কুফরী করেনা, তাই তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা যায়না। কারণ তারা তাদের অবস্থার ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তারা মনে করছে যে তারা বাধ্য হয়ে এই সব পরিষদে অংশ গ্রহণ করে। তাদের মতে এসব আইন প্রণয়নকারী পরিষদে তারা যোগ না দিলে তাদের বদলে নাস্তিক ও কাফের লোকজন এ সব পরিযদে অংশ গ্রহণ করে, বিপর্যয় ও অশান্তির সৃষ্টি করবে। নিঃসন্দেহে তাদের এ কথা একটি মারাত্মক ভুল। কেননা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বিষয়টি যদি যথার্থই হয় অর্থাৎ তাদের মতে তাদের কাজের (আইন প্রণয়ন কারী পরিষদে অংশ গ্রহণ) একটি ব্যাখ্যা আছে। আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছি যে, শিরককারীর কোনো ব্যাখ্যাই গ্রহণ যোগ্য নয়। তাদের কথা অনুযায়ী যদি তারা নিজেদেরকে মনে করে যে, তারা জবরদস্তি মূলক ভাবে উক্ত কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং এ জবরদস্তি তাদেরকে কাফের আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। তাহলে আমরা বলবো এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কথা বলা হয়েছে এবং জবরদস্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন কথার জবাব প্রদান করা হয়েছে। কখন জবরদস্তি মূলক কাজ গ্রহণ যোগ্য আর কখন গ্রহণ যোগ্য নয়, তার সীমাও বলে দেয়া হয়েছে।

জবরদস্তি মূলক কাজ সংক্রান্ত মাসআলার ব্যাপারে যারা সিদ্ধান্তহীনতার আবর্তে রয়েছেন তাদেরকে বলতে চাই যে, আপনারা নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনি স্বাধীন, আপনার জন্য ৩য় কোনো পথ নেই।

প্রথম বিষয়ঃ হয় তাদের কথিত জবরদস্তিমূলক কাজ [আইন প্রণয়নকারী পরিযদে যোগদান] গ্রহণ যোগ্য হবে নতুবা গ্রহণ যোগ্য হবে না। যদি গ্রহণ যোগ্য হয় তখন তাদের জন্য আপনাকে তাই জায়েয বলতে হবে, যা তারা আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজেদের জন্য জায়েয করে নিয়েছে। তাদের মতে পরিষদে অংশ গ্রহণ করাকে এ জন্যই নিজেদের ক্ষেত্রে জায়েয করে নিয়েছে, যে, বিষয়টি তারা নিজেরা জবরদস্তির শিকার বলে ধরে নিয়েছে। আপনি আপনার বক্তব্য অনুয়ায়ী এ জবরদস্তিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তাই তাদের বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিয়ে সম্মতি দিয়েছেন এবং পরিষদে অংশ গ্রহণ করা তাদের জন্য জায়েয বলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ তাদের কথা অনুয়ায়ী যদি তাদের জবরদস্তিমূলক অবস্থা আপনার কাছে গ্রহণ যোগ্য না হয় তাহলে তাদের ব্যাপারে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকও থাকলো না এবং এর কোনো প্রভাব ও পড়লো না। এমতাবস্থায় শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকার কারণে এটা বলা অপরিহার্য যে, "তারা মুশরিক" যদি কেউ বলেঃ তাদের মাঝে এমন কতিপয় সংশয় বিদ্যমান রয়েছে, যে গুলোকে তারা তাদের অবস্থানের জন্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। এটা অবশ্যই তাদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে একটি বাধা।

www.pathagar.com

এর জবাবে আমরা তাই বলবো, যা আমরা ২য় প্রবন্ধে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য পেশের মাধ্যমে বলেছি। আর তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়াই ইসলাম থেকে [আমল দোষে] বের হয়ে যায়। এবং মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি বেশীর ভাগ ঘটে থাকে।

আমরা আরেকটি বিষয় শতর্ক করে দিতে চাই, যে বিষয়টি কতিপয় লোক ভূল করেন। তা হচ্ছে কেউ কেউ বলেনঃ এ বিষয়ে যে লক্ষ্যে পৌছে, তার জন্য রয়েছে দুটি সওয়াব, আর যে ভূল করেছে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব। তারা উভয়েই মুজতাহিদ। [অধ্যাবসায়ী ও সাধনাকারী] প্রত্যেকে মুজাহিদের জন্যই সওয়াব বা পুরষ্কার রয়েছে। প্রথম ব্যক্তি মাগফুর [ক্ষমাপ্রাপ্ত] হিসাবে সওয়াব পাবে।

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে এ ধরনের কথা মারাত্মক ভুল ছাড়া আর কিছু নয়। শিরকের ক্ষেত্রে মুজাহিদের ভুল ক্ষমা প্রাপ্ত কিভাবে হতে পারে? এটা কখনো হতে পারে না এবং এ ধরনের কথা বলা কখনো ঠিক নয়।

আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেনঃ আমরা উল্লেখ করেছি যে, শাইখ তাকিউদ্দিন বলেছেনঃ মাগফিরাত বা ক্ষমা একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই আশা করা যেতে পারে, যে ব্যক্তি ইজতিহাদ [কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে চেষ্টা সাধনা] করতে গিয়ে অজ্ঞতা বশতঃ কোনো "বিদআত" করে ফেলেছে। শিরকে আকবার [বড় ধরনের শিরক] এবং প্রকাশ্য কুফরী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ কথা [ক্ষমার সুযোগের কথা] বলা হয়নি।

তাঁর বিরোধীদের কথার জবাবে তিনি বলেনঃ শাইখ তাকীউদ্দিন এবং ইবনুল কায়্যিম বলেনঃ যে ব্যক্তি এসব কাজ করবে, সে কাফের ও মুশরিক" এ কথা তার উপর প্রয়োগ করা যাবে না, যতক্ষণ না কুফরীর উপর যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়। বরং এ কথা বলা উচিৎ; এটা কুফরী কাজ। হতে পারে লোকটির গ্রহণ যোগ্য ওযর রয়েছে, যেমন ইজতিহাদ, তাকলীদ (অনুকরণ) ইত্যাদি। এ কথাগুলো যা তাঁদের কাছে থেকে বর্ণনা করলাম, এর কোনো ভিত্তি নেই। অর্থাৎ তাঁরা এ কথা বলেনি। আমার ধারনা আপনার এ বিশ্বাস দাউদের লিখনী থেকে হয়েছে (দাউদ বিন জারাজিদ আল বাগদাদী ইসলাম বিরোধী লিখক।)

তাব লেখা প্রবন্ধে এ ধরনের কিছু বাক্য শাইখ তাকীউদ্দিনের اقتضاء الصراط المستقيم নামক কিতাবের বরাত দিয়ে লিখেছেন। সে যখন দ্বিতীয় বার তার লেখাসহ "ওনাইজায়" [একটি স্থানের নাম] আসে এবং এ লেখা ওনাইজার লোকজনের কাছে পেশ করতে থাকে আর বলতে থাকে ঃ যদি মেনে নেই কবরের কাছে যা করা হচ্ছে তা শিরক, যেমনটি এ সম্প্রদায় দাবী করছে, তাহলে এটাই হচ্ছে তাদের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথা, যাকে তারা অনুসরণ করে ও মানে ঃ মুজতাহিদ, অনুকরন কারী এবং অজ্ঞ লোকদের ওযর (অজুহাত) গ্রহণযাগ্য, তারা যা গুণাহ করবে তা ক্ষমার যোগ্য।

www.pathagar.com

আমার কাছে যখন এসব কথা পৌছলো, আমি তার কাছে চিঠি পাঠালাম, যখন সে আমার কাছে আসলো তখন আমি তার ভুলটা বলে দিলাম। সে আসলে শাইখ ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যকে যথা স্থানে ব্যবহার না করে ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছে। আমি তাকে বললাম, যে তোমার উপস্থাপিত কথাগুলো তিনি শিরকের ব্যাপারে নয় বরং বেদআত সংক্রান্ত বিষয়ে বলেছেন, যেমন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে তা নবী (সঃ) এর কবরের কাছে অনুসন্ধান করা, অন্যান্য বেদআতী ইবাদত করা। এ সব বেদআতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন কোনো ব্যক্তি নেক আমলের বিশ্বাসেই কোনো কাজ করলো, অথচ সে জানেনা যে কাজটি শরীয়তে নিষিদ্ধ। নেক নিয়তের দরুন তার সওয়াব হতেও পারে তার অজ্ঞতার কারণে তাকে মাফ করাও হতে পারে। এটা এক বিস্তৃত অধ্যায়।

নিষিদ্ধ কিছু ইবাদত যা কতিপয় লোকজন করে এবং এর দ্বারা কিছু উপকারিতাও অর্জন করে থাকে। এটা কিন্তু ঐ ইবাদত বৈধ হওয়ার প্রমাণ নয়। তারপর কথা হচ্ছে, একজন আলেম ব্যাখ্যাকারী হতে পারেন, ভূলকারী মুজতাহিদ হতে পারে অথবা অনুকরণকারী হতে পারে, এমতাবস্থায় তার ভূল ক্ষমার যোগ্য হতে পারে এবং বৈধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত অবৈধ কাজের জন্যও তিনি সাওয়াব পেতে পারেন। তাঁর একথা সেই সব বিষয়ের জন্য, যে গুলোতে শিরক নেই। (আদদুরার আসসুন্নিয়া ৩৮৭/১০)

তিনি আরো বলেন ঃ প্রত্যেক মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম কথা, কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে এত অধিক কথা উল্লেখ করেছেন যা সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাদের কথা হচ্ছে শিরকে আকবার বড় শিরক, ও প্রকাশ্য কুফরী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের । এ রায় বা অভিমত আল্লাহর দ্বীন অস্বীকার কারীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়নি।

অতএব যে ব্যক্তি দাবী করে যে, কুফরী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি তাবীলকারী (তার কাজের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে) অথবা মুজতাহীদ (কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে সাধনকারী) অথবা ভুল কারী অথবা অনুকরনকারী অথবা অজ্ঞ হিসেবে এদের ওযর (অজুহাত) গ্রহণ যোগ্য। নিঃসন্দেহে এ কথা কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমার সম্পূর্ন বিপরীত। উপরন্ত মূলকেই এর দ্বারা ধ্বংস করা হয় । আর মূল যদি বাদ দেয়া হয়, তাহলে কাফের হবে নিঃসন্দেহে। যেমনিভাবে কাফের হয় ঐ ব্যক্তি, যে রাসূল (সঃ) এর রেসালতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কারীকে কাফের বলতে দ্বিধা করে।

আল্লামা শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ (রহঃ) বলেন ঃ ওলামায়ে কেরাম সব সময়ই দৃঢ় ও মজবুত নীতি অবলম্বন করেছেন এবং মুরতাদের হুকুম সংক্রান্ত অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ তাঁদের কেউ এ কথা বলেননি যে, কোনো ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে, কুফরী কর্ম করে এমতাবস্থায় যে, সে জানেনা যে তার এসব কথা ও কর্ম তার ঈমান ও ইসলামের বিপরীত, তাহলে তার অজ্ঞতার কারণে তাকে কাফের বলা যাবেনা। (আদ্ দুরার আসসুন্নিয়া ৭৭/১৭)

কাজী আইয়াজ (রহঃ) বলেন ঃ ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান আল-আম্বরী এ মত গ্রহণ করেন যে, যে সব মুজতাহিদ দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে ইজতেহাদ করেন, তাদের যে সব বিষয় ব্যাখ্যার অবকাশ আছে সে সব

www.pathagar.com

বিষয়ে তারা সঠিক পথে রয়েছেন বলে ধরে নিতে হবে। (অর্থাৎ যে সব ইজতিহাদের ফলাফল বাহ্যত ঃ ইসলাম বিরোধী বলে মনে হয় এবং ব্যাখ্যার অবকাশ আছে সে সব বিষয়ের মুজতাহিদকে কাফের বলা যাবেনা) তিনি এ ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য বজায় রেখেছেন। তিনি ছাড়া সমস্ত ওলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে হক হচ্ছে একটি, অর্থাৎ দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে যে ভূল করবে সে গুনাহগার, কাফের ও পাপী। তবে এ ক্ষেত্র যে ভুল করবে তাকে কাফের বলার ব্যাপারে মতভেদ আছে। (আদ্ দুরার আসসুন্নিয়া ৪৭৯/১১)

মুসলিম উম্মাহর ইজমা অর্থাৎ সর্বসম্মত রায় হচ্ছে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে যে ভুল করবে সে পাপী, না ফরমান এবং ফাসেক (বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) তাকে কাফের বলার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। দ্বীনের মৌলিক বিষয় বলতে কাজী আইযায এখানে আহলে সুন্নাহর আক্বীদা বিশ্বাসকে বুঝিয়েছেন। যেমন আহলে সুন্নাহর আক্বীদার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর তায়ালাকে আখেরাতে দেখা যাবে এবং কুরআন হচ্ছে আল্লাহর তায়ালার বাণী ইত্যাদি ।

"মতভেদ শুধু কাফের বলার ক্ষেত্রে এ কথা বলতে ঐ সব বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যে গুলোতে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। যেমন আল্লাহর তায়ালার কতিপয় সিফাত বা গুণবাচক নামের ব্যাখ্যা প্রদান। আর সুস্পষ্ট কুফরী বিষয় যেমন, ইবাদতের মধ্যে শিরক করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রোপ করা ইত্যাদি বিষয়ে লিপ্ত ব্যক্তিদের বেলায় আহলে সুন্নাহর কাছে কাফের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই।

উপরোক্ত আলোচনায় আমাদের কাছে ঐ ব্যক্তির ভুল সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে যে ব্যক্তি বলে যে, এ বিষয়ে যে মুজতাহিদ ভুল করে তার ভুলের জন্য রয়েছে সাওয়াব ও ক্ষমা। এটা অবশ্য তখনই হবে, যখন দেখা যাবে যে ইজতেহাদ সম্পন্ন হয়েছে বিষয়টির হুকুম বা রায়ের ক্ষেত্রে, আর তা হচ্ছে আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণ অর্থাৎ কাউকে কাফের হিসেবে রায় দেয়ার শর্তের ক্ষেত্রে। আর যদি দেখা যায় যে ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়েছে শর্তের মধ্যে নয় বরং কাফের বলার ক্ষেত্রে, তখন [যারা আইন প্রণয়নকারী পরিষদে অংশ গ্রহণকারী] তারা মনে করে যে, তাদের কথিত জবরদস্তি মূলক ভাবে পরিষদে অংশ গ্রহণ করা তাদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে অন্তরায়। ইতিপূর্বে এর জবাবে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

এ সংক্ষিপ্ত উপস্থাপিত আলোচনার মাধ্যমে শরীয়তের প্রমাণাদি,ওলামায়ে ইসলামের বক্তব্য এবং বিভিন্ন সংশয়ের জবাব দানের বাসনাই আমরা পোষণ করেছিলাম।

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাঁর আসমায়ে হুসনা (সুন্দর সুন্দর নাম) এবং মহান গুণাবলীর বদৌলতে এই প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় ফেতনা থেকে হেফাজত করেন, আমাদেরকে এবং তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, বিশ্বাস, কথা ও আমলের মধ্যে দৃঢ়তা দান করেন, যাবতীয় কুফরী এবং বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ ব্যাপারে সম্পূর্ন ক্ষমতাবান। মহান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো উপায় নেই, কোনো শক্তি নেই।

www.pathagar.com

একটি সংযোজিত অধ্যায়

কতিপয় প্রস্তাবনা এবং আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রত্যাখ্যাত কতিপয় আইনের উপমা ঃ

প্রথম উপমা ঃ একটি মুসলিম দেশের আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি এ প্রস্তাব পরিষদের কাছে পেশ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ অথবা তাঁর রাসুল (সঃ) কে গালি দিবে অথবা দ্বীন ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করবে তার শাস্তি হচ্ছে ছয় মাসের পরিবর্তে দশ বছরের জেল এবং আর্থিক জরিমানা এক হাজার রুপীর পরিবর্তে দশ হাজার দীনার। অথচ এ আইন রচনাকারী জানে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) কে গালি দিবে আল্লাহ তায়ালার হুকুম হচ্ছে তাকে হত্যা করা, কেননা সে মুরতাদ।

সহীহ হাদীসে রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ من ارتد عن دينه فاقتلوه "যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলাম) ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে, তাকে তোমরা হত্যা করো।" আরেক বর্ণনায় রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে তাকে তোমরা হত্যা করো।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা অথবা তাঁর রাসুল (সঃ) কে গালি দেয় তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এ ব্যক্তি কাফের এবং মুরতাদ। কিন্তু মুসলিম দেশটির আইন প্রণয়নকারী এমন একটি নতুন আইন পেশ করলেন যা আল্লাহর শরীয়ত এবং রাসুল (সঃ) বিশ্ব মানবতার জন্য যা নিয়ে আসলেন তার সম্পূর্ন বিপরীত, আর তা হচ্ছে অপরাধী কে বন্দী করে রাখা এবং অর্থনৈতিক জারিমানা আদায় করা।

<u>পত্রিকার শিরোনামঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার জাত অথবা ইসলাম নিয়ে উপহাস করবে তার জন্য আইন প্রণয়ন পরিষদ ১০ বছরের জেল দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।</u>

التشريعية تقر الحبس ١٠ سنوات لمن يمس الذات الإلهية أو الإسلام

■ وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة أمس على اقتراح بقانون يشدد عقوبة الحبس على تهمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او الدين الإسلامي لتصل الى عشر سنوات بدلا من ستة اشهر كما هو مطبق حاليا. كما يرفع الاقتراح قيمة الغرامة المالية لتصبح عشرة آلاف دينار في حدها الأعلى بدلا من الف روبية وفقا لقانون المطبوعات والنشر الصادر في عام ١٩٦١.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة.............. (التتمة ص١٠)

استعرضت خلال اجتماعها خمسة اقتراحات بقوانين مقدمة من نحو ١٥ نائبا لتعديل قانون المطبوعات والنشر وخاصة ما يتعلق بالفقرة الاولى من المادة ٢٣ التي تحظر المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة بالتعريض او الطعن او السخرية او التجريح وبالمادة ٢٨ من ذات القانون وبالمادة ١١١ من قانون الجزاء رقم ١٦/١٩٦٠.

وذكر ان اللجنة استعانت بآراء قانونيين ودستوريين واحكام المحكمة الدستورية في شأن درجات التقاضي واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية قائلا ان اللجنة وافقت على اقتراح اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق احكام الشريعة للتعديل للمادة ١١١ من قانون الجزاء والذي ينص على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب علنا او في مكان عام بالقول او الكتابة او الرسوم او الصور وغيرها من وسائل النشر والاعلام او باية وسيلة من وسائل التعبير الاخرى ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او الصحابة او الدين الاسلامي بالتعريض او الطعن او السخرية او الاستهزاء او التجريح.

واشار باقر الى ان اللجنة وافقت على ان يستبدل بنص المادة ٢٨ من قانون المطبوعات والنشر النص التالي «يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا نشر في الجريدة ما حظرته الفقرة الاولى من المادة رقم ٢٣ من هذا القانون».

www.pathagar.com

১৯৯৮ ইং সনের ৫ই জানুয়ারি মোতাবেক ৭ই রমজান ১৪১৮ হিজরী আল-সিয়াসা পত্রিকা ৯১০৪৫৯ সংখ্যায় এ খবর প্রকাশিত হয়েছে। যারা এ আইন প্রণয়ন করেছে, পরিষদে প্রস্তাব আকারে পেশ করেছে এবং এ আইনকে যারা সংসদে অনুমোদন করেছে তারা সকলেই মুসলমান এবং মুসলিম জনগণের প্রতিনিধি।

এর মন্তব্য হিসেবে আমরা বলতে চাই যে, নিঃসন্দেহে তারা "উদ্দেশ্যই ওয়াসিলার [মাধ্যমের] যথার্থতা প্রমাণ করবে।" এ নীতি গ্রহণ করেছে। তাই তারা বলেঃ আমাদের উদ্দেশ্য ভাল, পূণ্যময় ও মহৎ। তাই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোনো পথ, যে কোনো উপায় এবং যে কোনো মাধ্যম অবলম্বন করার মধ্যে কোনো দোষ বা ক্ষতি দেখিনা। চাই সেই মাধ্যম শরীয়ত সম্মত হোক বা না হোক, এমন কি সেটা যদি শেরেকী এবং কুফরীও হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, যেমনটি হয়েছে এ নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। তারা এ ব্যাপারে জানুক বা নাই জানুক, এটাই হচ্ছে তাদের প্রকৃত অবস্থা।

আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের যে নীতি রয়েছে সে নীতি বলেঃ উদ্দেশ্য কখনোই ওয়াসিলা বা মাধ্যমের যথার্থতা বা বৈধতার প্রমাণ পেশ করে না, যদি মাধ্যম শেরেকী অথবা কুফরী হয়, তাহলে উদ্দেশ্য কখনোই তার যথার্থতার প্রমাণ দিবে না, মানুষ নিজেকে আল্লাহর সাথে আইন প্রণয়কারী বানিয়ে নেয়া শিরকের অন্তভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহা গ্রন্থে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রণয়নকারীকে আল্লাহর সাথে শিরককারী এবং নিজেকে রব ঘোষণাকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সেই দ্বীনকে ঠিক করে দিয়েছে যাহার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি? যদি ফয়সালার সময় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত না থাকতো, তাহলে এতদিনে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেতো। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি।" (আশ্ শুরা-২১)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেনঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

"তাদেরকে এক ইলাহের বন্দেগী করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যে সব শিরকী কথা বার্তা বলে তা থেকে তিনি সম্পূর্ন পবিত্র।" (আত-তাওবাহ ঃ ৩১)

এ ব্যাপারে ইসলামের জ্ঞানীগণের অনেক বক্তব্য রয়েছে।

www.pathagar.com

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ যে ব্যক্তি নবীগণের শরীয়ত বা বিধানকে পরিবর্তন করে নতুন বিধান রচনা করে, তার বিধান বাতিল, তার বিধান অনুসরণ করা জায়েয নেই।যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ-

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সেই দ্বীন ঠিক করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি।"

(আশ শুরা - ২১)

এ জন্যই ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা কুফরী করেছে, কারণ তারা পরিবর্তিত এবং যা রহিত করা হয়েছে সে বিধানকে আকড়ে ধরে রেখেছে। তিনি ফতোয়ায়ে মিসারিয়ায় মুদ্রিত তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ কোনো কিছু ওয়াজিব করা এবং হারাম ঘোষণা দেয়ার একমাত্র অধিকারী হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা। তাই যে ব্যক্তি কোন কাজ করার জন্য, বা কিছু বর্জন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ)-অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া কাউকে শাস্তি দিয়ে এবং এটাকে দ্বীন বা বিধান হিসেবে তা চালু করে তাহলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) নিজেকে সমকক্ষ বানিয়ে নিলো এবং নিজেকে তাঁর রাসুলের (সঃ) সাথে তুলনীয় বানিয়ে নিলো ঠিক যেমনটি মুশরিকরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলো। অথবা তারা সেই মুরতাদদের মতোই কাজ করলো যারা মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদার মুসাইলামুতুল কাযযাবের প্রতি ঈমান এনেছিলো। সে মূলতঃ তাদেরই অন্তভূক্ত, যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ-

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সেই দ্বীন সিদ্ধ করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহর তায়ালা দেননি।"

(আশ শুরা -২১)

লক্ষ্য করুন কিভাবে তাদেরকে মুরতাদ এবং মুশরিকদের স্থানে বসানো হয়েছে অথচ এ বিষয়টি কে হালাল মনে করে, আর কে হারাম মনে করে তার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কেননা কোনো হারাম বিষয়কে হালাল মনে করাটাই হচ্ছে কুফরী চাই, কোনো মানুষ উক্ত পাপের কাজ করুক অথবা নাই করুক।

আল্লামা শাইখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ) বলেন ঃ এ শহরের অধিবাসীরা আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনকে প্রকাশ্যে গালি দেয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আছে। তারা এমন আইন কানুনই প্রজাদের ওপর কার্যকর করছে যা আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। (ফাতহুল কুবরা ৩৩৯/৬)

আল্লামা শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে এমন আইন চালু করবে, যা আল্লাহর আইনের পরিপন্থী, সে কাফের অবস্থায় মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। (কিতাবুল ইমান ওয়া মুবতিলাতুহু ফিল আকিদা ইসলামিয়া পৃঃ৪৪)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেনঃ (শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম এবং আরো কতিপয় ওলামায়ে কেরাম-যাদের মধ্যে রয়েছেন শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ-কর্তৃক সাধারন মুসলমানদের প্রতি একটি আবেদন করেছেন যার মধ্যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের আবশ্যকতা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মোতাবেক শাসন করবে না তার হুকুমের কথাও রয়েছে এমন এক প্রবন্ধে বলেনঃ এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সমস্ত বান্দার প্রতি তাঁর কিতাব ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত থেকে বিমূখ থাকা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (সাঃ) বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার বিরূদ্ধে এক কঠোর হুশিয়ারী। এবং মহান রবের পক্ষ থেকে এ রায়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন করে না সে কাফের, জালেম, ফাসেক এবং মুনাফিক ও জাহেলি চরিত্রের অধিকারী। (ফাতহু শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম ৭৫৬/১৭)

আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন হামেদ আল কাফী (রহঃ) বলেনঃ সালফে সালেহীনের [পূণ্যবান পূর্ব পুরুষ] কথার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, যে জিনিস বান্দাকে আল্লাহর ইবাদত, আল্লাহর দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাঃ) আনুগত্য করা থেকে ফিরিয়ে রাখে তাকেই তাগুত বলে। চাই তা জ্বিন শয়তান হোক, অথবা মানুষ শয়তান হোক, গাছ হোক অথবা পাথরই হোক। নিঃসন্দেহে ইসলামী শরীয়তকে বাদ দিয়ে মানব রচিত যাবতীয় আইন যার মাধ্যমে মানুষ রক্ত ও সম্পদ শোষন করার জন্য শাসন করে থাকে এবং যা দ্বারা আল্লাহর শরীয়তকে বাতিল করা হয়। তাঁর বিধানকে অকার্যকর করা হয় বিচার ব্যবস্থায়, সুদ, জ্বিনা-ব্যভিচার এবং মদ হারাম করার ক্ষেত্রে। এ ছাড়া রয়েছে, যে উৎস থেকে এ সব মানব রচিত আইনগুলো গ্রহণ করা হয়েছে যা এ সব অবৈধ বিষয়গুলোকে হালাল করে, যা এ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইন বাস্তবায়নকারীকে রক্ষা করে। মানব রচিত আইনগুলো নিজেই তাগুত। এ আইনের প্রয়োগকারীরা এবং প্রচলনকারীরা তাগুত। আল্লাহর রাসূল (সঃ) যে মহা সত্য নিয়ে এসেছেন ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক সে সত্যের পরিপন্থী মানব মস্তিষ্ক প্রসূত গ্রন্থ ও গ্রন্থ রচনাকারীরা তাগুত।

শাইখ আবদুর রাজ্জাক আফীফী (রহঃ) তার الحكم بغير ما انزل الله নামক পুস্তিকায় আল্লাহর বিধান ছাড়া যারা শাসন করে, তাদের অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক আছে, ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি যদি মানুষের জন্য আইন রচনা করে এবং তাদের জীবনে তা কার্যকর করার জন্য এবং বিচার-ফয়সালা করার জন্য বিভিন্ন নিয়ম-নীতি তৈরী করে, অথচ সে জানে যে এগুলো ইসলামের পরিপন্থী তাহলে সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলাম থেকে সে সম্পূর্নরূপে খারিজ বা বহির্ভূত।

উপরোক্ত একই হুকুম বা রায় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে [অর্থাৎ মানব রচিত আইন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে] কোনো কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়, এবং যে ব্যক্তি এসব আইন ও বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দেয়। অথবা এগুলো ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী জেনেও অপরকে মানব রচিত আইনে বিচার-ফয়সালা করতে বাধ্য করে। (সুবহাতুন হাওলাস্ সুন্নাহ ৬৩পৃঃ)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উপমা সরকার অতিসত্তর অনুষ্ঠানাদি নিষিদ্ধ করণের আইন বাতিল করবে।

সরকারী সূত্র ঃ আল-ওয়াতান, সরকারের এই অভিপ্রায় জানতে পেরেছে, সংসদের বিগত বৈঠকে প্রথম আলোচনায় সংসদ সদস্যদের সম্মতিক্রমে শরীয়ত বিরোধী পোষাক ও বস্ত্রের মেলা অনুষ্ঠানাদি নিষিদ্ধের যে সিদ্ধান্ত হয় এবং এ আইনের বিরোধিতাকারীর জেল ও জরিমানা সংক্রান্ত বিল সরকার শীঘ্রই ফেরত পাঠাবে বা বাতিল করবে।

(আল -ওয়াতান ১০/৫/১৯৯৭ ইং সংখ্যায় প্রকাশিত)

আল্লামা শাইখ আবদুল লতিফ বিন আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ (রহঃ) বলেন ঃ নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পেরেছেন, যে এ মহান মূল্যের (কুরআনের) মধ্যে কি পরিমাণ ক্ষতি, এর প্রতি কতটুকু অবহেলা , তার হাকীকত (মূল শিক্ষা) থেকে বিমুখ হওয়া, এর প্রতি কি পরিমান দায়িত্ব অবহেলা সংঘটিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শিরকের প্রকাশ ঘটেছে। ইসলামের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে, এবং ইসলাম পন্থী বলে যারা দাবী করে তাদের মধ্যে শিরকের সকল উপায় উপকরণ পাওয়া যাচ্ছে। এর কতগুলো কারণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ঃ

আল্লাহ তায়ালার নিদের্শাবলীর হাকীকত বা মূলকথা এবং তাওহীদ ও ইসলামের মূলনীতির ব্যাপারে বান্দার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা। আর কোন্ জিনিস ইসলাম ও তাওহীদের বিপরীত বা পরিপন্থী, সে সম্পর্কে অথবা কোন্ জিনিস এর পরিপূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার বিপরীত।যেমন ঃ জীবনের বিভিন্ন শাখা ও পর্যায়ে আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন সম্পর্কে অজ্ঞতা।

যে সব বিষয় মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়; ঈমান ও তাওহীদ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় ইত্যাদি বিষয়গুলোও উক্ত কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর দুশমনদেরকে সাহায্য করা এবং যে কাজে তাদের ধর্মের প্রকাশ ঘটে, তারা যে গোমরাহী শিরক এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে নিয়োজিত তাতে সাহায্য, সহযোগিতা ও চেষ্টা সাধনা করা। সবচেয়ে বড় গুনাহ চরম গোমরাহী এবং ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী। এমনি ভাবে তাদের উদ্দেশ্যে মনকে প্রশস্ত করা, তাদের আনুগত্য করা তাদের প্রশংসা করা, তাদের বশ্যতা যারা স্বীকার করে নিয়েছে তাদের গুণকীর্তন করা, যারা তাদের আদর্শে একীভূত হয়ে গিয়েছে, তাদের সুনাম গাওয়া, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিত্যাগ করা, তাদের সাথে আপোষ করা, তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও আনুগত্যের চুক্তি করা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করা, তাদের সাথে একত্রে বসবাস ও চলাফেরা করা, গোমরাহী ও নিজেদের ঈমান ও তাওহীদ ধ্বংস করারই অন্তর্ভূক্ত।

যে সমস্ত সভা ও পরিষদ আল্লাহর আইন ও রাসুল (সঃ) এর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, ফেরেঙ্গী, নাসারা, ইহুদীদের আইন ও বাতিল আইন দ্বারা শাসনের নির্দেশ প্রদান করে, ইসলামী বিধান ও ইসলাম পন্থীদের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, তারা ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধেই মূলতঃ কাজ করে। আল্লাহর প্রতি যার সামান্যতম 'গাইরত'

www.pathagar.com

(মর্যাদা বোধ) রয়েছে, সে এ সব অশ্লীল কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের সাথে বসবাস করতে ও চলাফেরা করতে আতঙ্কিত হয়ে।

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আখেরাতকে বিশ্বাস করে তার উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা, তার কদম স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার ঈমান ও তাওহীদের হেফাজতের জন্য চেষ্টা সাধনা করা, সময় চলে গেলে আফসোস আর অনুতাপ তখন কোনো কাজে আসবে না। (আদ্ দুরার আস সুন্নিয়া পৃঃ ৮০)

কবি বলেন ঃ

খবর জানতে চাই আমি তাদের কাছে,
যারা এসেছে তাদের কাছ থেকে।
কি দেখেছো তোমরা ঐ
কুফরীতে নিমজ্জিত জাতির কাছে?
পশ্চাতে ঠেলে দিয়েছে তারা
মহান আল্লাহর কিতাবকে,
বদলিয়েছে তারা তার স্থানে
নাফরমানীর সেই বিধানকে।
নির্বোধ মগজে মেনে নিয়েছে তারা দেশের
সেই নিষ্ঠুর নেতৃত্ব ও বিধানকে
যে হুকুম ও বিধান বিরোধীতা করে,
প্রত্যাখ্যান করে মহা প্রভূর বিধানকে।
রচনা করেছে তারা সেই কানুন ও বিধান,
যার প্রতিপক্ষ থাকে অহি ও কুরআন,
কুফরীকে তারা নিয়েছে বদলিয়ে,
বিকিয়ে তাদের অমূল্য ঈমান।

কবি আরো বলেন ঃ

তাদের বিধান ও নীতিতে বাধা শুধু
বলপূর্বক ব্যভিচার পুরুষ ও নারীতে,
তাই চেয়ে দেখো কুফরীর সাগরে
অশান্তির আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ,
সংঘর্ষ তাই খোদার বিধানের সাথে
শান্তির পরশ নেই তাই মানবের হাতে।

আল্লামা শাইখ ইসহাক বিন আবদুর রহমান বিন হাসান আল-শাইখ (রহঃ) বলেন ঃ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে তাদের (কাফেরদের) দেশ সফর করা। এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে । কেউ কেউ কাফেরদের দেশে তাদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকে (শর্ত পূরণ না হলে) যারা অবৈধ মনে করে, তারা সেখানে সফর করাকেও হারাম ঘোষণা করেছেন। তবে তারা তার মতো নয় যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, এবং তারা যে গোমরাহী ও কুফরীর মধ্যে থেকে এসব কুফরী কর্ম প্রত্যক্ষ করে এবং কুফরী আইনে শাসন কার্য চালায়, শরীয়াতের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, আরো অসংখ্য নাফরমানী মূলক কাজে লিপ্ত থাকে।

তুমি কি ক্রুদ্ধ হবেনা,
আল্লাহর বিধানের তরে
যুগ যুগ ধরে যখন মুছে যায়

www.pathagar.com

তার আলামতগুলো
আল্লাহর যমীনের ওপরে ?
আহবানের কর্তব্যকে তারা বদলিয়ে দিয়েছে
করতালি দিয়ে
অহিকে বদলিয়েছে তারা
কুফরী আইনকে নিয়ে।

তৃতীয় উপমা ঃ মদ, জ্বিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে শরীয়তের শাস্তির বিধান কার্যকর করার জন্য নীতি মালা ঘোষণা করা হবে।

আগামী রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শরীয়তের শাস্তির বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে প্রস্তাবনা ও নীতিমালা ঘোষিত হবে। উল্লেখিত প্রস্তাবনা সংবিধানের ২৮০ নং ধারায় উপস্থাপিত হবে। সকল শরীয়তী বিধান এর আওতাধীন থাকবে।

আইনের এ বিল যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে সেগুলো হচ্ছে, মদ্যপান , জ্বিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা। (পত্রিকা ঃ আল ওয়াতান তাং ১/১/১৯৯৯ ইং)

উপরোক্ত পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ সংবাদ পাঠ দ্বারা এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, জাতি তাদেরকে (সংসদ সদস্যদেরকে) আইন প্রণয়ন করার সেই নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করেছে যে, অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। (অর্থাৎ যে সব অপরাধের শাস্তির বিধান পূর্ব থেকেই ইসলামে নির্ধারিত আছে, সে সব বিধানই কাট ছাট করে নতুন আঙ্গিকে কার্যকর করার ঘোষণা করার কথা বলা হয়েছে।) পাঠক, লক্ষ্য করুন উপরোক্ত খবরের কাগজে কি পরিমান প্রকাশ্য কুফরী, স্পষ্ট শেরেকী কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর বিধান ও তাঁর শরীয়তকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এবং রায় প্রদানের জন্য এ সমস্ত মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে । এর ফলে বিধানগুলো এ সব আইন প্রণয়নকারীদের স্বীকৃতি পাওয়ার পর জনগণের তা মানার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই যে, এসব আইন মানার ভিত্তি এটা নয় যে আইনগুলো আল্লাহ তায়ালার দেয়া এবং এগুলোর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তায়ালাই নির্দেশ দিয়েছেন। এ বরং এর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, জাতির আইন প্রণেতারা এর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এগুলো মানার জন্য মানব রচিত বিধি-বিধান জারী করা হয়েছে। এটা মূলত ঃ আল্লাহর শরীয়তের ওপর আরো একটি শরীয়ত প্রণয়ন করা । আল্লাহর আইনের ওপর আইন প্রণয়ন আল্লাহর সাথে শরীক হিসেবে আইন প্রণয়নের অপরাধের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ। কারণ অন্যের বিধানের ওপর বিধান রচনা করার অর্থ হচ্ছে পরবর্তী বিধান রচনাকারী পূর্ববতী বিধান রচনাকারীর চেয়ে যোগ্যতার দিকে থেকে উর্ধে । সর্ব শেষ বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তা কার্যে পরিণত করার জন্যই এ অবমূল্যায়নের সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ط وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ –

"তারা কি দেখতে পায়না যে আমি তাদের দেশকে চারদিক থেকে সমানে সংকুচিত করে আনছি। আল্লাহ তায়ালাই নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।" (রাদ ঃ৪১)

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেনঃ

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ–

"আসমান ও যমীনে যা কিছু লুকিয়ে আছে তার সবই আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। আর সব কিছুই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। অতএব তুমি তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁরই উপর ভরসা করো তোমরা যা কিছু করো সে ব্যাপারে তোমার রব উদাসীন বা বে-খবর নন।" (হুদ-১২৩)

ফুরকান নামক ম্যাগাজিন ৮ম বর্ষ, ১৯৯৬ ইং সনের আগষ্ট ১/৭৬ নং সংখ্যায় (মাতাবেক রবিউল আউয়াল ১৪১৭ হিঃ) সংশ্লিষ্ট ক্রোড়পত্রে আইন রচনাকারী পরিষদ, সংসদ এবং সংসদের রক্ষাকারীদের ব্যাপারে এক বিরাট প্রতিবেদন ছাপিয়েছে যার শিরোনাম ছিলো امرهم شورى بينهم

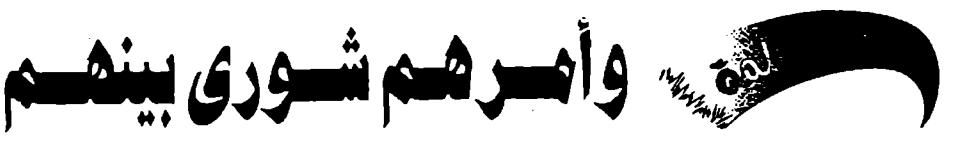
وأمرهم شورى بينهم

الشورى هي من مرتكزات وقواعد بناء دولة الكويت، فمنذ إنشاء الدولة قبل ثلاثمائة عام تعاهد الكويتيون على التزام منهج الشورى في بناء مجتمعهم، كما في قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)، وأصبحت كالعقد فيما بين الحاكم والمحكوم، كما في برلمان ١٩٣٦، والمجالس البلدية للتعاقبة والمنتخبة منذ عام ١٩٣٠، ثم تجسدت هذه الرغبة والقاعدة بدستور ١٩٦٢ وقيام مجلس الأمة بدوره التشريعي والرقابي، وبالرغم من العقبات المتعددة التي واجهت العمل البرلماني في الكويت، والأزمات التي مرت به متمثلة في تزوير لانتخابات ١٩٦٧، وحل للمجلس لعدة مرات آخرها في ١٩٨٦، إلا أن الشعب الكويتي ظل متمسكا بالعمل النيابي الى أن رجعت الحياة النيابية في عام ١٩٩٢ بعد تحرير الكويت، وأصبحت التجربة البرلمانية الكويتية متميزة بطرحها وممارستها، ليس على مستوى الخليج العربي فحسب، بل على مستوى العالم العربي والإسلامي ككل، واليوم وبعد انقضاء لربع سنوات على مجلس ١٩٩٢ وقرب الانتخابات البرلمانية في اكتوبر ١٩٩٦، ونظرا لاهمية المرحلة القادمة تصدر مجلة الفرقان بصفة اسبوعية - بحسب ترخيصها - وذلك لتغطية الانتخابات القادمة متمثلة بابواب مليئة من اللقاءات الصحفية الصريحة، والندوات والدراسات الهامة، واحصائيات حول الانتخابات السابقة، والآباء العام لبرلمان ٩٢، وذلك لوضع القارىء امام الصورة الحقيقية للانتخابات القادمة، وتعطي لأعضائه تصورا مستنيرا حول اداء المجلس السابق وتصورات للمرشحين الجدد وطموحات الناخبين واهم القضايا المطروحة على الساحة الانتخابية الكويتية لعام ١٩٩٦م، كل ذلك من وجهة نظر إسلامية تعي اهمية ذلك الحدث وآثاره على المجتمع الكويتي المسلم والعالم الاسلامي ككل.

والله الموفق لما يحبه ويرضاه.

একই ম্যাগাজিনের ৭৮তম সংখ্যার ৬৬ পৃষ্টায় "সংসদের প্রতিনিধিত্বশীল জীবন, জাতির (জনগণ) ও শাসকের যৌথ অংশ গ্রহণেরই প্রতিধ্বনি" "শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লেখা হয়েছে। সেখানে লেখা

www.pathagar.com

আছে ঃ ৭/১০/১৯৯৬ ইং তারিখে ভোটাররা জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি বাছাই করে নেয়ার জন্য প্রস্তাবনা তথা ব্যালট বাক্সের দিকে এগিয়ে যাবে। এ দেশ এ নীতি চালু করেছে মূলতঃ সংসদের প্রতিনিধিত্বশীল জীবনের সাথে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আগ্রহের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য, শুরায়ী (সংসদীয়) মূলনীতিকে নিশ্চিত করার জন্য। দেশটি তার শুরায়ী (পরামর্শ ভিত্তিক সংসদীয়) জীবন তখনই শুরু হয়েছে, যখন তার সূচনা থেকেই ১৭৫২ সনে জনগণ আগ্রহের ও আশা আকাংখার ভিত্তিতে তাদের রাষ্ট্র প্রধান নিবার্চন করেছে। সে লগ্ন থেকে অধ্যাবদি এ জীবন্ত প্রবাহ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

এ ব্যবস্থা একদিক থেকে জনসাধারণ ও সংসদ সদস্যদের (জন প্রতিনিধির) মাঝে পরস্পর সহযোগিতার এক অভিনব পদ্ধতি, অন্যদিক থেকে সরকার ও শাসক পরিবারের মধ্যে সেতু বন্ধনের এক অসাধারণ পথ ও পদ্ধতি।

১৯৬১ নং সাংবিধানিক স্মারকের মাধ্যমে জনগণের অংশ গ্রহণের বিষয়টিকে বদ্ধমূল করা হয়েছে। উক্ত সাংবিধানিক স্মারকে বলা হয়েছে, দেশের অখন্ডতা এবং দেশ শাসনের স্থিতিশীলতার দাবী হচ্ছে, গণতান্ত্রিক নীতিতে এমন একটি সংবিধান অন্বেষণ করা, যা মূলতঃ সংসদীয় এবং প্রেসিডেন্সিয়াল উভয় পদ্ধতির মাঝে একটি বিরাট সহানুভুতিশীল পথ রচনা করা।

শাসন নীতির একটি সাধারণ চিত্র পেশ করতে গিয়ে দেশের (দেশ বলতে কুয়েতকে বুঝানো হয়েছে) সংবিধানের ব্যাখ্যামূলক স্মারকে বলা হয়েছে ঃ وشاورهم فى الامر (কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন) আল্লাহ তায়ালার এ বাণী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলা হয়েছে وامرهم شورى بينهم (তারা পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে কাজ করে) আল্লাহ তায়ালার এ কথার ভিত্তিতে পরামর্শ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে রাসুল (সঃ) এর সুন্নাত প্রতিষ্ঠা কল্পে, সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের ইসলামী ঐতিহ্য অনুসরণের নিমিত্তে শাসন নীতির ভিত্তিকে মজবুত করার মানসে, উন্নয়ন নীতির আহবানে সাড়া দেয়ার অভিপ্রায়ে, আধুনিক মানব চিন্তার উপকার সাধনের জন্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর জন্য, তথা এ সব যাবতীয় বিষয়কে অর্থবহ করে তোলার জন্যই দেশের সংবিধান রচনা করা।

সংবিধান রচনা ও সংরক্ষণকারীদের প্রশংসা করতে গিয়ে "ফুরকান" নামক ম্যাগাজিনটি আরো বলেছে যে, তাদের কাজের ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক পরামর্শ, সাথে সাথে امرهم شورى بينهم এ আয়াতটি দ্বারা নিজ কথার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছে।

এর ওপর আমাদের মন্তব্য প্রসংগে বলতে চাই, সংসদ সদস্য তথা জনপ্রতিনিধিদের অবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে তারা مشرع আইন প্রণেতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আইনে তারা যেমন চান, যেভাবে চান, সেভাবে রচনা করতে পারেন, তারা আল্লাহর আইনকে পশ্চাতে ফেলে পদবী লাভ ও অন্যান্য স্বার্থের বিনিময়ে অতি অল্প দামে বিক্রি করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। তারা বিচার-ফয়সালা চায় সংবিধানের তথাকথিত ৬২নং ধারায়, যা জনগণের আইন বা শাসন নামে খ্যাত। এটা তাদের ভাষায় ডেমোক্রেসীকে বাস্তবায়নের জন্য করা হচ্ছে। ডেমোক্রেসী মূলতঃ গ্রীক শব্দ ডেমোস (অর্থাৎ জনগণ) গ্রামোস (অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা বা আইন) থেকে উৎসরিত হয়ে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে "ডেমোক্রেসীতে" রূপ লাভ করেছে। তাই ডেমোক্রেসী এর আক্ষরিক তরজমা হচ্ছে জনগণের আইন, জনগণের ক্ষমতা অথবা জনগণের বিধান। ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাসী লোকদের কাছে এটাই হচ্ছে (সব কিছুর উৎস জনগণ) ডেমোক্রেসীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট। এ কারণেই তারা এর ভুয়সী প্রশংসা করে। শিরক, কুফর এবং বাতিল, (অসত্য) যা দ্বীন ইসলাম ও মিল্লাতে তাওহীদের (একাত্ববাদে বিশ্বাসী জাতির) চরম পরিপন্থী তারও ঠিক একই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-

"তারা তাদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে। এভাবে মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও (রব বানিয়ে নিয়েছে) অথচ তাদেরকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তারা যে সব শিরকী কথা বার্তা বলে। তা থেকে তিনি সমপূর্ণ পবিত্র।"

(আত-তাওবাহ ৩১)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সেই দ্বীনকে ঠিক করে দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেন নি ? যদি ফয়সালার সময় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত না থাকতো তাহলে এতদিনে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেতো। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে পিড়াদায়ক শাস্তি।" (আশ-শুরা ঃ ২১)

আয়াতে اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا দ্বারা তাদের কি আছে? এখানে হামযা লওয়া হয়েছে তিরষ্কারের জন্য। একটি মুসলিম দেশের সংবিধানের দু নম্বর ধারায় এসেছে, (আল-ফুরকান নামক ম্যাগাজিনটি ভূয়সী প্রশংসা করেছে), ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে বিধান প্রণয়নের প্রধান উৎস। যে ব্যক্তি ভাষা বুঝেন তিনি সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছেন যে, তাদের কাছে ইসলামী শরীয়ত ছাড়া আইন প্রণয়নের আরো কতিপয় উৎস রয়েছে। ইসলামী শরীয়ত আইন রচনার প্রধান উৎস ছাড়াও তাদের কাছে আরো

www.pathagar.com

আনুসাঙ্গিক উৎস রয়েছে। এমতাবস্থায় সংবিধানের ধারাটিতে এ কথা স্বীকার করা হয়নি বা এ কথার স্বাক্ষ্য দেয়া হয়নি যে لا اله الا الله আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। বরং যা স্বাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে তা হয়েছে واشهد ان الله اله من الالهة الرئيسية وان معه الهة رئيسية وفرعيه اخرى আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, প্রধান প্রধান ইলাহদের মধ্যে আল্লাহ একজন ইলাহ আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁর সাথে আরো প্রধান ইলাহ ও অন্যান্য বিভাগীয় ইলাহও রয়েছে। এটা মূলতঃ উলুহিয়্যাতের মধ্যে এক ধরণের শিরক এবং এর মধ্যে রুবুবিয়্যাতের শিরকও অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত সংবিধানের দ্বিতীয় ধারার ব্যাখ্যা সম্বলিত এক স্মারকের মধ্যে এসেছে" যদি বলা হয় " ইসলামী শরীয়তই হচ্ছে আইন প্রণয়নের একমাত্র প্রধান উৎস " এ কথা যেন প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, যেহেতু একথার দাবী হচ্ছে শরীয়ত বিরোধী যে কোনো বিষয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে আইন গ্রহণ করা বৈধ নয়, এ নির্দেশক্রমে আইন প্রণেতা যেনো বিরাট সংশয়ে বা দ্বিধা দ্বন্ধে পতিত না হয়।

পাঠক লক্ষ্য করুন, তাদের চরম দ্বিধা দ্বন্ধের বিষয় হচ্ছে জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর হওয়া। এটা সরাসরি কুফরী ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

فَلَا وَ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

"হে মুহাম্মদ (সঃ), তোমার রবের কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়গুলোতে তোমাকে বিচারপতি হিসেবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা দিবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করবে না বরং তা হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে নিবে।" (আন নিসাঃ ৬৫)

উক্ত আয়াতে (সংশয়) শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন। বাক্যের মধ্যে শব্দ প্রয়োগের ধরন হচ্ছে "না" বোধক অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা বুঝানো। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) আইন ও ফায়সালার মধ্যে বড় হোক, ছোট হোক কোনো ধরণের সংশয়ের বিন্দু মাত্র অবকাশ থাকতে পারবে না। থাকলে সেটা হবে ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিপন্থী। যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সঃ) কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা সংকোচ থাকাটা মূল ঈমান ও ইসলামের পরিপন্থী এবং ঈমান না থাকার শামিল হয়, তাহলে বিধান রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার ক্ষেত্রে যদি দ্বিধা সংকোচ থাকে, তাহলে তার ঈমান ও ইসলামের অবস্থা কি হতে পারে? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ-

www.pathagar.com

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সেই দ্বীনকে ঠিক করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেন নি ?"

(আশ-শুরা ঃ ২১)

উপরোক্ত আয়াতের شُرَكٰٓؤُا শব্দটির দিকে লক্ষ্য করুন। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে তারা আল্লাহ তায়ালার রুবিয়্যাতের সাথে নিজেদেরকে "রব" বানিয়ে নিয়েছে।

একই স্থানে স্মারকে, মধ্যে তারা বলেছে ঃ উল্লেখিত উদ্ধৃতিতে পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়তের বিধি বিধান অবিলম্বে বা বিলম্বে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই এবং আইন প্রণয়নকারী যদি সকল বিষয়ে প্রয়োজন মনে করে তাহলে তা গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি এখানেই সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক, যদি আমরা তর্কের খাতিরে একথা মেনে নেই যে, তারা শরীয়তের কতিপয় বিধান একদিন না একদিন কায়েম করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তাহলে তাদের দ্বারা বিধান মেনে নেয়ার বিষয়টি আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর কাছে আত্মসর্ম্পনের দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে সম্পন্ন হয়নি বরং তা হয়েছে আইন প্রণয়নকারী তাগুতের ইচ্ছা এবং তার কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আনুগত্যের খাতিরে।

সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও শক্তির মালিক হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী আমীর (প্রেসিডিন্ট) এবং জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট।

৬ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ আমাদের শাসন নীতি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। নেতৃত্বের অধিকারী হচ্ছে জাতি। আর জাতি হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস। সংবিধানে বর্ণিত দিক নির্দেশনা মোতাবেক নেতৃত্বের চর্চা সম্পন্ন হবে।

৭৯ নং নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ঃ কোনো আইন সংসদের অনুমোদন এবং আমীরের (প্রেসিডেন্টের) সত্যায়ন বা স্বীকৃতি ছাড়া জারি হবে না।

৩২ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ কোনো অপরাধ এবং কোনো শাস্তি আইনগত ভিত্তি ছাড়া ধর্তব্য হবে না। কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের উল্লেখ সংবিধানে না থাকলে কোনো শাস্তি হবে না।

৭৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ আমীর (প্রেসিডেন্ট) তার ক্ষমতা বলে কোনো শাস্তি মার্জনা কিংবা লঘু করতে পারবেন। আর সাধারণ বা ব্যপক ক্ষমা আইন ছাড়া পারবেন না।

১৮০ নং ধারায় বলা হয়েছে এ সংবিধান কর্তৃক গৃহিত সকল আইন, কানুন রীতি-নীতি নির্দেশাবলী ও সিদ্ধান্ত ততক্ষন পর্যন্ত আমলে নেয়া হবে এবং কার্যকর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি মোতাবেক পরিবর্তন বা সংশোধন কিংবা বাতিল ঘোষণা না করা হয়। এখানে শর্ত হচ্ছে তা যেনো সংবিধানের কোনো বক্তব্যের পরিপন্থী না হয়।

www.pathagar.com

১০৯ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত যে আইনের বিল সংসদ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবে সংসদ অধিবেশনের একই সেশনে দ্বিতীয় বার (সংসদে) উপস্থাপন করতে পারবেনা।

১১০ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ সংসদ সদস্যের কাছে উদিত যে কোনো মতামত, চিন্তা পরিষদ কিংবা কমিটির কাছে পেশ করার ব্যাপারে তিনি স্বাধীন। কোনো অবস্থাতেই এর জন্য তাকে জবাব দিহি করা বৈধ নয়।

২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ মানব মর্যাদার দিক থেকে সকল মানুষ সমান। জাত অথবা মূল, অথবা ভাষা অথবা ধর্মের দিক থেকে কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ মিরাস (উত্তরাধিকার) একটি অধিকার, ইসলামী শরীয়ত এর ফয়সালা করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ-

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো?"

৯১ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ কোনো সদস্য জাতীয় পরিষদে (সংসদে) তার কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বে পরিষদের প্রকাশ্য অধিবেশনে পরিষদের সম্মুখে নিম্মোক্ত শপথ গ্রহণ করবে ঃ আমি মহান আল্লাহ তায়ালার নামে শপথ করছি যে, আমি দেশের জন্য এবং আমীর (প্রেসিডিন্টের) জন্য একনিষ্ঠ থাকবো। আমি সংবিধান এবং রাষ্ট্রীয় আইনকে শ্রদ্ধা করবো। জনগণের স্বাধীনতা, তাদের স্বার্থ ও সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে আমি সচেষ্ট থাকবো। আমি আমার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য আমানতকারী এবং সত্যতার সাথে পালন করবো।

৬৮ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ আমীর (প্রেসিডিন্টে) প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করবেন। তবে আক্রমনাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ।

১৮৫ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ শাস্তিমূলক আইনের একটি হচ্ছে, এ দেশ থেকে দাস হিসেবে কেউ কাউকে বের করলে কিংবা এ দেশে ঢুকাতে চাইলে, বা আচরণে তা প্রমাণিত হলে যে ব্যক্তি কোন মানুষকে দাস হিসেবে ক্রয় করতে অথবা বিক্রির জন্য পেশ করবে, অথবা দাস হিসেবে কোনো ব্যক্তিকে কেউ উপহার দিলে এর শাস্তি হিসেবে অনধিক পাঁচ বছর তাকে জেলে থাকতে হবে এবং অনধিক পাঁচ হাজার রূপী জরিমানা দিতে হবে অথবা দুই শাস্তির যে কোনো একটিকে গ্রহণ করতে পারে।

এ সব ধারা এবং আইন কানুন দ্বারা জেহাদের মতো আরো অনেক নির্দেশাবলী অবৈধ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা জায়েজ করেছেন এমন কতিপয় বিষয় ও হারাম হয়ে যায়। যেমন ঃ দাস-দাসী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করা। এ ছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা এ ধারা ও আইন দ্বারা

www.pathagar.com

হারাম হয়ে যায়। আবার এমন হারাম বিষয় আছে যা এ সব ধারা ও আইন দ্বারা হালাল হয়ে যায়, যেমন ঃ সুদ , জিনা-ব্যাভিচার ইত্যাদি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয় (রহঃ) বলেন ঃ কোনো কিছু ফরজ করা এবং হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার এবং তাঁর রাসুলের (সঃ) । তাই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের (সঃ) নির্দেশ ছাড়া যে ব্যক্তিকে শাস্তি দিলো এবং তা আইন বা নীতি হিসেবে গ্রহণ করলো সে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বা সমকক্ষ বানিয়ে নিলো এবং অন্যকে নবীর সমকক্ষ বানিয়ে নিলো, যেমনিভাবে মুশরিকরা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে ছিলো আর মুসাইলামাতুল কাযযাব (মিথ্যা নবী) কে রাসুল (সঃ) এর সমকক্ষ বানিয়েছিলো। এরা তাদেরই পর্যায়ভূক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ-

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য সেই দ্বীনকে ঠিক করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেন নি।"

(আশ শুরা ঃ২১)

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ)

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ-

"নিশ্চয়ই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ শুধুমাত্র কুফরীর মাত্রাকেই বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেররা গোমরাহীতে পতিত হয়। তারা একে হালাল করে নেয় এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর গণনা পূর্ণ করে নিতে পারে। অতঃপর তারা হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে হেদায়াত করেন না।" (আত তাওবাহ ঃ ৩৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে সে ভাষার একটি হিকমত (কৌশল বা পান্ডিত্য) কোনো জিনিসের زيادة (যার অর্থ বেশী বা অতিরিক্ত) এর অর্থ হচ্ছে উক্ত জিনিসেরই অংশ। জিনিসটির বহির্ভুত কিছু নয়। অতএব কোনো মাসকে তার নির্ধারিত সময় থেকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী এটাই প্রমাণিত হলো। এটা এমন কাজ যা দ্বারা আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত জিনিস হালাল করে অথচ সে জানে যে জিনিসটি আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, তাহলে সে এ কর্মের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

প্রিয় পাঠক, তাঁর কথা লক্ষ্য করুন ঃ "এটি এমন একটি কাজ এবং আল্লাহর তায়ালার হারামকৃত জিনিসকে হালাল করে অথচ সে জানে যে, জিনিসটি আল্লাহর তায়ালা হারাম করেছেন।"

এতে শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, কোনো সময় আমল বা কর্ম ব্যতীত কেবল বিশ্বাসগতভাবে استحلال (হারাম হালাল করার ইচ্ছা বা বাসনা) হতে পারে। আবার কখনো বিশ্বাস ও কর্ম একত্রে হতে পারে। আবার কখনো শুধুমাত্র কর্মও সংঘটিত হতে পারে। হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে বিশ্বাস থাকার বিষয়টি শুধু কুফরীর সাথেই সীমাবদ্ধ নয় বরং কুফরীর চেয়েও বেশী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মদ্যপান অথবা জ্বিনা ব্যভিচারে পতিত হওয়া এবং সুদ খাওয়া আর এগুলোর জন্য বিভিন্ন আইন কানুন, রীতি নীতি রচনা করা , যার দ্বারা আল্লাহর নির্ধারিত আইনের সীমা রেখা পরিবর্তন করা হয়, অথবা মদ্যপান ও জ্বিনা-ব্যভিচার সহজ করে দেয়া হয়, অথবা মুরতাদ হওয়ার বৈধতার জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়, অথবা সুদের অনুমতিসহ এ সব অবৈধ বিষয়গুলোর পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষনের জন্য দেশ শাসনের নীতি হিসেবে সভা সম্মেলনের মাধ্যমে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়! কখনো সমান অপরাধ হতে পারে না। প্রথম বিষয়টির (অর্থাৎ হালালকে হারাম আর হারামকে মনে না করে মদ্য ও ব্যভিচারের মতো অন্যায় কাজে পতিত হওয়ার) ক্ষেত্রে কাফের বলার ব্যাপারে হালাল মনে করে পাপ কাজটি করা হয়েছিলো কি না এ বিষয়টি অবশ্যই দেখতে হবে, কারণ এ সব গুনাহ করলেই কাফের হয়ে যায় না।

আর দ্বিতীয় বিষয়টি আইন রচনা, হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এতেকাদ বা বিশ্বাসের দিকে কোনো দৃষ্টিপাত করা হবে না। এ সব কাজ যে করে সে যদি হাজার হাজার বার কসম করেও বলে যে, হারামকে হালাল মনে করে এ সব করিনি তবু তার কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ-

এ সব লোকদেরকে বলা হবে,আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করেছেন, তোমাদের ঈমানকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিছক দাবী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি নিছক গুনাহের কাজ মনে করে সুদের কারবার করে, আর যে ব্যক্তি সুদের কারবার করার জন্য অনুমতি বা লাইসেন্স দেয়, এর জন্য আইন রচনা করে, সুদী প্রতিষ্ঠান সমূহের হেফাজত করে, এর প্রতি তাগিদ দেয়, পরিভাষা তৈরী করে, তার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি শুধু মদ পান করে, আর যে ব্যক্তি মদ্য পানের লাইসেন্স দেয়, মদ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য দোকানের অনুমতি দেয়, দোকান সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে, তার নিজস্ব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির সীমা রেখাকে পরিবর্তন করে, তার মধ্যেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় ও অশ্লীল আহবানে সাড়া দিয়ে অপরাধ বা অন্যায় মনে করে ব্যভিচার পতিত হলো, আর যে ব্যক্তি জিনায় খোদা প্রদত্ত সীমা রেখাকে পরিবর্তন করলো এবং এমন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পতিতাদের জন্য ব্যভিচারকে বৈধতার অনুমতি দিলো, যে আইন কেবল স্বামীর ক্ষেত্রে জেনাকে অন্যায় বলে বিবেচনা করে। কেননা উক্ত আইনে স্বামীর অনুমতিতে জিনা করলে তা অন্যায় হিসেবে গণ্য নয় এবং এর জন্য কোনো শাস্তির বিধানও নেই। বরং তার কাছে এ কাজ বৈধ তার মধ্যেও রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

অতএব বিধান রচনা করা, হালালকে হারাম করা অথবা হারামকে হালাল করা নির্ঘাত কুফরী কাজ। এসব কুফরী কাজ ঐসব গুনাহর মত নয় যে গুলোতে কাফের সাব্যস্ত করার জন্য استحلال (হারামকে হালাল মনে করা) এর আক্বীদা শর্ত। এ সব কাজে আক্বীদার বিষয়টি যোগ করা যেতে পারে শুধু কুফরীর আধিক্য বুঝানোর জন্য। এ কাজ নির্ভেজাল কুফরী। এখানে কুফরী সাব্যস্ত করার জন্য আক্বীদার প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে কুফরী সাব্যস্ত করার জন্য আক্বীদা বা বিশ্বাস শর্ত নয়। যে সব মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসগুলোকে (যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ যেমন মহররম) অন্য সময় দ্বারা পরিবর্তন করে যুদ্ধের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তারা একথা জানতো এবং মনের গভীরে বিশ্বাস করতো যে, সেগুলোই প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ মাস যেগুলো আল্লাহ তায়ালার কাছে নিষিদ্ধ। তারা যে মাসগুলোকে নিষিদ্ধ হিসেবে অবিস্কার করেছে এবং পরিবর্তন করেছে সেগুলো নিষিদ্ধ মাস নয়। এমনি ভাবে ইহুদীরাও এ ধারনাই পোষণ করতো যখন তারা জিনার "হদ" বা শাস্তিকে নিজের মন গড়া আইন দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলে ছিলো। তারা কিন্তু জিনা হালাল মনে করেনি। তারা এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন কিংবা আইনের পরিবর্তন সাধনের জন্য এ ঘোষণা দেয়নি যে, তারা অন্তর দিয়ে জিনা হালাল মনে করে। এখানে আইন প্রণয়ন এবং আল্লাহর আইনে পরিবর্তন সাধনের কাজটিই হচ্ছে কুফরী। অতএব তারা এখানে যাই বলুকঃ আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত মাসগুলোই প্রকৃত পক্ষে নিষিদ্ধ মাস। আল্লাহর কথাই ঠিক অথবা জিনার শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানই ঠিক ও সত্য। এখানে আক্বীদা বিশ্বাসের উল্লেখ করার কোনো মূল্য নেই। তবে আক্বীদার কথা উল্লেখ করলে তা হবে শুধু কুফরীর আধিক্য বুঝানোর জন্য।

আমি বলছি এ ক্ষেত্রে দলীল ও প্রমাণ হচ্ছে, যা ইমাম আহমাদ এবং নাসায়ী যা বর্ণনা করেছেন। আর তা হচ্ছে হযরত বাররা বিন আযিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার খালু বুরদা এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তাঁর সাথে তখন ঝান্ডা ছিলো। তখন তিনি (তাঁর খালু) বললেন ঃ আমাকে রাসূল ঐ ব্যক্তিকে হত্যা ও তার সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি নিজের বাপের স্ত্রীকে বিয়ে করেছে । (আহমাদ নাসায়ী (নিকাহ নামক অধ্যায়) পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪/২৯৫, ৬/১০৯,১১০,

ইবনু আবি খাইছামা তাঁর তারিখে (ইতিহাসে) মুয়াবিয়া বিন কুবরা তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল

www.pathagar.com

(সঃ) তাঁকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে ছিলেন যে তার বাপের স্ত্রীর সাথে বাসর করেছিলো (অর্থ্যৎ বিয়ে করেছিলো) অতঃপর রাসূল (সঃ) এর নির্দেশে ঐ ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করলেন। এবং গনিমতের মাল হিসেবে তার সম্পদ নিয়ে নিলেন। ইবনূল কায়্যিম বলেছেন, ইয়াহ ইয়া বিন মুঈন বলেছেন ঃ এ হাদীসছি ছহীহ।

(তিরমিজী ১৩৬২ নং হাদীস, আবুদাউদ নং হাদীস ৪৪৫৭)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন ঃ আবু বারদাহ বিন নায়ারের হাদীসও এ বিষয়ের একটি দলীল। তাঁকে যখন রাসূল (সঃ) সেই ব্যক্তির কাছে পাঠালেন যে নিজ পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলো। রাসূল (সঃ) তাঁকে ঐ ব্যক্তিকে হত্যার এবং তার সমপদ গনিমত হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দিলেন, মালে গণিমত হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ একথারই প্রমাণ পেশ করে যে, ঐ ব্যক্তি কাফের ছিলো ফাসেক নয়। তার কুফরীটা ছিলো এইযে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, সে তা হারাম করেনি। (মাজমুআ ফতোয়া ৯০/৯১পৃঃ)

আল্লামা শাইখ হামাদ বিন আতীক (রহঃ) তাঁর الدفاع عن اهل السنة والاتباع নামক পুস্তিকায় বলেন ঃ অষ্টম দিক হচ্ছে যা ইমাম আহমাদ এবং নাসায়ী হযরত বাররা বিন আযিব থেকে বর্ণনা করেছেনঃ তিনি বলেনঃ আমার খালু আবু বুরদার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তখন তাঁর সাথে ঝান্ডা বা পতাকা ছিলো। তিনি বললেন ঃ রাসূল (সঃ) আমাকে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তার সম্পদকে হস্তগত করার জন্য পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। ইবনু খাইছামা তাঁর ইতিহাসে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি মুয়াবিয়া বিন কুবরা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সঃ) তাকে [দাদাকে] এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিলেন যে তার পিতার স্ত্রীর সাথে বাসর করছিলো (অর্থাৎ বিয়ে করেছিলো।) অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করলেন এবং গনিমত হিসেবে তার মাল নিয়ে নিলেন (অর্থাৎ বাইতুল মালে জমা দিলেন)।

ইমাম আহমাদ যে ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করে অথবা কোনো মাহরামকে (এমন স্ত্রী লোক যাকে বিয়ে করা শরীয়তে হারাম যেমন মা,খালা, ফুফু নিজের বোন) বিয়ে করে তার ব্যাপারে বলেছেন যে, তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সম্পদ বাইতুল মালে জমা দেয়া হবে। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, যে ব্যক্তির কাছে থেকে আল্লাহর হারাম বিষয়গুলোর হালাল মনে করে কোনো কাজ করা প্রকাশ পাবে সে ব্যক্তি কুফরীতে লিপ্ত এবং সে হত্যার যোগ্য। এমতাবস্থায় অন্তরে তার কুফরী আছে কিনা, তা জানা শর্ত করা হয়নি। এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক ওলামায়ের পক্ষ থেকে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) (আদদিফায়ু আন্ আহলে সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবাহ ৭৬পৃঃ)

এখানে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাহরামের সাথে জিনাকার ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ) আর মাহরাম ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

(যাকে বিয়ে করা হারাম) যে বিয়ে করে তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন । প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাপী এবং কবিরাহ গুনাহ করার অপরাধে অপরাধী। তবু সে মুসলিম মিল্লাহ থেকে খারিজ হবেনা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (মাহরাম কে বিয়ে করে) সে কাফের। উপরে বর্ণিত হাদীস গুলোই এর প্রমান। সবগুলো বর্ণনাতেই প্রমাণিত হয়েছে, যে পিতার স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে তারা খারিজ করে দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। তারা তাকে একথা জিজ্ঞেস করেনি, সে তার পিতার স্ত্রীকে হালাল মনে করে বিয়ে করেছে কিনা। অতএব এখানে প্রমাণিত হলো যে استحلال হারামকে হালাল মনে করার বিষয়টি আমল বা কর্মের মাধ্যমে সব্যস্ত হয়েছে।

শাইখ আহমাদ শাকের (রহঃ) তাঁর ওমদাতুতাফসীর নামক কিতাবে

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ-

"যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।" (আল বাকারাহ ঃ ২৭৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন

لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبـــــه-

আল্লাহ তায়ালা সুদ খোর, সুদ দাতা, সুদ লেনদেনের স্বাক্ষ্য প্রদান কারী এবং সুদের লিখকের ওপর অভিসমপাত করেছেন। তারা বলেন ঃ স্বাক্ষ্য প্রদান এবং লেখার কাজ তো তখনই হবে যখন তা বৈধ চুক্তি নামা হিসেবে প্রকাশ করা হবে, আর তার অভ্যন্তরটা হবে ফাসেদ (বাতিল, বিশৃংখল ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী)। অতএব এখানে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এর অর্থ বা মূল বিষয়, সূরত বা অবয়ব নয়।

শাইখ বলেন ঃ এটা তো ছিলো তখনকার কথা, যখন মুসলমানদের দেশে ইসলামের স্বার্থে আইন বলবৎ ছিলো। সেসময় যে ব্যক্তি নাফরমানী করতো এবং তা থেকে বের হতে চাইতো তখন সে প্রকাশ্য সহীহ আমলের কৌশল অবলম্বন করতো আর বর্তমান সময়ে অধিকাংশ দেশই ইসলামে নিজেদের সম্পর্কের দাবী করে এবং ইসলামী দেশ বা রাষ্ট্র হিসেবে দেশের নামকরণ করে অতঃপর দ্বীন ইসলাম বাদ দিয়ে মানব রচিত আইনে দেশ শাসন করে। পৌত্তলিক খৃষ্টান আইন এবং নাস্তিক্যবাদী আইন থেকে চয়নকৃত আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করা হয়। এ সব শাসকেরা এতটুকু নির্লজ্জ যে প্রকাশ করার জন্য বাহ্যিক সহীহ আমলের প্রয়োজন বোধ করে না বরং তারা বীরদর্পে প্রকাশ্যে চুক্তিনামাগুলো লেখেন বা সম্পাদন করেন। (অর্থাৎ গুণাহ পাপ ও নাফরমানী কারার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুভূতি চরমভাবে লোপ পেয়েছে) । (উমরাতু তাফসীর ১৯৭/৭পৃঃ)

আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন হামিদ আল-ফকী (রহঃ) ফতহুল মজিদ নামক কিতাবের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তাগুতের প্রকারবেদ

www.pathagar.com

উল্লেখ করার সময় বলেন ঃ নিঃসন্দেহে এর (তাগুতের) অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে, ইসলাম বর্হিভূত বিদেশী আইন ও বিধান এবং মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত নিয়ন্ত্রন করার জন্য মানব রচিত যাবতীয় আইন যা দ্বারা আল্লাহর শরীয়তকে অকার্যর করা হয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির বিধান কায়েম করা, সুদ, জ্বিনা, মদ ইত্যাদি হারাম করা বিষয়কে বাতিল করা হয়। যা থেকে এসব মানব রচিত আইন গৃহিত হয়েছে, যা হারাম বিষয়গুলোকে হালাল করে, এগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে হারাম বিষয় গুলোর হেফাজত করে এবং প্রয়োগকারীদেরকেও রক্ষা করে, এসবই তাগুতের অর্ন্তভূক্ত। এ সব আইনগুলো নিজেও তাগুত, এর প্রণয়ন কারীরাও তাগুত এবং এর প্রচলন বা বাস্তবায়ন কারীরাও তাগুত। রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত সত্য (ইসলামী শরীয়ত) থেকে দূরে সরানোর জন্য মানব মস্তিষ্ক প্রসূত যাবতীয় কিতাব বই পুস্তক ও লিখনী তাগুতের অর্ন্তভূক্ত । চাই ইচ্ছাকৃত ভাবে লেখা হোক, অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক, সর্বাবস্থায় সে তাগুত।(ফাতহুল মাজিদ ৩৪৭-৭৬৯)

শাইখ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রাহমান আল জাবরাইনকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন করেনা এবং এ বিষয়ে যারা استحلال এবং আক্বীদা কে শর্ত করে তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ "যারা এ বিষয়ে আক্বীদার শর্তারোপ করে, তাদের ব্যাপারে আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। এটা এ জন্য যে আমরা মেনে করি, যে ব্যক্তি কোনো জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ ছাড়া এবং হত্যার কোনো হুমকি ছাড়া কোনো হারাম কাজ করে, যদি দেখা যায় সে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং খুশীর সাথে প্রশস্ত বুকে কাজ করে যাচ্ছে, তাহলে আমরা বলবো সে হারাম কাজকে হালাল মনে করেই কাজ করছে। এবং সে একাজটাই অন্য কাজের চেয়ে বেশীভাল মনে করছে বলে যদি প্রতিয়মান হয়, তাহলে আমরা তার বহ্যিক আমলের ওপরই রায় প্রদান করবো। আর যদি সে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে একথা বলে যে , আমি এ কাজটিকে হালাল মনে করিনা। আমি অবৈধ কাজটি করি তবে কাজটি যে না জায়েয তা বিশ্বাস করি। তার পরও সে উক্ত কাজ বাস্তবে পরিণত করে, উক্ত কাজের প্রতি তার ঝোক প্রবনতা আছে, সে প্রকাশ্যে অন্য কাজের চেয়ে উক্ত কাজটিকে অগ্রধিকার দেয়, তাহলে আমরা তার একথাকে সত্যবলে মেনে নিবোনা, কেননা তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং আমরা তাকে বলবোঃ তুমি বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিশ্চিন্ত মনে, নির্দ্বিধায় তোমার কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছো। অতএব তুমি তোমার কাজকে হালাল মনে করে করছো না, এ কথা আমরা গ্রহণ করতে পারছিনা। আমরা বাহ্যিক আমলের ওপরই রায় দিবো। আর তা হচ্ছে তুমি হারাম কাজকে হালাল মনে করেই করে যাচ্ছো। তোমার অন্তরের খোজ খবর নেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। কেননা রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

انى لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم-

"মানুষের অন্তর পরীক্ষা করা আর তাদের পেট কেটে দুভাগ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আমলের ওপর রায় দিবো বা বিচার করবো। আমাদের কাছে যে ব্যক্তি তার ভাল দিকটা প্রকাশ করবে, আমরা তার ভাল দিকটাকে ভিত্তি করে তাকে ভালবাসবো আর যে ব্যক্তি আমাদের কাছে তার খারাপ দিকটা প্রকাশ করবে আমরা তদানুযায়ী তার প্রতি আচরন করবো।

বিরোধীদের প্রতি আহবান

সার কথা হচ্ছে যারা এ ধরনের কাজ করবে, আমরা তাদেরকে বলবোঃ হারামকে হালাল মনেকরেই কাজ করেছে, কারণ তারা তাদের হারাম কর্মের ব্যাপারে দ্বিধাহীন ছিলো, নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে তারা কাজ করেছে। তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে কাজ করেছে, সে কাজের ভিত্তিতেই তাদের বিচার করা হবে। তারা হারামকে হালাল মনে করে কাজ করেনি, তাদের এ কথা বিবেচনার যোগ্য নয়। (ইছতেহলাল) বিষয়টি তাদের বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমেই প্রমাণিত হবে। তাদের আমল দ্বারা তা সম্পন্ন হয়েছে । (আকওয়ালুল ফিমা বাদদালা আস সারআ)

আইন প্রণয়ন ও বিধান রচনা সংবিধানে উল্লেখিত কুফরী ধারার কতিপয় নমুনা বর্ণনা করার মাধ্যমে এ বিষয়ই আমরা পেশ করতে চেয়েছিলাম। এর দ্বারা বিধান রচনা ও আইন প্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের স্বরূপ সুস্পষ্ট ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তারা আল্লাহ তায়ালার আইন রচনার নিরঙ্কুশ অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নিজেদেরকে তাঁর শরীক, সৃষ্টির রব এবং তাগুত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিজেদেরকে আইন দাতা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকে কে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী আর কে সংস্কারক এর মধ্যে কোনো পার্থক্য বা ব্যবধান নেই। কেননা তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে এবং নিধারিত সীমা লংঘন করেছে। তাওহীদবাদী মুসলমানের উচিৎ তাদেরকে অস্বীকার করা এবং তাদের কাছ থেকে মুক্ত থাকা। যে ব্যক্তিই তাদেরকে আইন ও বিধান রচনা করার স্থানে বসাবে, পদবী দান করবে, বাছাই করবে, প্রার্থী বানাবে, সে আল্লাহর রুবুবিয়্যত এবং উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে মুশরিক বা শিরককারী হিসেবে বিবেচিত হবে, চাই সে সৎ নিয়তেই এ কাজ করুক, অথবা খারাপ নিয়তেই করুক। আমাদের এ বক্তব্যের যারা বিরোধীতা করবে তাদেরকে আমরা **চারটি** বিষয়ের প্রতি আহবান জানাবো। **কিতাবের** (কুরআনের) দিকে, **সুন্নাহর** (হাদীসের) দিকে, **ইজমার** (মুসলিম উম্মাহর রায়) দিকে এবং এ সব অস্বীকার করলে আহবান জানাবো **মুবাহালার** (না হকের ওপর আল্লাহর গজব পতিত হওয়ার কামনা করে আল্লাহর কাছে সম্মিলিত দোয়া) দিকে। মুবাহালা ইসলামে বৈধ । ইসলামের অনেক ইমাম মুবাহেলার আশ্রয় নিয়েছেন। মুবাহালা প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ-

www.pathagar.com

"অতঃপর তোমার কাছে জ্ঞান আসার পর যদি কেউ বিবাদ করে তাহলে বলে দাওঃ এসো আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ডেকে নেই, এবং তোমরাও তোমাদের সন্তানদেরকে এবং আমরা আমাদের স্ত্রীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ডেকে একত্রে জড়ো করি, অতঃপর চলো আমরা সবাই মিলে দোয়া করি, যেনো মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ বর্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে সত্য ঘটনা। এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। তারপর তারা যদি এ শর্তে মোকাবিলা করতে রাজী না হয়। তবে প্রমাণিত হবে তারাই বিপর্যয় ও আশান্তি সৃষ্টিকারী। আর বিপর্যয় সৃষ্টি কারীদেরকে আল্লাহ্ ভাল ভাবেই জানেন।"

(আলে-ইমরান ঃ ৬১-৬৩)

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন ঃ এই সুদী কৌশলও এর অন্তর্ভূক্ত, যা আসহাবে সাবতের (দাররে সুন্নাহ) কৌশলের আনুরূপ অথবা তার চেয়ে ও জঘন্য। আমার মতের বিরোধীদেরকে আমি চারটি বিষয়ের যে কোনো একটি বিষয়ের দিকে আহবান জানাবো। সেগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহর কিতাব, সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) জ্ঞানীদের ইজমা, (সর্বসম্মত আভিমত। যদি তা আস্বীকার করে তাহলে মুবাহেলার প্রতি আহবান জানাবো। যেমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ফরায়েজের কিছু বিষয়ে মুবাহেলার প্রতি প্রতিপক্ষকে আহবান জানিয়ে ছিলেন। এমনি ভাবে হযরত সুফইয়ান সাওরী এবং ইমাম আওযায়ী রাফউল ইয়াদাইন (দু নামাজে দু'হাত ওপরে ওঠানো)ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানীগনের আরো অনেকে প্রতিপক্ষকে মুবাহেলার দিকে আহবান জানিয়ে ছিলেন। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّم-

এ পুস্তিকায় এবং কতিপয় পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা উপরোক্ত কথাগুলোই বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, তারজন্য উপদেশের দ্বার উম্মুক্ত। ঐ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তায়ালার করুনা, যে ভাল কথা বলে এর ফলে সে লাভবান হয়, আর যে ব্যক্তি খারাপ কথা না বলে চুপ থাকে সে নিরাপদে থাকে।

হে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে দন্ডায়মান অবস্থায় হেফাজত করুন, ইসলাম দ্বারা আমাদের বসা আবস্থায় হেফাজত করুন, ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে রুকু অবস্থায় এবং সেজদারত আবস্থায় হেফাজত করুন। (আদ্‌দুরারু আস সুন্নিয়া সুন্নাহ কিতাবুল আকায়িদ ৫৫ পৃঃ)

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মিরাসুল আম্বিয়া

নবীদের উত্তরাধিকার

আল্লাহ তা আ'লার
তাওহীদের বর্ণনা সংক্রান্ত
প্রবন্ধসমূহের সিরিজ

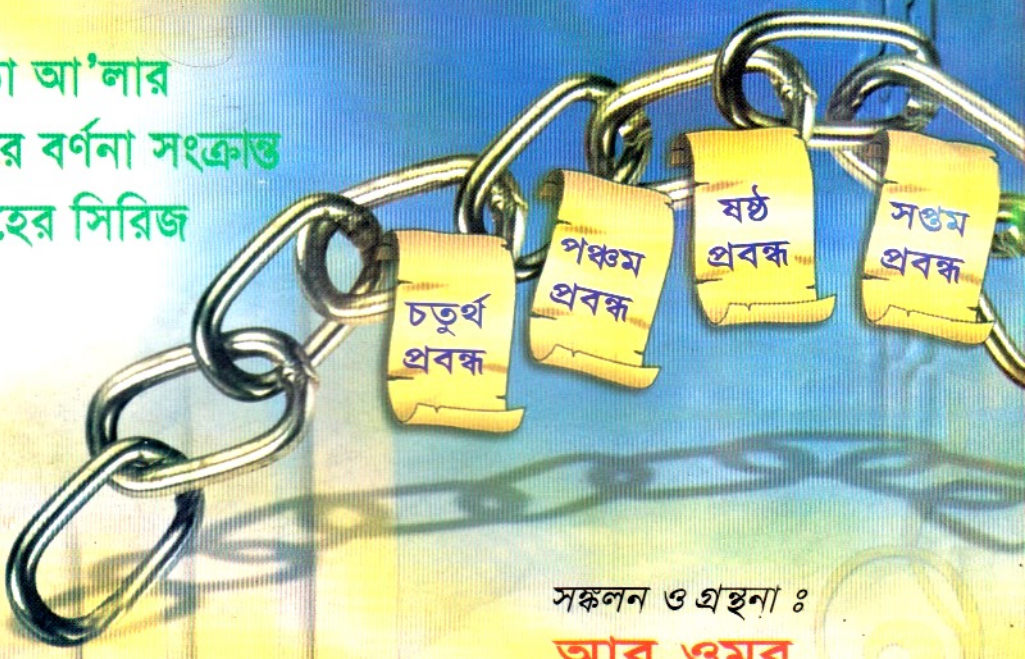

সঙ্কলন ও গ্রন্থনা ঃ
আবু ওমর

প্রথম প্রবন্ধ — তাওহীদের মূলনীতি ও ধ্যান-ধারনা সংক্রান্ত আলোচনা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ — যে ব্যক্তি তাগূতের কাছে বিচার চায় সে তাগূতকে অস্বীকার করেনা এবং এ প্রসংগে পঁচিশজন ওলামায়ে ইসলামের বক্তব্য।

তৃতীয় প্রবন্ধ — যে ব্যক্তি আইন প্রণয়নকারীকে মনোনয়ন দেয় এবং আইন রচনার পদে (পার্লামেন্টে) তাকে বসায়, তাহলে সে আল্লাহর সাথে রুবুবিয়াত এবং উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে মুশরিক হওয়া সংক্রান্ত বর্ণনা।